# পদ্মা-প্রমত্তা নদী

সুবোধ বসু

গ্রন্থাগার

কলিকাতা

চতুর্থ সংস্করণ

বৈশাখ, ১৩৬০

প্রচ্ছদ-চিত্র

শ্রীরমেন্দ্রকুমার কুণ্ড

ব্লক্ ও প্রচ্ছদ মুদ্রণ

ভারত ফটোটাইপ স্টুডিও

মুদ্রাকর

শ্রীবিভুতি ভুষণ সেন

উদয়ন প্রেস,

৬।১ কলেজ রো, কলিকাতা

প্রকাশক

শ্রীশৈলেন্দ্র চন্দ্র বসু

গ্রন্থাগার, পি ৫৮ ল্যান্সডাউন

রোড, কলিকাতা পক্ষে

এই উপন্যাসটি প্রথমে "বিচিত্রা" মাসিক পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। বর্ত্তমান সংস্করণে ভাষাগত কিছু কিছু পরিবর্ত্তন করা হইয়াছে

অধ্যাপক শ্রীযতীন্দ্রমোহন রায়

প্রীতিভাজনেষু

# সুবোধ বসু-র
## অন্যান্য বই

### উপন্যাস

রাজধানী
মানবের শত্রু নারী
পদধ্বনি
ইঙ্গিত
পাখির বাসা
নব মেঘদূত
চিমনি
স্বর্গ
বন্দিনী
নটী
স্ত্রীযুদ্ধ
সহচরী
ঊর্দ্ধগামী

### গল্প-সংগ্রহ

জয়যাত্রা
বিগত বসন্ত

### নাটক

অতিথি
কলেবর
তৃতীয় পক্ষ

### কিশোর-সাহিত্য

পদ্মা নদীর ডাক
বুদ্ধির্যস্ত

# এক

বিক্রমপুরের মধ্য দিয়া ধমনীর মত যে সকল পয়ঃপ্রণালী প্রবাহিত হইয়া বাংলার এই শস্য-শ্যামল প্রান্তকে প্রাণবান করিয়া রাখিয়াছে, তল্‌দিয়ার খাল তাহাদের অন্যতম। লৌহজঙ্গের পূর্ব্বপ্রান্তে পদ্মা হইতে বাহির হইয়া এই জলপ্রণালী বিক্রমপুরের মধ্য দিয়া আঁকিয়া বাঁকিয়া ধলেশ্বরী নদীতে গিয়া পড়িয়াছে। বিক্রমপুরের বাণিজ্যলক্ষ্মী এই পথে কত যে মালবাহী নৌকা পাঠাইয়াছে, কত যে বিদেশী বণিককে ডাকিয়া আনিয়াছে, তার ইয়ত্তা নাই।

এই খালের পথে বাংলা ১৩২০ সালের আশ্বিনের মাঝামাঝি শেষ-রাত্রিতে একখানা সুবৃহৎ বজ্‌রা দক্ষিণ-পশ্চিমমুখী হইয়া পদ্মার দিকে অগ্রসর হইতেছিল। রাত প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। আকাশের এক প্রান্তে দিক্‌চক্রবালের মাথার উপর শুকতারাটা এমনি দপ্‌দপ্‌ করিয়া জ্বলিতেছিল যে, তার আয়ু আর বেশি নাই তাহা বুঝিতে বেগ পাইতে হয় না। মহাবিস্তৃত উন্মুক্ত প্রকৃতির বৈশিষ্ট্য এই যে, এখানে অন্ধকার সম্পূর্ণ বিলুপ্তি টানিয়া আনে না, বিশ্বপ্রকৃতির এক রূপান্তর মাত্র সৃষ্টি করে। প্রভাতের সূচনায় এখন আবার নতুন রূপান্তর সৃষ্টি হইতে চলিল। নিমজ্জিত ধানক্ষেত হইতে শস্যের গন্ধ আসিয়া মিশিল নতুন-জাগা বাতাসে। খালের জলরাশি যেন কল্‌ কল্‌ করিয়া জাগিয়া উঠিল, তীরের গাছপালা এমনি শব্দ করিয়া উঠিল যে, মনে হইল ডাল-পালা আড়মোড়া ভাঙিতেছে। একটা মহাপরিবর্ত্তনের জন্য বিশ্বপ্রকৃতি স্পষ্টই উন্মুখ হইয়া আছে।

এই অস্পষ্টতার মধ্যে বজ্‌রার পাঁচ পাঁচজন মাঝি এই রহস্যময় আবেষ্টনের স্বাতন্ত্র্যহীন অঙ্গের মত দাঁড় নিক্ষেপ এবং হাল-নিয়ন্ত্রণ করিয়া

চলিয়াছে। ছপাছপ্ ছপাছপ্ জলের বুকে দাঁড়ের আঘাতের শব্দ হইতেছে, কঁ্যাচোর-কোঁচোর শব্দ উঠিতেছে হাল-বাঁধা দড়ি হইতে। নৌকা পদ্মার দিকে অলস গতিতে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে।

বজ্‌রার ভিতর হইতে এক সময় মৃদু গম্ভীরকণ্ঠে সংস্কৃত শ্লোকোচ্চারণ শুনিয়া মাঝিরা বুঝিল হুজুর জাগিয়াছেন—চকিতে ধীর অলস গতির মধ্যে কর্ম্মতৎপরতার পরিচয় পাওয়া গেল, বজ্‌রার গতি দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হইল।

ভিতর হইতে স্তোত্রোচ্চারিত হইতে লাগিল :

অনেকবাহূদরবক্ত্রনেত্রং পশ্যামি ত্বাং সর্ব্বতোঽনন্তরূপম্।
নান্তং ন মধ্যং ন পুনস্তবাদিং পশ্যামি বিশ্বেশ্বর বিশ্বরূপম্॥

জগতের রূপও পরিবর্ত্তিত হইয়া চলিল। পূর্ব্বদিগন্তে আকাশের প্রান্তে তুলির টানের মতন কয়েকটা সোনার আঁচড় দেখা দিল। খালের জল রূপার মত টলটল করিয়া উঠিল। উন্মুক্ত শস্যাস্তৃত প্রান্তরের সবুজ ঘাস ও তীক্ষ্ণধার ধানগাছ মরকতমণির মত ঝলসিয়া উঠিল।

দক্ষিণ দিকে অনতিদূরে দেখা যাইতেছে কোটালভিটার বহুবিস্তৃত আমবাগান। উহার পাশ দিয়া খাল বাঁকিয়া গিয়াছে।

বস্তুত, কোটালভিটা আমবাগান বৈ আর কিছুই নহে। কিম্বদন্তী আছে, এই কোটালভিটা চাঁদ রায়, কেদার রায়ের আমলে অতি বর্দ্ধিষ্ণু জনপদ ছিল, এই গ্রামের জমিদারবংশ মহাবিক্রম ভূইঞা চাঁদ রায়ের নিকট হইতে জায়গীর পাইয়াই কোটালভিটার প্রতিষ্ঠা করে এবং কেদার রায়ের অন্যতম সৈন্যাধ্যক্ষরূপে মানসিংহের সহিত শেষ-সংগ্রামে লড়িয়া বংশের তদানীন্তন জমিদার মৃত্যুবরণ করে। কোটালভিটা নামের হয়তো ইহাই তাৎপর্য্য। নানা উত্থান-পতনের বন্ধুর পথে এই প্রাচীন বংশ অবশেষে ভাগ্যবিপর্য্যয়ের সর্ব্বাপেক্ষা শোচনীয় পরিণতিতে আসিয়া পৌঁছিল—গৃহ-কলহ, বংশবৃদ্ধি এবং সুরা, এই তিন শত্রুতে মিলিয়া

ভূইঞাদের আমলের এই বিখ্যাত বংশের পতন সাধন করিল। কোটালভিটার জমিস্বত্ব অদৃশ্য পথে লৌহজঙ্গের এক ধনাঢ্য শুঁড়ির সিন্ধুকে আসিয়া বাঁধা পড়িল।

কোটালভিটায় এখন আর মনুষ্যের বসতি নাই। ঘনসন্নিবিষ্ট আমগাছে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়া আমবাগান সুরা-রসিক জমিদারদের কথা নিরন্তর স্মরণ করিতেছে। এমন বৃহৎ ও গভীর আমবাগান এ-অঞ্চলে আর নাই। স্বাদে, গন্ধে ও বর্ণে এই আমবাগানের ফলের মতো ফল সারা বিক্রমপুরে বিরল।

শীঘ্রই বজ্‌রার ভিতর হইতে এক সৌম্য-দর্শন পুরুষ বাহির হইয়া আসিলেন।

'কত দূর এলি তোরা ?' মাঝিদের জিজ্ঞাসা করিলেন।

চকিতে মাঝিরা দাঁড় থামাইয়া দণ্ডবৎ হইল। যে বৃদ্ধ পিছনে হাল ধরিয়াছিল সে বিনীত কণ্ঠে কহিল—'আইজ্ঞা, আইলাম কোটাল-ভিটায়—ঐ তো আমবাগান দেখা যায়।'

জমিদার দুর্গাপ্রসন্ন চৌধুরি তাকাইয়া দেখিলেন। কহিলেন, 'এখান থেকে পদ্মা ক'ক্রোশ ?'

'আইজ্ঞা, ক্রোশ তিনেক হইব, হুজুর।'

'বলিস কিরে, এখনও এত দূর। তবে বাড়ি পৌছুতে যে বেলা বারোটা হবে। একটু জোর ধর, বাবারা। বাড়ির খবর অনেকদিন পাই নি—অসুখ-বিসুখ শুনেছিলাম, মনটা বড় ভাল নেই।'

'লাগা, লাগা, জোর লাগা। হুজুরের কাছে ইনাম পাবি।'

ইনামের লোভেই হোক বা দুর্গাপ্রসন্ন বাহিরের পাটাতনে দাঁড়াইয়া থাকিবার দরুণই হোক্ দাঁড়ীরা সত্যসত্যই জোর ধরিল। বজ্‌রার গতি হইল দ্রুততর, কোটালভিটার সুগভীর আমবাগান ক্রমশই নিকট-বর্ত্তী হইল।

দুর্গাপ্রসন্ন চৌধুরিরা বংশানুক্রমিক জমিদার। মেঘ্‌নার প্রান্তবর্ত্তী অঞ্চলে এই জমিদারী যেমন বিরাট, তেমনি বর্দ্ধিষ্ণু। তাহার উপর লগ্নি এবং কলিকাতায় সুপারি-রপ্তানীর ব্যবসায়ে বহুকাল যাবৎ তাহাদের বংশ লিপ্ত আছে। ব্যবসা এবং ভূমিস্বত্ব হইতে দুর্গাপ্রসন্নের বৎসরে লক্ষাধিক টাকা আয়।

ভাদ্রের প্রথম ভাগেই মহালে গিয়াছিলেন। জমিদার স্বয়ং উপস্থিত থাকিলে আদায়পত্রের সুবিধা হয়। এবং শুধু জমিদারেরই নয়, প্রজাদেরও যে তাহাতে সুবিধা হয়, তাহা দুর্গাপ্রসন্ন জানেন। প্রজাদের উপর তিনি জুলুম করেন না, কোনও অত্যাচার হইতে দেন না, নায়েব-গমস্তা যাহাতে উৎকোচ না নিতে পারে, সে দিকে দৃষ্টি রাখেন, প্রজাদের অভাব-অভিযোগ শ্রবণ করেন এবং যথাসাধ্য তাহার প্রতিকারে যত্নবান হন। তাহার মনের এক অস্পষ্ট প্রান্তে কে যেন আশৈশব এক প্রশ্ন তুলিয়াছে—প্রজাদের নিকট হইতে এই যে তুই কর আদায় করিস্, এতে কোন সূত্রে তোর অধিকার? তাহাদের কোন উপকারে আসিয়া তাহাদের আপ্রাণ পরিশ্রমের শস্যে তুই অংশ দাবি করিস্? প্রজাদের জন্য পুকুর খনন করাইয়া, পাঠশালা এবং দাতব্য চিকিৎসালয় খুলিয়া এবং তাহাদের সঙ্গে বৎসরের দু-একটা মাস কাটাইয়া বিবেকের সেই অস্ফুট অথচ নিরন্তর অস্বাচ্ছন্দ্যকর প্রশ্নটাকে তিনি চাপা দিতে চেষ্টা করেন।

আশ্বিনের মধ্যভাগে আজ তিনি মহাল হইতে বাড়ি ফিরিতেছেন। স্বচ্ছল অবস্থার জমিদার হইলেও তিনি সহরের বাসিন্দা হন নাই। পদ্মার উপরেই বীরগঞ্জের চৌধুরিরা বংশানুক্রমিক বাস করিয়া আসিয়াছেন—দুর্গাপ্রসন্নও তাহাকে ত্যাগ করেন নাই। তবে পদ্মা যেমন মারমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে, তাহাতে ভরসা করিবার কিছুই নাই। নির্ম্মম পদ্মা ফুলিয়া ফুঁসিয়া অজ্ঞাত ক্রোধে নিরন্তর বীরগঞ্জের তটপ্রান্তে আঘাতের

পর আঘাত করিতেছে। গৃহের পর গৃহ কুক্ষিগত করিয়া, শত শত নরনারীকে গৃহহীন নিরাশ্রয় করিয়া, বিন্দু বিন্দু করিয়া শ্যামল মাটি গ্রাস করিয়া কীর্তিনাশা আজ জমিদার-বাড়ির হাতার মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ ভূম্যধিকারীকে সে সম্মান করে না, শস্ত্রপাণি পাইক-পেয়াদার রক্তচক্ষুকে সে ভ্রূকুটি করে, গুমরিয়া গর্জ্জিয়া ফেনার বুদ্বুদ উড়াইয়া প্রমত্তা নদী সুদৃঢ় মাটিকে চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া আপনার রৌপ্য-শুভ্র অঙ্গে লেপিয়া দেয়।

নিরুপায় দুর্গাপ্রসন্ন অগত্যা বীরগঞ্জ ত্যাগের সঙ্কল্প করিতেছেন। কিন্তু এখানকার মাটির মধ্যে মন বড় গভীর করিয়া শিকড় গাড়িয়াছে। পিতৃপিতামহের কীর্তিপূত এই গ্রাম ছাড়িয়া যাইতে মন চাহে না, অথচ উপায়ান্তর নাই। বড় জোর মাস ছয়—পদ্মা যদি পুনর্ব্বার মারমূর্ত্তি ধারণ না করে, তবে বড় জোর আর মাস ছয়। সঙ্কল্প করিলে পদ্মা এক সপ্তাহের মধ্যে তাহাকে গৃহহীন করিতে পারে। অথচ এই সংহারিণী নদীর জন্য এক অপূর্ব্ব আত্মীয়তাবোধ মনের মধ্যে গড়িয়া উঠিয়াছে—একে ছাড়িয়া যাইতে যেন ইচ্ছাই হয় না।

দুর্গাপ্রসন্নের মন ভাল ছিল না। প্রায় এক সপ্তাহ পূর্ব্বে চর-কুম্ভীরের কাছারিতে বাড়ির চিঠি পাইয়াছিলেন। তাহাতে সদর-গমস্তা লিখিয়াছিল, 'কর্ত্রীমার শরীর ভাল নয়, আপনার কার্য্য শেষ হইলে বিলম্ব করিবেন না।' তারপর নিজ কার্য্যে এমনি ব্যাপৃত ছিলেন যে, বাড়ির কথা বিশেষ একটা মনেই আসে নাই। বাড়ির দিকে রওনা হইয়াই কিন্তু নানা উদ্বেগে তিনি আতঙ্কিত হইয়া উঠিলেন। গৃহিণীর শরীর অনেকদিন ধরিয়াই খারাপ যাইতেছে—যা ভয় করেন পদ্মাকে, নদীর ভয়েই সারাক্ষণ তটস্থ থাকেন। বলেন, এই পদ্মাই আমাদের সর্ব্বনাশ করবে। হা হা! পদ্মা করিবে কি! পদ্মা বাড়ি ভেঙে দিলে অন্যত্র কি বাড়ি গড়া যায় না? তবে কিসের ভয় পদ্মাকে! ওকে একবার হাওয়া-বদলাতে

পশ্চিমে নিয়ে যাওয়া দরকার! পূজাটা যাক্, তার পর এ-সম্বন্ধে ভাবা যাবে!

রৌদ্র আসিয়া দুর্গাপ্রসন্নের উন্মুক্ত গৌরবর্ণ সুপুষ্ট দেহে পড়িল। পাটাতনের উপর তেমনি তিনি দাঁড়াইয়া রহিলেন। মাঝিরা দাঁড় বাহিয়া চলিল, এবং মনে মনে কামনা করিতে লাগিল—হুজুর ভিতরে গেলে হয়, তামাকটা তবে ধরান যায়।

দুর্গাপ্রসন্নের দুইটি সন্তান। বড়টি মেয়ে, তার বিবাহ হইয়া গিয়াছে। স্বামী এলাহাবাদে ব্যারিস্টার—এবং তারা পশ্চিমেরই স্থায়ী বাসিন্দা। ক্বচিৎ হৈমন্তী বাপের বাড়ি আসিতে পারে। গত সুদীর্ঘ সাত বৎসরের মধ্যে বার দুই মাত্র বীরগঞ্জে আসিয়াছে। ইহা ছাড়া কলিকাতায়ও দু'চারবার দেখা হইয়াছে। গ্রামের প্রতি জামাইয়ের গভীর অবজ্ঞা দুর্গাপ্রসন্নের অজানা নয়, অথচ নিজেরও তার গ্রাম ছাড়িয়া যাওয়ার উপায় নাই। সুতরাং কন্যার সহিত দেখা-সাক্ষাৎ বিরল হইয়া উঠিয়াছে। দুর্গাপ্রসন্ন ইহার জন্য এখন আর আক্ষেপ করেন না, বিয়ে হইলে মেয়ে তো পরের হইয়া যাইবেই। কন্যা সৎপাত্রে সম্প্রদান করিয়াছেন—তারা সুখে থাকিলেই যথেষ্ট।

দুর্গাপ্রসন্নের সমস্ত পিতৃস্নেহ আসিয়া কেন্দ্রীভূত হইয়াছে তার বালক-পুত্র রাজার উপর। রাজা ছাড়াও যে তার অন্য একটি সন্তান আছে, মাঝে মাঝে তিনি সে কথাই ভুলিয়া যান। তার সমস্ত পিতৃহৃদয় জুড়িয়া এই বালক আধিপত্য স্থাপন করিয়াছে, রাজার ভবিষ্যতের কত সুখস্বপ্ন যে তিনি ইহারই মধ্যে দেখিতে আরম্ভ করিয়াছেন, তাহার সীমা-সংখ্যা নাই।

দুর্গাপ্রসন্ন বাড়ির কথা ভাবিতে লাগিলেন। রাজা এতদিনে নূতন কি কি সব কীর্ত্তি করিল, কে জানে! যা দুরন্ত হইয়াছে ছেলে! পদ্মার কোলেই যে মানুষ, শান্তশিষ্ট সে আর হইবে কেমন করিয়া, তবু

দৌবাত্ম্যেব একটা মাত্রা থাকা উচিত। এই ক্ষুদ্র বাজা একদিন বড় হইবে, চৌধুবি-বংশেব ভাব গ্রহণ কবিবে।—বাবো বৎসব মাত্র বয়স, আরও কত দেবি। এতদিন কি আমিই বেঁচে থাকব? এই বাজার জন্যই তো নতুন কবিয়া বাড়ি-পত্তন করিতে হইবে—ওব যেন এতটুকুও অসুবিধা না হয়, ও যেন সুখে থাকিতে পাবে।

'এইবাব একটু আস্তে চল্ তো, বাবাব', কোটালভিটাটা একটু ভাল ক'বে দেখে নিই।'

কোটালভিটাব আমবাগানেব প্রান্তে বজ্‌বা উপস্থিত হইয়াছে। মাঝিবা দুর্গাপ্রসন্নেব আদেশে গতি মন্দীভূত কবিল। দুর্গাপ্রসন্ন অত্যন্ত কৌতূহল ও আগ্রহেব সঙ্গে কোটালভিটাব আম্র-কানন এবং পাবিপার্শ্বিক প্রকৃতি নিবীক্ষণ কবিতে লাগিলেন। অবশেষে কহিলেন, 'সুন্দব জায়গা। একেবাবে খালেব বুকেব উপবে, অথচ বেশ উঁচু জমি। চাবদিক বড সুন্দব। এখানে লোক-জনের কোন বসতি নেই?'

'আইজ্ঞা, মোটে না।' হাল ধবিযা বুড়া মাঝি জবাব দিল

'কেন, জমি তো বেশ শস্যশালীই মনে হয। তা'ছাড়া পায়েব তলাতেই জল। বস্‌তি একটা গ'ড়ে' ওঠে না কেন?'

'পতিত জমি কিনা, হুজুব—কেউ আইতে চায না, ডবায। কত বড় নামী বংশ কোটালভিটাব মালিক আছিল হুজুবেব তো তা আজানা না। সেই বংশই পডল এইখানে—হাতীশালা ঘোডাশালা, পাইক-পেযাদা, হক্কল ডুবচে না এই ডাঙায। তাই তো এইটাবে বাই-ক্ষসী জমি কয—ইযাব মুখে আইব কে? লক্ষ্মীছাডা জমি লোক গিলে।'

'লক্ষ্মীছাডা জমিতে কি এমন আমগাছ হয? এমন রসে ভবা জমি আব কোথায আছে?'

'কিন্তু, হুজুব অমন বংশটা তো এই জমিই গিলা খাইল, নাইলে এত লোকজন, মণিমাণিক্য চক্ষুব নিমিষে তলায ক্যাম্‌তে?'

'ওসব জমির দোষে তলায় না, ইসমাইল, জমির মালিকের দোষে তলায়। লৌহজঙ্গের পদ্ম সা'রই তো জমিটা, তাই না হে?'

'আইজ্ঞা, হুজুর।'

'বেশ জমি, সুন্দর জমি! এখানে চমৎকার একটা গ্রাম হ'তে পারে।'

'হুজুব।'

'তোমবা এখানে আম চালান নিতে আস না?'

'আগেব সন আইছিলাম হুজুর, এই সন আব আসি নাই। হাঁপানির লাইগা ফকিবের মাদুলি নিছি কিনা, ফকিবেব বাবণ আছিল।'

'কেন?' বিস্মিত হইয়া দুর্গাপ্রসন্ন প্রশ্ন কবিলেন।

'সত্য মিথ্যা জানি না হুজুব, লোকে কয় এইখানে দানাপ্রেত আছে। ফকিব বাবণ কইবা দিছিল—কোটালভিটাব বাগানে বাত্রি বাস কববি না, ইস্মাইল, খববদাব। তাইলে মাদুলিব গুণ নষ্ট অইব—'

শুনিয়া দুর্গাপ্রসন্ন মৃদু মৃদু হাস্য কবিতে লাগিলেন। যেখানে মানুষ থাকে না, সেখানেই ভূত থাকে, এই অভ্রান্ত সিদ্ধান্ত মানুষেব কবেকাব তাহাব হিসাব নাই, কিন্তু মহাকাশে এত স্থান থাকিতে অশবীবী জীবেবা কেন যে বস্তু-জগতে আসিয়া ডেবা বাঁধিবে, তাহা যেমন বিস্ময়কব, তেমনি প্রমাণচিহ্নহীন।

কোটালভিটাব আমবাগান পাব হইলে তবে দুর্গাপ্রসন্ন বজ্‌বাব ভিতবে পুনঃপ্রবেশ কবিলেন। পূর্ব্বেই প্রাতঃকৃত্য সমাপ্ত হইয়াছিল, পাচক আসিয়া জানালাব পার্শ্ববর্ত্তী তেপায়ায় প্রাতবাশ বাখিয়া গেল। অন্যমনে আহাব কবিতে কবিতে দুর্গাপ্রসন্ন জানালা দিয়া বাহিরে চাহিয়া বহিলেন। পিছনেব বাঁকটার ঠিক উপরেই কোটালভিটাব আমবাগান উচ্চভূমি হইতে হাত-ইসারা করিয়া ডাকিতেছে। জমিব

অতি-উর্ব্বরতা, পদপ্রান্তলীন খাল, ঐতিহাসিক আভিজাত্য, ইহারা সকলে একত্রিত হইয়া দুর্গাপ্রসন্নের মনের মধ্যে একটা কেমন আকর্ষণ বিস্তার করিল। অতীতের এক অশ্বশালা হইতে হ্রেষা ও হস্তিশালা হইতে বৃংহিত, নহবৎখানা হইতে শানাইয়ের আলাপ এবং রাজপথ হইতে উল্লসিত জনমণ্ডলীর কলকোলাহল কানে আসিয়া প্রবেশ করিতে লাগিল—এক সম্পদশালী জনপদের দীপ্ত গৌরবময় চিত্র চোখের সম্মুখে সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল। দুর্গাপ্রসন্ন যখন স্বপ্ন হইতে জাগ্রত হইলেন, তখন কোটাল-ভিটা বহু পশ্চাতে পড়িয়া রহিয়াছে—দূর হইতে আমবাগানটাকে বহু দূরের আকাশে একটা অস্পষ্ট মেঘখণ্ডের মত প্রতীয়মান হইতেছে। কোটালভিটার বর্ত্তমানকে দুর্গাপ্রসন্নের বড়ই করুণ মনে হইতে লাগিল।

জানালাতে কনুই ভর দিয়া তিনি ভাবিতে লাগিলেন—বাড়ি তো আমাকে নতুন ক'রে করতেই হবে, কোটালভিটায় করলে কেমন হয়? মনের মত করে' এখানে একটা গ্রাম গ'ড়ে তোলা যায় না? রাজা বড় হয়ে তার বাপের নিজের হাতে গড়া এই গ্রামে সুখে বাস করবে। সহরের চাইতে সুন্দর, অথচ খাঁটি গ্রাম,—শস্যশ্যামল, রৌদ্রভরা, আকাশ-ভরা গ্রাম করে যে রাজা বড় হবে, মানুষ হবে একটি টুকটুকে বউ এসে অন্তঃপুরে নেচে নেচে বেড়াবে।

দূরে দেখা গেল পদ্মার বহুবিস্তৃত জলস্রোত। খবর পাইয়া দুর্গাপ্রসন্ন বাহিরে আসিলেন। রৌদ্রালোকে পদ্মার রৌপ্যবর্ণ জলরাশি ঝলসিয়া উঠিল।

পদ্মা! পদ্মা! রহস্যময়ী পদ্মা! ইহার স্নেহস্নিগ্ধ মাতৃমূর্ত্তি কেমনে যে এক মুহূর্ত্তে অবলীলাক্রমে জিঘাংসা-ভীষণ করাল-দংষ্ট্রা রাক্ষসীমূর্ত্তিতে রূপান্তরিত হয়, সে এক রহস্য। কিন্তু এই রহস্যময়ী অপূর্ব্ব মায়াবলে মানুষকে মুগ্ধ করে—দুর্গাপ্রসন্নকে মুগ্ধ করিয়াছে। ঝঞ্ঝা-প্রমত্তা প্রলয়ঙ্করী

পদ্মার ভৈরবী মূর্ত্তি দেখিয়া দুর্গাপ্রসন্ন যখন ভয়ে কাঁপিয়া উঠিয়াছেন, তখনও মনে মনে তিনি প্রশ্ন করিয়াছেন—মাগো, এত স্নেহ যদি তোর মনে, এত শস্য, এত প্রাণ যদি মা সন্তান-স্নেহে বিলাইয়া দিস, তবে মা, এমন সংহারিণী মূর্ত্তি ধরিস্ কেন ?

পদ্মা নিকটবর্ত্তী হইল। খাল ক্রমেই চওড়া হইয়া উঠিল, জলে নদীর রঙ লাগিল। মাঝিরা দাঁড় তুলিয়া রাখিয়া বৈঠা বাঁধিতে লাগিল। গভীর জলের জন্য পূর্ব্বাহ্ণেই প্রস্তুত হইতেছে।

বৃদ্ধ ইসমাইল মাঝি হাওয়ার গতি এবং দিক লক্ষ্য করিয়া সহর্ষে কহিল, 'পালে বাতাসটা লাগব মনে হইতাছে। রসিকমিঞা জোগাড় দেখ, গাঙে পইড়্যা যেন আর দেরি না হয়। তড়াতড়ি পৌঁছাইলে কর্ত্তার কাছে ইনাম পাবি।—হুসিয়ার ভাই, যাব যাব ডাইনে।—কোন্ হানে যাইব তোমাগো নাও ?

## দুই

যখন দুর্গাপ্রসন্নের বজ্‌রা রায়গঞ্জের জমিদার বাড়ির হাতার মধ্যে যাইয়া প্রবেশ করিল, তখন পদ্মার আকাশে অতি ভয়ঙ্কর মেঘ সাজিয়া উঠিয়াছে। আর দেরি হইলে পদ্মা হয়তো করাল মুখ-ব্যাদান করিয়া উঠিত, নির্ম্মম রাক্ষসীর মত উন্মত্তনৃত্যের প্রলয়ঙ্কর অভিনয় শুরু করিয়া দিত—অকিঞ্চিৎকর একটা বজ্‌রা বাঁচিত কিনা কে জানে!

পশ্চাতের ঘনঘটার দিকে চাহিয়া দুর্গাপ্রসন্ন কহিলেন—'যাক্, খুব বাঁচা গেছে, ইসমাইল, নইলে অকালের ঝড়ে পদ্মা কেমন ক্ষেপে উঠত, কিছু বলা যায় না।'

'হুজুর।'

প্রভুর বজ্‌রা দেখিয়া সারা কাছারি-বাড়ির লোক আসিয়া জড়ো হইয়াছিল। তাহাদের পুরোভাগে সদর-গমস্তা অম্বিকাচরণ লম্ফঝম্প করিয়া বজ্‌রা নোঙর করিবার উপযুক্ত স্থান সম্বন্ধে মাঝিদের অনর্গল উপদেশ দিতে লাগিল—হাঁকডাক করিয়া উপস্থিত ভূঁইমালী ও ভৃত্যদেরই ডাকিয়া একশেষ হইল, এবং অতঃপর নিজে যাইয়া বজ্‌রার গলুই টানিয়া ধরিয়া কর্ম্মনৈপুণ্যের পরিচয় দিয়া ছাড়িল।

দুর্গাপ্রসন্ন অবতরণ করা মাত্র পদধূলি গ্রহণের একটা সমারোহ পড়িয়া গেল, এবং নিরুপায় অবস্থায় এই সম্মান গ্রহণ ও উপযুক্ত আশীর্ব্বাদ বর্ষণের পর তবে মাত্র তিনি বাড়ির কুশল-প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে পারিলেন। এক নিমেষে তাঁর উৎসুক চোখ দেখিয়া লইয়াছিল, রাজা নদীর পাড়ে উপস্থিত নাই। অথচ ওর চঞ্চল ঔৎসুক্যের ছবি তিনি মনে মনে এই দীর্ঘ পাঁচ দিন জলপথের যাত্রায় কতবার যে আঁকিয়া লইয়াছেন, তার ঠিক নাই।

'বাড়ির খবর সব ভাল তো, অম্বিকা?'—সামান্য আশঙ্কিত স্বরে দুর্গাপ্রসন্ন প্রশ্ন করিলেন।

'তেমন না।' অম্বিকা কহিল।

এক মুহূর্ত্তে দুর্গাপ্রসন্ন উদ্বেগে এবং আশঙ্কায় পূর্ণ হইয়া উঠিলেন।

'রাজার অসুখ-বিসুখ নয় তো?'—রাজার কথাই তিনি ভাবিতেছিলেন।

'আজ্ঞে, না। কর্ত্রীমারই।'

'খুবই বেড়েছে কি?'

'একই রকম আছেন।—তবে কিনা, কর্ত্তা, ওনার কেবলই ভয়, পদ্মা নদী এই বুঝি পাগ্‌লা হয়ে উঠলো—এই বুঝি বাড়ি-ঘর সব চুরমার ক'রে দিল।—অসুখ তো আদপে ঐ। রোজই প্রতুল ডাক্তার—'

দুর্গাপ্রসন্ন কথা-পরিসমাপ্তির জন্য অপেক্ষা করিলেন না—কাছারি-বাড়ি দক্ষিণে রাখিয়া দৃঢ়পদক্ষেপে অন্তঃপুরের দিকে রওনা হইলেন।

আকাশে আকাশে বিদ্যুৎ চিড়িক খাইয়া গেল—দিগন্ত হইতে দিগন্তে খাঁড়ার ঝঞ্চনা বাজিয়া উঠিল, পদ্মার জলরাশি আবর্ত রচনা করিয়া, ফেনার বুদ্বুদ উড়াইয়া, মন্থনের দাপটে ঘনগম্ভীর গর্জ্জন করিতে করিতে সংহারিণী মূর্ত্তি ধারণ করিল। অদৃশ্য হইতে লক্ষ লক্ষ কাড়া-নাকাড়া বাজিয়া উঠিল।

দ্বিতলে স্ত্রীর শয়নকক্ষে দুর্গাপ্রসন্ন সভয়ে আসিয়া প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন, খাট শূন্য—কেহই শুইয়া নাই। খাটের পাশে আরাম-কেদারাটাও শূন্য পড়িয়া রহিয়াছে। দুর্গাপ্রসন্ন ঈষৎ শঙ্কিত এবং সম্পূর্ণ বিস্মিত হইয়া দৃষ্টি সম্প্রসারণ করিলেন। দেখিলেন, জানালার গরাদ ধরিয়া হেমাঙ্গিনী দাঁড়াইয়া আছেন—মাথা হইতে ঘোমটা পড়িয়া গেছে, আলুথালু একরাশ আজানুলম্বিত খোলা চুল মেঘজালের মত উড়িতেছে, ঝোড়ো বাতাসে শিথিল অঞ্চলপ্রান্ত অসম্বৃত।

দুর্গাপ্রসন্ন কাশিলেন, জুতার গোড়ালি দিয়া মেঝেতে শব্দ করিলেন। হেমাঙ্গিনীর কর্ণে তাহা প্রবেশই করিল না। অবশেষে নিরুপায় হইয়া তিনি ডাকিয়া কহিলেন—'আমি এসেছি—শুনচ।'

এইবার চকিতে হেমাঙ্গিনী ফিরিয়া দাঁড়াইলেন। দুই চোখে তাঁর অপ্রকৃতিস্থ দৃষ্টি—শীর্ণ মুখের তুলনায় তাহা অত্যন্ত অস্বাভাবিক উজ্জ্বল মনে হইল। রুক্ষ অবিন্যস্ত চুল কত যে মুখমণ্ডলের উপর আসিয়া পড়িয়াছে, তার ঠিক নাই। ক্লান্ত ওষ্ঠ এবং গণ্ডের শিথিল মাংসপেশী দেখিয়া সন্দেহের অবকাশ থাকে না যে, নিজের মধ্যেকার এক গভীর সংগ্রামে ক্ষতবিক্ষত হইয়া পড়িয়াছেন। হেমাঙ্গিনীর শ্রীমণ্ডিত সুন্দর মুখমণ্ডল বিবিধ বিকৃতির তলায় লুকাইবার উপক্রম

করিয়াছে। একই সময়ে তাকে অপ্রকৃতিস্থ, উদাস, অদ্ভুত এবং করুণ মনে হইতেছে।

অস্বাভাবিক ভঙ্গিতে হেমাঙ্গিনী নিকটে আসিলেন। স্বামীর চোখের দিকে শঙ্কাতুর দৃষ্টিতে চাহিয়া অকস্মাৎ কহিয়া উঠিলেন, 'আমার ভয় করচে, পদ্মাকে ভয় করচে।'

'ভয় কিসের?' দুর্গাপ্রসন্ন দুই সবল হস্তে স্ত্রীর কাঁধ ধরিয়া দৃঢ় অথচ কোমল কণ্ঠে কহিলেন।

'পদ্মা নদী কেমন ডাক ছেড়ে এগিয়ে আসচে, দেখতে পাও না?—ও গিলতে আসচে, ঠিক গিলতে—'

'কোথায় এগিয়ে আসচে? মিথ্যে ভয় পাচ্ছ, হেম। যতটা আমি দেখে গিয়েছিলাম, তার চেয়ে আর এক চুলও এগোয়নি। এ বছর আর ভাঙবে না।'

হেমাঙ্গিনী যেন আশ্বাস পাইলেন। একটা নির্ভরতার স্বাচ্ছন্দ্য-বোধ এক মুহূর্ত্তের জন্য তার মুখে জাগিয়া উঠিল। কিন্তু পরক্ষণেই আবার তিনি শঙ্কিত হইয়া উঠিলেন। কহিলেন—'তবে সারাক্ষণ কেন এমন শাসায়—পাড়ে এসে সাপের মতন কেন ছোবল্ মারতে থাকে?'

'বিছানাতে এসে বস, জ্বরে তোমাকে ভারি দুর্ব্বল করেচে, দেখতে পাচ্চি।' বলিয়া দুর্গাপ্রসন্ন স্ত্রীকে ধরিয়া ধীরে ধীরে খাটে আনিয়া বসাইলেন। স্পষ্টই বুঝিতে পারিলেন, পদ্মার জন্য হেমাঙ্গিনীর ভয়টা অকস্মাৎ অস্বাভাবিক বাড়িয়া উঠিয়া আজ তার মস্তিষ্ক অর্দ্ধবিকৃত করিয়া তুলিয়াছে। দুর্গাপ্রসন্ন বুঝিলেন, এতদিন মহালে থাকা তার উচিত হয় নাই, তিনি উপস্থিত থাকিলে হেমাঙ্গিনীর স্নায়ুমণ্ডলী হয়তো এতটা বিকৃত হইয়া উঠিতে পারিত না। দুর্গাপ্রসন্ন নিজেকে অত্যন্ত অপরাধী বোধ করিতে লাগিলেন। পদ্মার জন্য কাহারও ভয় যে

এতটা আন্তরিক ও ক্ষতিকর হইতে পারে, তাহা দুর্গাপ্রসন্ন কল্পনা করিতে পারেন না। পদ্মা যতই ভয়ঙ্করী হউক, তিনি যে মনে মনে তাহাকে চিরকাল ভালবাসিয়াছেন। এখন অকস্মাৎ তাঁহার মনে হইল—সত্যই তো, হেমাঙ্গিনী তো পদ্মাপারের মেয়ে নয়, পদ্মার কোলে তো সে লালিত হয় নাই, সভ্যতার মধ্যে, নগরীর নির্ভরশীল আবেষ্টনে তাহার কিশোরী-জীবন অতিবাহিত হইয়াছে। পদ্মাকে সে ভালবাসিবে কেমন করিয়া, পদ্মাকে ভয় করাই তো তাহার পক্ষে স্বাভাবিক।

'কেন মিছিমিছি পদ্মাকে ডরাও, হেম', দুর্গাপ্রসন্ন স্ত্রীর হাত দুইটা নিজের হাতের মুঠার মধ্যে লইয়া কহিলেন। 'কি করতে পারে পদ্মা তোমার? সামান্য একটা নদী, কি ওর সাধ্য?'

দুর্গাপ্রসন্নের উপস্থিতিতে হেমাঙ্গিনী যেন আশ্বাস খুঁজিয়া পাইলেন। তার ভয়-চকিত দৃষ্টি এবং শঙ্কা-অসংলগ্ন কণ্ঠস্বর বহু পরিমাণে স্বাভাবিক ক্ষমতা ফিরিয়া পাইল। অনেকটা স্বাভাবিক কণ্ঠে কহিলেন—'পদ্মাকে আমার বড় ভয়। কেবলই মনে হয়, রাক্ষুসী নদী আমার সর্ব্বনাশ করে ছাড়বে, আমার সর্ব্বস্ব না গিলে ওর ক্ষুধাটা কিছুতেই মিটবে না।—সারাক্ষণ কেমন ডাকতে থাকে, দেখ না?'

'এ তোমার অনর্থক ভয়।—পদ্মা তোমার কি করিতে পারে, ভেবে দেখ। বড় জোর বীরগঞ্জের এই বাড়ি ভেঙে দিতে পারে, তার বেশি আর কিছু পারে না। বেশ তো, ভেঙে যদি দেয়ই, নতুন বাড়ি কি আর আমি বানাতে পারবো না? যতই প্রতাপ হোক্ পদ্মার, ও কি আমার সর্ব্বস্ব লুঠ করতে পারে? সম্পূর্ণ একটা নতুন গ্রাম আমি তৈরি করতে পারি—নতুন একটা বাড়ি তৈরি করান আমার পক্ষে কিছুই নয়।'

'তবে চল পদ্মার কাছ থেকে আমরা পালিয়ে যাই। ওর ভয়ে যে সারাক্ষণ আমি কাঁপতে থাকি, বুকটা দুরুদুরু করে।'

'বেশ, তাই হবে,' দুর্গাপ্রসন্ন কহিলেন। 'পূজোর পরই আমি বাড়ি উঠিয়ে নেবার ব্যবস্থা করব। কিন্তু তাই বলে, সামান্য একটা নদীকে তুমি এমন ভয় করতে যাবে কেন?'

'সারাক্ষণ আমার ভয় হয়—পদ্মা বুঝি ভেঙে দিল, সর্ব্বস্ব ভেঙে দিল। ঘুমালে আমি স্বপ্ন দেখি, একটা ঝড়ের মতন পদ্মা ছুটে আসচে, আমার এত সুখের সংসার ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়ে গেল বলে। সারারাত আমি আর চোখ বুঁজ্‌তে পারি না।' উত্তেজনায় ও একটা অবর্ণনীয় আতঙ্কে হেমাঙ্গিনী হাঁপাইতে লাগিলেন।

ভাবনাগ্রস্ত দুর্গাপ্রসন্ন সহানুভূতিপূর্ণ দৃষ্টিতে স্ত্রীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। তারপর কহিলেন—'ওষুধ খাচ্ছ? প্রতুল ডাক্তার শুনলাম রোজই আসচে—'

'না, ওষুধ আমি খাইনা।'

'কেন?'

'আমার জ্বর নেই, আমার কোনও অসুখ নেই, ওষুধ আমি খাব না।'

'তোমার শরীর বড় দুর্ব্বল—কোনও বলকারক ওষুধ খাওয়া দরকার।'

'ওষুধে আমার দরকার নেই, সত্যই কোন দরকার নেই,' হেমাঙ্গিনী সহসা উচ্ছ্বাসের সঙ্গে কহিতে লাগিলেন। 'তোমার পায়ে পড়ি, পদ্মার পার থেকে আমরা পালিয়ে যাই চল। ওষুধে আমার কাজ নেই। শুনচো, পাড়-ভাঙার শব্দ? ও কি, বাতাস না পদ্মা?...'

বাহিরের মত্ত গর্জ্জন এইবার তাহাদের কর্ণে প্রবেশ করিল। সঙ্গে সঙ্গে আকাশের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত উদ্ভাসিত হইয়া লক্ষ কোটি কামানের মিলিত গর্জ্জন ধরণীর রন্ধ্রে রন্ধ্রে ঝাঁকুনি দিয়া গেল। হেমাঙ্গিনী মৃত্যুভীত চিৎকার করিয়া রক্তহীন পাংশু মুখ স্বামীর বুকে গুঁজিয়া ফেলিলেন। খোলা জানালার পথে বন্যাস্রোতের মত বৃষ্টি ও বাতাস প্রবেশ করিতে লাগিল।

দুর্গাপ্রসন্ন আশ্বাস দিয়া কহিলেন, 'ভয় কি, এটা বাজ পড়ল। দাঁড়াও, আমি জানলাটা বন্ধ করে দিয়ে আসি।'

যতদূর দেখা যায়, বিশ্বপ্রকৃতি প্রলয়ঙ্কর মূর্ত্তি ধরিয়াছে। আকাশের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত মেঘের ঐরাবত বৃংহিত করিতে করিতে, শুঁড় দাপটিয়া অন্ধ বেগে অদৃশ্যকে আক্রমণ করিতে ছুটিয়া চলিয়াছে। উদ্ধত রোষে বিদ্যুৎ আস্ফালন করিতেছে, আবর্ত্তিত বাতাসে বাতাসে মথিত ধরিত্রীর ক্ষুব্ধ আর্ত্তনাদ জাগিয়া উঠিয়াছে, পদ্মার পরপার এবং মেঘান্ধকার একাকার হইয়া মিশিয়া গিয়াছে। যেন রুদ্রের পদক্ষেপে ধরণী টলমল করিতেছে। দুর্গাপ্রসন্ন হতবাক্ হইয়া এই দুর্য্যোগের দিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকাইয়া রহিলেন—সংহারিণী পদ্মা চোখের তলায় উন্মত্ত নৃত্য করিতে লাগিল।

সহসা নদীর পাড়ে তার দৃষ্টি পড়িল। দুর্গাপ্রসন্ন চমকিয়া উঠিলেন। দেখিলেন, বাহিরের অসহায় উন্মুক্তির মধ্যে ক্ষুদ্র ছায়ার মতো একটি বালক পদ্মার কিনারে দাঁড়াইয়া অতি নির্লিপ্তভাবে দুর্য্যোগ উপভোগ করিতেছে। গর্জ্জমান বহিঃপ্রকৃতি, সংহারিণী পদ্মার ভ্রূকুটি-ভঙ্গি, বিদ্যুৎ-বিদীর্ণ আকাশ—এ সকল যেন তার নিকট নেহাৎই অকিঞ্চিৎকর ব্যাপার। পরম আনন্দ সহকারে মাথাটা পদ্মার দিকে ঔৎসুক্য ভরে বাড়াইয়া দিয়া অন্ধকারের মধ্যে সে কি যেন লক্ষ্য করিতেছে। গায়ে গেঞ্জি, কাপড় বেড় দিয়া পরা, ঝড়ের বাতাসে কাপড় এবং মাথার চুল সমানে উড়িতেছে, তার ভ্রূক্ষেপমাত্র নাই। অথচ এই বাতাস অনায়াসে তাকে শূন্যে তুলিয়া পদ্মাগর্ভে নিক্ষেপ করিতে পারে।

ভয়ে, বিস্ময়ে, আশঙ্কায় স্খলিতবাক্ দুর্গাপ্রসন্ন চিৎকার করিয়া উঠিলেন। এক মুহূর্ত্তে সমস্ত বুদ্ধি এবং সমস্ত শক্তি যেন তাঁহাকে ত্যাগ

করিয়া গেল। দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হইয়া তিনি ছুটিয়া বাহির হইলেন, এবং প্রায়ান্ধকাব সিঁড়ি দিয়া নিচের দিকে দৌড়াইতে লাগিলেন।

হেমাঙ্গিনী স্খলিত-পদে জানালার পাশে ছুটিয়া আসিলেন। ভীত আর্ত্ত চিৎকাব কবিয়া কহিলেন—'পদ্মা আমার সর্ব্বনাশ করবে—রাক্ষুসী আমাব সর্ব্বনাশ করবে।'

উৰ্দ্ধশ্বাসে দৌড়াইতে দৌড়াইতে দুর্গাপ্রসন্ন নিচে নামিয়া আসিলেন। উত্তেজনায এবং দীর্ঘ জলপথ যাত্রাব অবসাদে তাঁর পা কাঁপিতে লাগিল—মনে হইতে লাগিল পডিয়া যাইবেন। কিন্তু একটুও বিলম্ব কবা চলে না। মুহূর্ত্তেব বিলম্বে হয়তো সর্ব্বনাশ হইয়া যাইতে পারে। মনে হইতে লাগিল, পাডেব মাটিতে ফাটল ধরিয়াছে, এইবাব কঠিন মাটি স্রোতের আঘাতে কাচেব বাসনেব মত চুবমার হইয়া যাইবে। শোনা যাইবে নদীতে একটু বৰ্দ্ধিত জলোচ্ছ্বাস, ক্ষুদ্র এক মানব-শিশুব করুণ আর্ত্তনাদ এই বিক্ষুব্ধ বায়ু এবং নদী-গর্জ্জনে শোনাই যাইবে না।

দুর্গাপ্রসন্ন ঝডেব মধ্য দিয়া দৌড়াইতে লাগিলেন। চোখে প্রায় কিছুই দেখিতে পাইতেছেন না, তবু সমস্ত দৃষ্টিশক্তি সংহৃত কবিয়া তিনি ছুটিয়া গেলেন এবং দৃঢ-মুষ্টিতে পুত্রেব ক্ষুদ্র বাহুটা ধবিয়া ফেলিলেন। পলকে তাহাকে শূন্যে তুলিয়া লইয়া তিনি বন্ধ চোখেই গৃহেব উদ্দেশে ছুটিলেন।

বাজাব কিন্তু কিছুই হয় নাই। পিতাব বুকেব সঙ্গে লাগিয়া সহর্ষে সে কহিল—'বাবা! তুমি! হিহি—'

টলিতে টলিতে দুর্গাপ্রসন্ন দালানে পৌছিলেন। সক্রোধে রাজাকে এক দিকে ঠেলিয়া দিয়া সমুখেব চেয়ারটায়ই এলাইয়া পড়িলেন। এবাব বাজা বুঝিল কিছু একটা ব্যাপার ঘটিয়াছে। পিতার অবসন্ন মুখমণ্ডল নিরীক্ষণ করিয়া সামান্য অপ্রতিভ এবং আশঙ্কিতও হইল এবং যখন দেখিল কতক্ষণ হইল তিনি চোখও মেলিতেছেন না, বরঞ্চ একটা

ব্যথা চাপিবাব চেষ্টা করিতেছেন, তখন কি কর্তব্য বুঝিতে না পাবিয়া আগাইযা আসিয়া সহসা বাবাব পায়ের উপব ঢিপ্ করিয়া একটা প্রণাম কবিয়া বসিল।

দুর্গাপ্রসন্ন চোখ মেলিয়া চাহিলেন।

বাজা এইবাব সাহস পাইল। কহিল, 'বাবা, আমাব হবিণ কোথায ? হরিণ আনো নাই কেন ? আমি না তোমাকে কত কবে বলে দিলাম। তুমি তো বললে আনবে। তবে আনলে না কেন ? পাওয়া গেল না ? একটাও না ? তবে তুমি বলেছিলে কেন যে—'

'রাজা, তুই একটা আস্ত বাঁদর হয়েছিস,' দুর্গাপ্রসন্ন সম্বিৎ ফিরিযা পাইয়া গম্ভীবস্বরে তিবস্কার কবিয়া কহিলেন। অথচ সমগ্র জলপথ তিনি কল্পনা কবিয়া আসিয়াছিলেন, দেখা হইলেই বাজাকে কেমন স্নেহ-সম্ভাষণ করিবেন, কত আদর কবিবেন।

রাজা অবিশ্বাসেব সঙ্গে চাহিয়া কহিল,—'ধ্যেৎ, হবিণ চাইলে বুঝি বাঁদব হয়। মাবও তো ছোটবেলায় হবিণ ছিল। তবে মা বুঝি—'

অন্যসময় হইলে দুর্গাপ্রসন্ন হাসিয়া ফেলিতেন। এখন গম্ভীব কণ্ঠে কহিলেন, 'কি কবছিলি নদীব পাডে দাঁডিষে, হনুমান ? চোখে ঝড দেখতে পাস্ না ?'

'বেশ তো!' বাজা প্রতিবাদেব স্ববে কহিল, 'আমি তো নৌকাডুবি দেখতেই দাঁডিয়েছিলাম। ঝড ছাড়া নৌকা ডুবতে বয়ে গেল।'

'নৌকাডুবি। কোথায় নৌকাডুবি ?'

'আমাদেব ঘাটের সামনেই তো কাল একটা ডুবে গেল। বা মজা নৌকাডুবি দেখতে। নৌকা কেবল পাক খায়, কেবলই পাক খায়। আব মাঝিরা, বুঝলে বাবা, বৈঠা মাথার ওপরে উঠিয়ে কেবলই 'আল্লা আল্লা' বলে চেঁচিয়ে একশেষ।—আর গলুইটা না, একবার জলেব মধ্যে ডোবে, আবার ভেসে ওঠে। যা তামসা, হি হি—'

দুর্গাপ্রসন্ন সাতঙ্কে কহিলেন, 'কালও দাঁড়িয়েছিলি ?'

'বাঃ রে, কাল তো আমি আর একলা ছিলাম না—সরকার মশায় ছিল, গোবর্দ্ধন পেয়াদা ছিল, রাম চৌবে ছিল, হরি ভূঁইমালি ছিল, আরও কত সব! সওয়ারিগুলির যা কান্না—হেসে আর বাঁচি না। এমন সময় না, একখানা দমকা বাতাস—আর নৌকাটা না, একেবারে কাৎ! ছিটকে জলে পড়ে যা তাদের হাত-পা ছোঁড়া—হাসতে হাসতে আমার পেট ফাটে আর কি—হি হি হি—ব্যাঙের মতন—হি হি—আজ আরেকটা ডোবে তো বেশ হয়—'

দুর্গাপ্রসন্ন স্তম্ভিত হইয়া রাজার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। সুকুমার সুন্দর একটা মুখ—প্রায় মেয়ের মত কমনীয়। হরিণের মত দুইটা চঞ্চল চোখ, তার উপর বাঁকা বাঁকা জিজ্ঞাসু ভুরু, চওড়া কপালে এবং তীক্ষ্ণ নাসিকায় ঔদার্য্যের ছাপ মাখান। অথচ এই ক্ষুদ্র সুন্দর শিশু নিষ্ঠুরের মতন পরের বিপদের মধ্যে এমন অদ্ভুত আনন্দ পাইল কেমন করিয়া? পরের মৃত্যু তার কাছে হাসিবার জিনিষ, তামাসা দেখিবার মত রঙ্গ। সহসা দুর্গাপ্রসন্ন চমকিয়া উঠিলেন। ইহা কি তবে পদ্মার সর্ব্বনাশা দান?—পদ্মার কোলে বড় হইবার অনভিপ্রেত ফল? পদ্মার হিংস্রতা তার ক্রোড়-লালিত সন্তানের মধ্যে সংক্রমিত হইবে, ইহাতে বিস্মিত হইলে চলিবে কেন? দুর্গাপ্রসন্ন শিহরিয়া উঠিলেন। আপনার অজ্ঞাতে এই শিশু কী বীভৎস শিক্ষা পাইতেছে! যদি বড় হইয়া রাজা এমনি পরের দুঃখে আনন্দিত হয়—দয়া, সহানুভূতি, পরদুঃখকাতরতা তার কাছে অর্থহীন মূল্যহীন বৃত্তিমাত্র মনে হয়, তবে তার দায়িত্ব রাজার নহে, দুর্গাপ্রসন্নের। কেন তিনি শৈশবে পদ্মার কাছ হইতে তাকে দূরে রাখেন নাই—কেন এই শিশুর রক্তের মধ্যে পদ্মার সঙ্গীত মিশিতে দিয়াছেন।

'জলে পড়ে লোকগুলি মরে গেল?' দুর্গাপ্রসন্ন সোদ্বেগে প্রশ্ন করিলেন।

'বাঃ রে, আমরা তাড়াতাড়ি গেলাম যে—নইলে মরেই তো যেত।' রাজা নির্লিপ্তস্বরে জবাব দিল।

'তুইও গেলি?'

'বাঃ, গেলাম না বুঝি! বউটার খুকিটাকে আমিই তুললাম না! সরকার-মশায়রা কি ওকে দেখতে পেয়েছিল?' সগর্ব্বে রাজা কহিল।

'ঝড়ের মধ্যে তুই গেলি?'

'না গেলে খুকিটা যেন বাঁচত।' রাজা নাক কুঁচকাইয়া ঠোঁট বাঁকা করিয়া কহিল। 'আমিই তো ডুব-সাঁতার দিয়ে ওকে ওঠালাম—জিজ্ঞেস করো না সবাইকে।'

দুর্গাপ্রসন্ন বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। ঝড়ের ক্ষিপ্ত পদ্মায় এই বালক ডিঙিতে শুধু যদি অন্যান্যের সঙ্গী হিসাবে যাইত, তবেই তাহা দুঃসাহসিকতার চরম হইত। কিন্তু শুধু তাহাই নহে, পদ্মার মথিত জলরাশির মধ্যে তাঁর রাজা লাফাইয়া পড়িয়াছিল, হিংস্র স্রোত এবং ঢেউয়ের সঙ্গে সংগ্রাম করিয়া আসিয়াছে, ভাবিতেই দুর্গাপ্রসন্ন বারম্বার শিহরিয়া উঠিলেন। স্খলিত কণ্ঠে কহিলেন, 'ঝড়ের মধ্যে তুই গাঙে নাম্‌লি?'

রাজা এইবার ঈষৎ উষ্ণ হইয়া কহিল, 'বাঃ রে, আমরা তো পাড়ের কাছেই নেমেছি। না নামলে খুকুটা যে ডুবে যেত তার কি? ও ডুবলে বুঝি আর কারুর গায়ে লাগে না, না?'

বস্তুত, রাজার এই কীর্ত্তিতে আমলা এবং পাইকেরা ভয়ে তটস্থ ছিল—পাছে ইহা কর্ত্তার কানে যায়। ঝড়ের কিছু উপশম হইলে জলমগ্নের উদ্ধারার্থ ডিঙি লইয়া ইহারা যখন অগ্রসর হইয়াছিল, তখন রাজা কোন্ অদৃশ্য হইতে যে তাহাদের সঙ্গী হয়, কখনই বা অন্যান্যের সঙ্গে তীরের

কাছাকাছি পদ্মার জলে লাফাইয়া পড়িয়া বিপন্নদের উদ্ধারে ব্রতী হয়, পাইকেরা প্রথমে তাহা টেরই পায় নাই ; একটা ছোট্ট শিশুকে বুকে চাপিয়া শ্রান্ত অবসন্ন রাজা যখন পাড়ে আসিয়া উঠিল, তখন তাহাকে দেখিয়া কাছারির আপামর সাধারণ প্রমাদ গণিয়াছিল।

দুর্গাপ্রসন্ন কহিতে লাগিলেন, 'অম্বিকার কি একটুও কাণ্ডজ্ঞান নেই— অনায়াসে পাগ্‌লা-নদীর মধ্যে তোকে যেতে দিলে। কী যে আমি করবো এই মূর্খের দল নিয়ে। ওরে বাঁদর, তুই নিজেই যে ডুবতিস্!'

রাজা কহিল, 'ঈস, আমি কিনা সাঁতার জানি না—ডুববো! পদ্মার ভারি সাধ্যি কি না। খুকিটাকে আমি না বাঁচালাম, ভগমান খুসি হয়ে আমাকে কি দেয় দেখো।'

পদ্মার উপর দুর্গাপ্রসন্নের আর অভিযোগ রহিল না। পদ্মা যেমন মানুষকে হিংস্র-নির্দ্দয় করে, তেমনি তার অন্তরের পরিধি বাড়াইয়া দেয়, শৌর্য্যে বুক ভরিয়া তোলে। পদ্মা এক হাতে গ্রাম ভাঙে, অন্য হাতে নতুন মাটি শস্যে ভরিয়া উপহার দেয়—সংহারিণী মূর্ত্তি মাতৃ-মূর্ত্তিতে রূপান্তরিত হইয়া ওঠে।

এতক্ষণ পরে দুর্গাপ্রসন্ন স্মিত হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কি দেবেন ভগবান তোকে?'

'একটা হরিণ দিলেই ভাল হয়,' রাজা চোখ মিটিমিটি করিয়া দুষ্টু হাসিয়া কহিল।

'বেশ, দেবেন, তাই দেবেন। তোর জন্য দুইটা হরিণ এনেছি, রাজা। চক্রবর্ত্তীর নৌকোয় আসচে, দু' তিন দিনের মধ্যেই এসে পড়বে দেখিস।'

রাজা পরম পুলকের সঙ্গে দন্তগুলি সমস্তই বিকশিত করিয়া ফেলিল। কহিল, 'কেমন, দেখলে তো ভগমান আছেন কি না।'

দুর্গাপ্রসন্ন হাসিয়া কহিলেন, 'হ্যাঁ, দেখলাম।'

## তিন

পূজা আসিয়া পড়িল। জমিদার-বাড়ির পূজার জন্য সারাটা গ্রাম উৎসুক হইয়া থাকে, এবং আয়োজন তার অনুপাতেই করিতে হয়। অষ্টমী পূজার দিন সমস্ত গ্রামের নিমন্ত্রণ হয় জমিদার-বাড়িতে, তাছাড়া বাকি কয়দিন গ্রামের অর্দ্ধেক লোক নানা অজুহাতে এইখানেই দক্ষিণ হস্তের ব্যাপারগুলি সমাধা করে। প্রায় প্রতি রাত্রেই কবির লড়াই, কীর্ত্তন এবং বাউল সঙ্গীতাদি হইয়া থাকে। বাউল এবং বৈষ্ণবের জন্য দুর্গাপ্রসন্নের এক অদ্ভুত মমতা। তাঁর মনের মধ্যে শাক্তের সঙ্গে বৈষ্ণবের এক আশ্চর্য্য সমন্বয় হইয়াছে।

কিন্তু পূজার ঢাক বাজিয়া উঠিতেই পদ্মা সহসা মারমূর্ত্তি ধারণ করিল। গত মাসাধিককাল হইতে পদ্মার ভাঙন বন্ধ ছিল, কে জানে দেবার্চ্চনার আয়োজন দেখিয়া পুলকিত হইয়া কি না, পদ্মা মাটি ভাঙিয়া অগ্রসর হইবার বাসনায় তর্জ্জন আরম্ভ করিল। ক্ষুরধার জলস্রোত পাড়ের মাটিতে অবিশ্রাম আঘাত করিতে লাগিল, যেন এক অদৃশ্য তরবারির আঘাতে সুকঠিন মাটি শস্যের মত গড়াইয়া পড়িল—পঙ্কিল নদীস্রোত এবং শ্যামল ধরিত্রীতে সংগ্রাম বাঁধিয়া গেল। সারাদিন ঝুপ্ঝাপ্ করিয়া চড়া ভাঙিয়া পড়িতেছে। কীর্ত্তিনাশার প্রচণ্ড ক্ষুধার যেন তৃপ্তি নাই, একখণ্ড মাটি গ্রাস করিয়া ক্ষণকাল সে তুষ্ণীভাব ধারণ করে, তারপর পুনরায় বর্দ্ধিত বুভুক্ষায় দাঁত বাহির করিয়া মাটি গিলিতে আসে। মাটির উপর আর নির্ভরতাবোধ থাকে না, সে যে কত ভঙ্গুর, পদ্মার এই বিক্রমের নিকট তাহা সুস্পষ্ট হইয়া ওঠে।

হেমাঙ্গিনী গত কয়দিন ভালই ছিলেন। স্বামীর সান্নিধ্যে মনে জোর পাইয়া তিনি অপেক্ষাকৃত স্বাভাবিক হইয়া উঠিয়াছিলেন। পদ্মার এই ভাঙন শুরু হওয়া মাত্র এক মুহূর্ত্তে তাঁহার সমস্ত আতঙ্ক ফিরিয়া আসিল। চোখের দৃষ্টি এবং কণ্ঠস্বর দেখিতে দেখিতে পূর্ব্বের মতো অস্বাভাবিক হইয়া

উঠিল, দুর্ব্বল স্নায়ুমণ্ডলী ভাঙিয়া পড়িল। হেমাঙ্গিনী প্রায় বিকারগ্রস্তা হইয়া উঠিলেন।

কন্যা হৈমন্তী পূজায় আসিতে পা'রে, এমন একটা আশা তিনি পোষণ করিতেছিলেন। গত কল্য হৈমন্তীর চিঠি আসিয়া পৌঁছে। সে লিখিয়াছে, তাহাদের এইবার আসা হইবে না, মুসৌরী পাহাড়ে হাওয়া বদ্‌লাইতে যাওয়া ঠিক হইয়াছে। বিশেষ পদ্মা যখন এমন ভাঙিতেছে, তখন উনি কিছুতেই যাইতে দিতে চান না—ইত্যাদি। দুপুরে এ বিষয়ে স্বামী-স্ত্রীর কিছু আলোচনা হইয়াছিল, এবং বৈকাল হইতে হেমাঙ্গিনী সহসা প্রলাপ বকা আরম্ভ করিলেন।

'শুনচো, ওগো শুনচো? একবার নিচে তাকিয়ে দেখ তো, পদ্মা কতটা এগিয়ে এসেচে? মস্ত বড় একটা পাড় ভেঙে পড়ল না? অ্যাঁ, জানালার তলায় এসে পড়েচে নাকি?—স্রোতের শব্দ আমি যে কানের কাছে শুনতে পাচ্চি—কী সর্ব্বনাশ!—ওগো, আমাদের কি হবে!'

'পদ্মা এখনও ঢের দূরে—শুধু শুধু কেন ভয় পাচ্চ।' শিয়রের কাছ হইতে দুর্গাপ্রসন্ন আশ্বাস দিয়া কহিলেন।

'না, না, আর দূর কোথায়? রোজ, রাত্রিদিন, প্রতিক্ষণ রাক্ষসী যে হাঁ করে ছুটে আসচে।—ঐ তো, ঐ তো, শোন!'

'এগিয়ে আসা কি সোজা কথা!—দুমাসের আগে পদ্মা কাছেই এগুতে পারবে না।—একটু ঘুমোতে চেষ্টা কর, হেম। পদ্মাকে মিছিমিছি ভয় করে তুমি শরীর নষ্ট করচো—ছি!'

হেমাঙ্গিনী সহসা বিছানাতে সোজা হইয়া বসিলেন; অস্বাভাবিক দৃষ্টিতে চতুর্দ্দিকে চাহিয়া কহিয়া উঠিলেন, 'আমি দেখব—পদ্মাকে দেখব। দেখি রাক্ষসী কতটা এগিয়ে এসেচে, কত বড় জিব বের করে' আসচে—ওর ভয়ে হৈম যে আসতে পাবে না, দেখচো না?'

দুর্গাপ্রসন্ন তাঁহাকে তাড়াতাড়ি ধরিয়া শোয়াইয়া দিলেন। বুঝিলেন;

আর দেরি করা চলিবে না, অবিলম্বে এ-স্থান ত্যাগ করিতে হইবে। এখানে হেমাঙ্গিনী আর একটুও নিরাপদ নয়, পদ্মার জন্য এক অজ্ঞাত অস্পষ্ট ভয় তাহার মধ্যে এমন অবিচ্ছেদ্য ভাবে প্রবেশ করিয়াছে যে, কোনও আশ্বাসই তাহার কাছে ফলপ্রদ হইবে না। পদ্মার নিকট হইতে তাকে বহুদূরে সবান দরকার।

কিন্তু পূজার চারদিন না কাটাইয়া কোনও প্রকারেই যাওয়া সম্ভবপর নয়। আজ অধিবাস; ইহার পর তিনদিন পূজা হইয়া চতুর্থ দিনে বিসর্জ্জন হইবে। পূজার বিরাট এবং দায়িত্ব-বহুল আয়োজনের মধ্যে অকস্মাৎ দুর্গাপ্রসন্নের চলিয়া যাওয়া কিছুতেই চলে না। তিনি মনে মনে স্থির করিলেন, দশমীর পরের দিন সপরিবারে কলিকাতা যাত্রা করিবেন,—এবং সেখানে যাইয়া স্ত্রীর যথোপযুক্ত চিকিৎসার ব্যবস্থা করিবেন। স্নায়ু-বিকৃতি ছাড়া রোগ আর কিছু নয়, তাহা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে, কিন্তু এই স্নায়ু-বিকৃতি যে কত গুরুতর হইতে পারে তাহা দুর্গাপ্রসন্নের পক্ষে সম্পূর্ণ উপলব্ধি করা সহজ নয়।

এই কয়দিন শ্রীমান রজতপ্রসন্ন ওরফে রাজার একটুমাত্র ফুরসৎ নাই। দুর্গামণ্ডপ ছাড়িয়া একদণ্ডও সে কোথাও নড়ে না। দুর্গাপ্রতিমা তাহার কাছে প্রতীক-মাত্র নয়—ইহা প্রকৃতই ভগবতীর জন্ম-পরিগ্রহ। তাই অবাক্ বিস্ময়ে এবং সুগভীর সম্ভ্রমের সহিত অনন্যমনা হইয়া সে দেখিতে থাকে কেমন করিয়া বিশ্বের জননী আদিশক্তি দশভুজা মৃৎ-শিল্পীর হস্তে একটু একটু করিয়া আত্মপ্রকাশ করিতেছেন। মূর্ত্তি সৃষ্টি রাজার নিকট জগত-সৃষ্টির মতই বিস্ময়কর।

মূর্ত্তিতে মাটি দিবার সময় যদিই বা তার নাওয়া-খাওয়া জ্ঞান ছিল, এখন আর তাও নাই। রং দেওয়া সমাপ্ত হইয়া আজ রাংতা সাজান হইতেছে, দুর্গামার এই সব অপরিমিত বৈভব দেখিয়া রাজা গভীরভাবে

আকৃষ্ট ও শ্রদ্ধান্বিত হইয়াছে। মুগ্ধ হইয়া প্রতিমার দিকে তাকাইয়া থাকিতে থাকিতে দুই চোখ তার জলে ভরিয়া উঠে।

কিন্তু এখনও সবার চেয়ে বড় বিস্ময় বাকি ছিল। প্রতিমার চোখ আঁকিবার পর পুরোহিত মন্ত্র দ্বারা প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করিলে তবেই নাকি মাটির মূর্ত্তিতে দেবীশক্তি আসিয়া আবির্ভূত হয়। কি করিয়া এমন বিস্ময়কর পরিবর্ত্তন ঘটে তাহা প্রত্যক্ষ করিবার জন্য রাজার ঔৎসুক্যের আর সীমা নাই। কুমোরেরা ইচ্ছা করিয়াই যে চক্ষু আঁকিতে এমন বিলম্ব করিতেছে, তাহাতে রাজার আর সন্দেহমাত্র রহিল না। আশঙ্কা হইতে লাগিল—'আচ্ছা, এখন যদি কুমোরেরা রাগ করে চোখ না এঁকেই চলে যায়, তবে উপায়?' এক জায়গায় জড়ো হইয়া ওরা ফিস্‌ফাস্ করিয়া কি কহিতেছে? ঘোঁট পাকাইতেছে না তো? পুরোহিত অনন্ত চক্রবর্ত্তীর ব্যবহারটাও তার কাছে কম নিন্দনীয় মনে হইল না। কুমোরদের তাড়া দিয়া চক্ষু বসাইয়া লওয়া দূরের কথা, চণ্ডীমণ্ডপের কাঠের খুঁটায় ঠেস্ দিয়া সে এমনি নির্লিপ্ত আনন্দের সহিত হুঁকা টানিতেছে যে, স্পষ্ট বুঝিতে পারা গেল, পূজা পার হইয়া গেলও সে কাহাকেও তাড়া দিবে না।

রাজা অধৈর্য্য হইয়া আগাইয়া গিয়া কহিল—'কখন পূজো আরম্ভ হবে, ঠাকুরমশায়?'

অনন্ত চক্রবর্ত্তী ধূম উদ্গীরণ করিতে করিতে তাকাইয়া রাজাকে দেখিতে পাইয়া দাড়ির মধ্য হইতে হাসিটাকে বাহিরে আনিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু সফল হইলেন না। কিন্তু স্নেহস্বরে কহিলেন, 'হইব, বাবা, হইব, অক্ষণি হইব—ভিতর থেইকা কিছু পান আনাইয়া দিতে পার? ও মোক্ষদা, ভিতরে যাও নাকি?—গোটা কয়েক পান বানাইয়া দিয়া যাইও। পুণ্য হইব, বুঝলা?'

মোক্ষদা ঝি অন্তঃপুরের দিকে যাইতেছিল, ঈষৎ হাসিয়া কহিল, 'দিমু

নে, ঠাকুরমশয়, হাতটা অবসর হইলেই দিয়া যামুনে।—যা কাম পড়ছে, চউখে মুখে পথ দেখি না। সময় পাইলেই দিয়া যামুনে—'

'বেশ, বেশ, একটু তড়াতড়ি কইরো, আবার পূজায় বসতে হইব কিনা। ওরে ও হীরু, যাতো বাবা একবার বাড়িতে, আফিমের কৌটোটা চাইয়া নিয়া আয় তো—আমার শিয়রের পাশেই আছে। মৌতাত চড়াইয়া বসি—কি বলস্ নাপ্‌তের পো? একবার পূজোয় বইলে রাত কত হয়, কে জানে।'

নাপ্‌তের-পো রসিক প্রামাণিক চক্রবর্ত্তী মশায়ের কলিকার প্রত্যাশায় বসিয়াছিল, সায় দিয়া কহিল, 'আইজ্ঞা, ঠিকই কইছেন, ওষুধ-বিষুধে নি অবইজ্ঞা দেখায়! তাইলে ত্যাহের তাগদ থাকব ক্যামতে?'

'শুনলি হীরু—যা বল্লাম, কানে গেল তো? বলি গপ্পটা তো ফুরাইয়া যাইব না, এইদিকে কত রাত হইল তার খ্যাল আছে?—যত্ত অবাধ্য হয় আইজকাইলকার পোলাপান।—তা রাজাবাবু, ভয় কি, পূজো শীগগিরই আরম্ভ কইরা দিমু। পারবা, জাগতে পারবা—চটুপইটা ছেইলা আছ—ও কুমারেরা, তামুক-টামুক যা খাওনের এই বেলা সাইরা লও, চক্ষুদানের রং গুলতে লাগব। প্যাটটা আবার মোচড় দিয়া উঠল য্যান—এই সন্ধ্যাবেলায় আবার স্নান করাইব নাকি?'

রাজার ইচ্ছা হইতেছিল অনন্ত চক্রবর্ত্তীর সুদীর্ঘ শিখাটার ডগা ধরিয়া হিড়্ হিড়্ করিয়া দুর্গামণ্ডপে টানিয়া লইয়া গিয়া কর্ত্তব্য সম্বন্ধে তাহাকে অবহিত করে, কিন্তু সে কল্পনাটা বেশিক্ষণ থাকিল না। দূরে দেখা গেল, জগবন্ধু ঢুলি তার বিরাট ঢাকটা কাঁধে ফেলিয়া কুঁজো হইয়া আঙ্গিনার একপ্রান্তে আবির্ভূত হইয়াছে। রাজার আর বিলম্ব হইল না, ছুটিতে ছুটিতে সে জগবন্ধুর নিকট উপস্থিত হইল।

জগবন্ধুর ঐক্যতান বাদনের একমাত্র সঙ্গীস্বরূপ সঙ্গে আনিয়াছে তার একমাত্র পুত্র কেবলরামকে। রুগ্ন দুর্ব্বল ছেলেটা, এক এক করিয়া

পাঁজরাগুলি গোণা যায়, এমনি রোগা। তাহার উপর তার চোখে-মুখে এমনই হতভম্ব বিস্ময় এবং নিবিড় আশঙ্কার ছাপ সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে যে, ওকে দেখিয়া হাসিয়া উঠিব, না সহানুভূতি করিব, স্থির করিতে একটু সময় লাগে। কাঁসিটা হাতে করিয়া বাপের পিছনে পিছনে সে এমনি শঙ্কিতভাবে অগ্রসর হইতে লাগিল যে মনে হইল ভয়ে হৃৎপিণ্ডের কার্য্য বন্ধ হইয়া যে কোন মুহূর্ত্তে সে পরলোকে প্রস্থান করিতে পারে—জমিদার-বাড়িতে সঙ্গৎ করিতে আসা তার পক্ষে এমনি দুঃসাহসিক ব্যাপার।

লাল সালুতে আচ্ছাদিত ঢাকটা জগবন্ধু অপূর্ব্ব মমতার সঙ্গে দুর্গা-মণ্ডপের নিচে একপ্রান্তে নামাইয়া রাখিল। জগবন্ধু জমিদার-বাড়ির বাঁধা ঢাকি। একটামাত্র ঢাকের শব্দে সে এক-বাড়ি লোকের কানে তালা লাগাইয়া দিতে পারে। কোরা ধুতির উপর শাদা ফতুয়াটা সগর্ব্বে গায়ে দিয়া লাল গামছাখানা কাঁধে ফেলিয়াছে। সারা বৎসর ধরিয়া এই দিনগুলির সে স্বপ্ন দেখে, এবং অল্প কয়টি দিনে সগৌরবে নিজের সমস্ত কৃতিত্বের পরিচয় দিয়া ছাড়ে। পূর্ব্বে কাঁসি পিটাইবার জন্য লোক ভাড়া করিয়া আনিতে হইত, এ-বৎসর পুত্র কেবলরামকে বহুপ্রযত্নে শিক্ষা দিয়া সেই গুরুতর কার্য্য সম্পাদনের জন্য সঙ্গে আনিয়াছে।

'ও কে, জগবন্ধু?' রাজা কৌতূহলী হইয়া জিজ্ঞাসা করিল।

জগবন্ধু গর্ব্বের সঙ্গে কহিল, 'ও আমার কোকা, ক্যাবলরাম। ঢাকের সঙ্গে ওই এইবার কাঁসি বাজাইব, দেইখেন নে, কর্ত্তা।'

'ও পারবে?'

'তা আর পারব না, ছোটবাবু, অরে আমি নিজ হাতে শিখাইছি না! জগবন্ধু মণ্ডল চউখ বুজলে অরই তো কর্ত্তাবাড়ির কামকম্ম দেখতে লাগব—সময় থাকতে না শিখলে চলবো ক্যামতে—'

বাজা একজন আশঙ্কিত সমজদাবের মত গম্ভীব হইয়া কহিল, ‘ও পারলে হয়।—এই শুনচিস, বাজাতো দেখি, কি বকম বাজাতে পারিস!’

এক মিনিটও বিলম্ব হইল না—চকিতে কাঁসিটা বাঁ-হাত দিয়া ঊর্দ্ধে তুলিয়া ডান হাতেব কাঠিসহযোগে কেবলবাম ঢং ঢং ঢঢং করিয়া বাজনা শুরু করিয়া দিল। দুই চোখ কপালে উঠিয়াছে, ঠোঁট কাঁপিতেছে, ঢোঁক গিলিতে কষ্ট হইতেছে, কিন্তু হাত থামিতেছে না। অসাধাবণ নৈপুণ্যের সঙ্গে সে কাঁসিটা পিটাইয়াই চলিল।

সহসা কাঁসিতে ঢং শব্দ কবিবাব পবিবর্ত্তে কেবলবাম নিজেই ‘ভ্যাঁ’ করিয়া উঠিল। তখন দেখা গেল, পিছন হইতে সবকাব-মশায় আসিয়া কখন তার একটি কান সজোবে চাপিয়া ধবিয়াছেন।

‘লক্ষ্মীছাডা, ঢং ঢং কবে থালা থাবডিযে বাডি মাথায তুলেছ! কর্ত্রীমাব দারুণ ব্যামো, ছট্‌ফট্ করে মবছেন, মাথাটি বালিশ থেকে ওঠাতে পাবছেন না—তাব কি একটু হুঁস আছে! এ-বাঁদর এসেছে কোথা থেকে? থাল পিটুচ্ছেন! পিটুবি আব?’ কানে আর একটা জোর মোচড দিয়া ছাডিয়া দিয়া সরকাব-মশায় দাঁত কিডমিড করিতে লাগিলেন।

কেবলরাম ভয়ে মূর্চ্ছা যায আব কি! ভ্যাঁ-শব্দটুকু আব গলা হইতে বাহিব হইল না, শুধু বলিব পাঁঠাব মত সে ঠক্ ঠক্ কবিয়া কাঁপিতে লাগিল।

জগবন্ধু বিনীতকণ্ঠে কহিল, ‘পেন্নাম হই, সবকাব মশয়। আইজ্ঞা, কর্ত্রীমাব ব্যামোব কথাটা একটুনি জানি, জান্‌’ল অবেনি আমি বাজাইতে দেই। ঈস্, বড় অন্যায় হইয়া গেছে—ছি ছি। পোলাপান মানুষ, এই বাবটা মাফ কবেন!’

‘হ্যাঃ, মাফ কববে!’ অম্বিকা আস্ফালন কবিয়া ভেংচাইয়া কহিল,

'মাফেব তো আর মা-বাপ নেই, মাফ করলেই হোল। দেখতো—একটু কি মগজে বুদ্ধি আছে—ঢং ঢং কবে এমনটা থালা পিটোলে ভালমানুষেবই মাথাব বগ ছিঁডে আসে—বলি, তোবা পেয়েচিস কি, বল দেখি? ওরে ছোটলোক ব্যাটাবা, অসুখ যদি এখন বেডে ওঠে? আমি তো মাফ্ কবলুম, কিন্তু তখন? বুডোধাডী, বলি তোবই আক্কেলটা কি শুনি? এই বাঁদবটাকে—ঈস্, একবার কাণ্ডখানা দেখতো—ওবে হতভাগা—'

বাজা আগাইয়া আসিয়া অম্বিকাচবণেব নিকটবর্ত্তী হইল। মুখটা উর্দ্ধে উঠাইয়া কহিল—'ওব দোষ কি সবকাব-মশায়, আমিই তো বলেছিলাম ওকে বাজাতে, তাইতো ও বাজিয়েছে—ও কি নিজে বাজিয়েছে? তবে ওকে মাববেন কেন?'

জগবন্ধু কহিল, 'তবে ছ্যাখেন তো ছোটবাবু, ও কি আব নিজে বাজাইছে—আপনে কওনে তো—'

অম্বিকাচবণ গলাব পর্দ্দা শেষ মাত্রায উঠাইয়া চিৎকাব কবিয়া কহিলেন, 'ছোটবাবুব কথায তবে তুমি ঘবেব চালে আগুন লাগিয়ে দাও—বামুনেব হুঁকোতে গিযে টান লাগাও। ব্যাটা গণ্ড-মুখ্খু, বলতে একটু লজ্জা হলো না!—নইলে আব বলে ছোটলোক!—দেখ, এই আমি সাবধান কবে দিলাম,—একটা ঢোলেব চাটি আমি শুনেচি, কি আব বক্ষা নেই, ঘাড ধবে আমি বাডিব বাইবে বেব কবে না দিই তো আমাব নাম—। কর্ত্তাব হুকুম, ঢোল কবতাল, বাডিব ত্রিসীমানায় ঢুকতে পাববে না—ব্যস্!'

অম্বিকা কর্ত্রীর বাপেব বাডি পশ্চিমবঙ্গেব লোক। তাব দাপট প্রচণ্ড।

বাজা ঠোঁট বাঁকাইয়া অবজ্ঞাব সঙ্গে এই বীবোক্তি-সকল শুনিতেছিল। কহিল—'পূজোব সময় বাজাবে না বুঝি? বাজাবে, বেশ করবে! তুমি খুব বাজিও, জগবন্ধু—বাবাকে আমি বলব'খন, বুঝলে!—কাঁদিস্

না রে, কেবলরাম, তোকে আমি একটা লাট্টু দেব, দেখিস্। বুড়োধাড়ী এসে ছোটছেলেকে মারে, লজ্জা করে না! নিজেকে মারলে তখন কেমন লাগে! বাবা যদি শোনে তখন দেখিস!'

শেষের সম্ভাবনাটায় অম্বিকাচরণ সহসা দমিয়া গেল। কহিল—'মারলাম! কই, মারলাম আবার কখন? বাড়িতে কর্ত্রীমার সাজ্যাতিক ব্যামো, শাসন করে দিয়ে গেলাম, তাতেই মারা হলো!—শুনচো, ছোট-বাবু, বাইরে এমনটা দাঁড়িয়ে থেকো না, চালের তলায় যাও—কথার অবাধ্য হয়ো না। এই কার্ত্তিক মাসের রাতে হিম লাগিয়ে একটা অসুখ-বিসুখ করে বস, আর আমাদের ছুটাছুটি করতে করতে জান্ বেরিয়ে আসুক—'

রাজা অম্বিকাচরণের উপর আন্তরিক ক্রুদ্ধ হইয়াছিল। একে তো সে তার এত লোভের ঢাকের বাদ্য বন্ধ করিবার উপক্রম করিয়াছে, তার উপর এমন করিয়া আসিয়া কেবলরামের কান মলিয়া দিল। অপ্রতিভ ভীতু ছেলেটার চেহারা দেখিয়া যেমন রাজার হাসি আসিতে চায়, তেমনি দুঃখও হয়, তার কথাতেই তো বোকা ছেলেটা এমন করিয়া একঘেয়ে কাঁসি পিটাইয়া নিজের কৃতিত্বের পরিচয় দিতে গিয়াছিল।

অম্বিকাচরণের উপদেশে সে রাগিয়া কহিল, 'বেশ করবো, একশো বার বাইরে দাঁড়িয়ে থাকব—আমার যা ইচ্ছা করব। আমি বড় হলে না, কেবলরাম, তুই কেবলই আমার কাছে কাঁসি বাজাবি, আর আমি কেবলই কাঁসির বাজনা শুনব, ভাল ক'রে কাঁসি-পেটানোটা শিখে রাখিস।'—বলিয়া রাজা বীরের ভঙ্গিতে হাত দুইটা বুকের উপর দিয়া আড়াআড়ি ভাবে লইয়া বগলে চাপিল। ভাবটা এই যে, সরকার-মশায় তো দূরের কথা, জগতের কাউকেই সে ভ্রূক্ষেপ করে না।

যাইবার পথে অম্বিকা পুরোহিত অনন্ত চক্রবর্ত্তীর নিকট জানাইল—'বড় দুরন্ত ছেলে, কথাবার্ত্তা যদি একটু শোনে!'

চক্রবর্ত্তী কহিলেন—'পোলাপানের কথা গায়ে মাখ ক্যান। তার উপুর বাঘের বাচ্চা—শুনচ, মোক্ষদা, পানগুলি তো অখনও পাইলাম না। ব্রাহ্মণকে কষ্ট দিয়া কি সগ্‌গে যাওন যায়—হ্যাঁ, কি কইতে আছিলাম, বাঘের বাচ্চা ;—সবটা টাইনা শ্যাষ করিস না, নাপিতের-পো, একটু রাখিস,—বুড়া বয়সে শরীর গরম রাখতে—ও রাজাবাবু, শোন তো বাবা, শুইনা যাও—ও কাবিগরেরা—'

রাজা কহিল, 'এই কেবলরাম, শুনচিস !'

কেবল কহিল, 'আইজ্ঞা, কর্ত্তা !'

'শুধু শুধু কি কেউ কাঁসি বাজায়, বোকারাম—ঢাকের সঙ্গে বাজাতে হয়। তোর নামটা কে রেখেছে রে, হি হি হি—। বাতাসা খাবি ? বাড়ির ভেতর যখন যাব, পকেট ভরে' নিয়ে আসব। তখন তোকে দেবো অখন, বুঝলি ?'

কেবলরাম কেবল কহিল—'আইজ্ঞা।'

## চার

শহর হইতে বড় ডাক্তার পাঠাইবার জন্য দুর্গাপ্রসন্ন ঢাকায় আত্মীয়দের নিকট জরুরি তার পাঠাইয়াছেন। প্রতুল ডাক্তার তার যথাসাধ্য করিতেছে সন্দেহ নাই, কিন্তু এই অদ্ভুত রোগিণীর পীড়ার উপশম হওয়া দূরে থাকুক, প্রতিদিনই আরও বাড়িয়া উঠিতেছে। আজ প্রভাত হইতেই বিকার শুরু হইয়াছে, বেলা বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে অস্থিরতাও বাড়িয়া চলিল। রোগিণী এত অজস্র প্রলাপ বকিতে লাগিলেন যে, আশঙ্কায় দুর্গাপ্রসন্ন তটস্থ হইয়া উঠিলেন। ক্ষণে ক্ষণে হেমাঙ্গিনী বিছানা হইতে লাফাইয়া উঠিতে চান, পদ্মার পাড়-ভাঙার শব্দ শুনিবার জন্য উৎকর্ণ হইয়া

অপেক্ষা করেন এবং সে-শব্দ শুনিতে পাইলে ভয়ে চিৎকার করিয়া উঠিয়া ছুটিয়া পালাইতে চেষ্টা করেন।

সন্ধ্যার পর অবস্থা ভাবি আশঙ্কাজনক হইয়া উঠিল। প্রতুল ডাক্তারকে দেখিয়া হেমাঙ্গিনী আবও ক্ষেপিয়া গেলেন। কহিলেন—'কি চাই আপনার? কি চাই এখানে? পদ্মাকে আটকাতে পারেন? স্রোতেব মুখ ঘুবাতে পাবেন? যদি নাই পা'বন, কে চায় আপনাকে? কে চায়?'

'হাতটা একটু দেখি, মা—নাড়িটা দেখব', প্রতুল ডাক্তাব মৃদুকণ্ঠে কহিলেন।

'নদী যে ছুটে আসচে, নাড়ি দেখে হবে কি? ভেঙে যাবে যে সব, বাড়ি-ঘর, ছেলে-মেয়ে, স্বামী-সংসাব, সব যে চুবমাব হয়ে যাবে, তাব কি?'

'কিছু নয়, কিছু নয় মা। ও শুধু মনেব ভয়।' বৃদ্ধ ডাক্তাব আশ্বাস দিয়া কহিলেন।

এমন সময় অদূববর্ত্তী পদ্মায় আবার পাড ভাঙিয়া পডাব শব্দ হইল। শুনিয়া হেমাঙ্গিনী চিৎকাব কবিযা উঠিলেন—'ঐ নিল, নিল সে, সব নিল! আমার বাক্সা কই?—অ্যাঁ, আমাব বাক্সা কই? শুনলে না তোমরা তার চিৎকাব। ওবে কে আছিস্, ছুটে যা। বাক্ষুসী তাকে নিলে রে, নিলে—'

দুর্গাপ্রসন্ন আগাইয়া আসিযা দৃঢস্বরে কহিলেন—'এ কি বলছ, বাক্সাব আবার কি হবে, কিছু হয় নাই। দুর্গামণ্ডপে বসে সে প্রতিমা দেখচে। ওব জন্য মিছিমিছি ভয় পাচ্চ কেন!'

'মিছে কথা বলছ তোমরা—আমাকে ভোলাচ্চ। আমি স্পষ্ট শুনলাম তার গলা—'মা' 'মা' বলে চিৎকার করে সে জলের মধ্যে ডুবে গেল—পদ্মা তাকে—'

'এই তাকে আমি ডেকে পাঠাচ্চি, নিজের চোখে দেখ।—যা তো অতসীর মা, রাজাবাবুকে তাড়াতাড়ি ডেকে নিয়ে আয় তো—ইন্দির-দিদির কাছে পাখাটা দে।' দুর্গাপ্রসন্ন কহিলেন।

অতসীর মা হেমাঙ্গিনীর শিয়রে বসিয়া পাখা করিতেছিল, দুর্গাপ্রসন্নের দূরসম্পর্কীয়া বিধবা বোন্ ইন্দির ঠাকুরাণীর হাতে পাখা দিয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া গেল।

রাজা মহাউৎসাহ সহকারে আরতির উদ্যোগ দেখিতেছিল। মা'র শরীর বেশি খারাপ না হইলে আজও একটু ঢাক বাজাইতে পারিবে—এ আশ্বাস সে বাবার কাছ হইতে আদায় করিয়া লইয়াছে। তাই গভীর আন্তরিকতার সঙ্গে প্রতিমার কাছে সে মনে মনে প্রার্থনা করিতে লাগিল—মাকে অসুখ দিয়ে আর কি লাভ পাচ্ছ, দুগ্‌গা-মা, নিজেই জগবন্ধুর অমন বাজনাটা শুনতে পাচ্ছ না। মাকেও তুমি ভাল ক'রে দাও, বাজনাও শোন। আজিই তো শেষ দিন! কেবলরাম কেমন দুলে দুলে কাঁসি বাজাবে, দেখো। এমন তোমার হাসি পাবে—

'রাজাবাবু, রাজাবাবু, হুনচ নি—'

রাজা ফিরিয়া দেখিল অতসীর মা হন্তদন্ত হইয়া ছুটিয়া আসিতেছে। বলিল—'কিরে বুড়ি, কি চাস্? এখন খেতে-টেতে পারব না, আগেই বলে দিচ্চি। দেখচিস, এইবার আরতি শুরু হবে। মণ্ডাই দিস আর পাতক্ষীরই দিস্, আমি কিছুতেই যাব না।'

অতসীর মা ক্লান্ত অশ্বের মতো সশব্দ নিঃশ্বাস ছাড়িতে ছাড়িতে কহিতে লাগিল—'কর্ত্তাবাবু তোমারে লৌড়াইয়া যাইতে কইচে, ছুইটা আহ।—হুনচ নি, ও ছোটবাবু—'

'ঈস্—ছুইটা আহ!—আর ইদিকে আরতি শুরু হয়ে যাক! দেখ্

অতসীর মা, ও-সব চালাকি চল্‌বে না। বাবার নাম করে মিছিমিছি খেতে ডেকে নিতে চাও, না ?'

'কও কি তুমি, ছোটবাবু! ইদিকে মা ঠাইবাণেব যে শ্বাস উঠচে, তার কি।'

বাজা নির্লিপ্তের মত কহিল—'নিশ্বাস উঠবে না তো কি মবে যাবে না কি-রে বুড়ি। ফাঁকি দিয়ে ভেতবে নিতে চাস্, না ? আমি আর বুঝি চালাকি বুঝি না ?'

নিরুপায় অতসীর মা ব্যাপারটাব গুরুত্ব বুঝাইবার অন্য উপায় খুঁজিয়া না পাইয়া সহসা দুর্গামণ্ডপের মেঝের উপরে মাথা খুঁড়িতে আরম্ভ করিয়া দিল। কহিল—'কিরা, ছোটবাবু, কিরা! ছুইটা যাও,—মা ঠাইরাণের শবীল বড খরাপ লাগতে লাগছে।'

শরীর খাবাপ লাগিবার কথাটায় বাজার সহসা বড আতঙ্ক হইল। কহিল—'দূর, তা নয়। এক্ষুণি ভাল হয়ে যাবে, দেখিস। শবীল খারাপ হলে কিচ্ছু হয় না। যারা ভগমানকে ডাকে, তারা কক্ষণো মরে না, জানিস্। দুগ্‌গা মাকে আব আমি বুঝি বলিনি, মাকে ভাল করে দাও—' বলিতে বলিতে বাজা অন্দবেব দিকে ছুটিতে আবম্ভ কবিল। তাব বড ভয় হইল। পূজাব উৎসবের হৈ-চৈ-এতে মার কাছে বড একটা যাইতে পারে নাই—এই কথাটা মনে পড়িয়া নিজেকে ভারি অপবাধী মনে হইল। অসুখ করিয়াই তো মানুষ মবে ; মাও যদি মরিয়া যায়। 'ধ্যেৎ, ভগমানকে ডাকলে বুঝি আবার কেউ মরে! দুগ্‌গা-মা, মা যেন মরে না, একদিনও যেন মরে না, এক মিনিটের মধ্যে যেন ভাল হয়ে ওঠে—' দৌড়াইতে দৌড়াইতে বাজা দুর্গা-মার উদ্দেশে বারম্বার প্রণাম জানাইতে লাগিল।

রাজাকে দেখিয়া প্রথমটায় যেন হেমাঙ্গিনীর বিশ্বাসই হইল না। কতক্ষণ এম্‌নি করিয়া রাজার দিকে তাকাইয়া রহিলেন যে, রাজা পর্য্যন্ত

থতমত খাইয়া গেল। ঘরেব এতগুলি লোকই বা তার দিকে এমন হাঁ কবিয়া তাকাইয়া আছে কেন। বেশ তো!

দুর্গাপ্রসন্ন গম্ভীব স্বরে কহিলেন—'রাজা, মার কাছে গিয়ে বস।'

সহসা হেমাঙ্গিনী কাঁদিয়া উঠিলেন—'আয় রাজা, আয়, আমার কাছে আয়। একটু বস আমার পাশে। যদি ফেলে যেতে হয়—চিব-দিনেব জন্য যদি ফেলে যেতে হয়—'

বাজা অগ্রসব হইয়া মাব কাছে বসিয়া পড়িল। মায়ের একটা হাত নিজের হাতে উঠাইয়া লইয়া কহিল—'দেখো, এখন আর তোমাব একটু অসুখও থাকবে না। দুগ্‌গা-মাব কাছে আমি খুব কবে' বলে' এসেচি; দেখতে দেখতে তুমি ভাল হয়ে যাবে। শুয়েও থাকতে হবে না, জান্‌লা দিযে কালকেব দশমীব তামাসাটাও দেখতে পাবে—কত আমি বাজি কিনেচি, দেখো। দুগ্‌গা-মাই তো অসুখ দেয়, আবাব অসুখ ভালোও করে দেয়—সব মন্ত্রে হয় কিনা—'

'বাজা, পদ্মা আসচে দেখচিস, হাঁ কবে' ছুটে আসছে?—' হেমাঙ্গিনী যেন এই ক্ষুদ্র বালকেব কাছে আশ্বাস পাইতে চান্—তার বীর পুত্র বাহুবলে পদ্মাকে পবাভূত করুক, এমনিই যেন কিছু একটা আশা কবেন।

'কই আসচে?' বাজা জানালাব দিকে চাহিয়া প্রশ্ন করিল।

'দেখচিস না, কেমন মাটি ভেঙে এগিযে আসচে। আমাদেব ডুবিয়ে দেবে, সব ডুবিয়ে দেবে, ভাসিয়ে দেবে।'

'ধ্যেৎ, আমাদের বুঝি আর নৌকো নেই। কি কবে ডোবাবে। তুমি কিচ্ছুই জান না—হি হি—ডোবাক্ না দেখি কেমন পারে—হি হি। বাবার বজ্‌রা তো ঘাটেই বাঁধা আছে। এখান থেকে তুমি বুঝি কিছুই দেখতে পাও না।'—রাজা বিজ্ঞের মত কহিল।

'রাজা?'

'কিঃ ?'

'পদ্মা যদি আমায় ডুবিয়ে দেয়, মাকে কি তোর মনে থাকবে, রাজা ? একেবারে ভুলে যাবি নে তো ?'

'বাঃ রে, তোমাকে আমি ডুবতে দেব কেন! আমি বুঝি কম সাঁতার জানি! সেদিন খুকিটাকে বাঁচালাম না বুঝি। তুমি এমন ডরাও—হি হি হি—ডুবিয়ে দেবে! ধ্যেৎ—। কিচ্ছু ভয় নেই মা—এক ঘুষি দিয়ে দেব পদ্মাকে ?' বলিয়া দাঁড়াইয়া উঠিয়া পদ্মার উদ্দেশে একটা ঘুষি ছুঁড়িয়া রাজা মাকে আশ্বস্ত করিল, এবং পুনরায় মায়ের কাছে বসিয়া কহিল—'জগবন্ধুর ছেলেটা, জান মা, কি ঢুলে ঢুলেই যে কাঁসি পেটায়, হাসতে হাসতে পেটের নাড়িভুঁড়ি বেরিয়ে আসে—হি হি হি—ও একটা আস্ত উজবুগ। কিন্তু বড় ভাল ছেলে—আমাকে 'কর্ত্তা' 'কর্ত্তা' বলে ডাকে। সরকার-মশায় শুধু শুধু সেদিন ওর—'

পা টিপিয়া প্রতুল ডাক্তার ও দুর্গাপ্রসন্ন ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন। প্রতুল ডাক্তার সহর্ষমুখে কহিলেন, 'এইবার উপযুক্ত ওষুধ আবিষ্কার করা গেছে, চৌধুরিমশায়। বড় চালাক ছেলে আপনার—এমন লাথে একটা মেলা ভাব। কি আগ্রহের সঙ্গেই মা ওর গল্প শুনচেন, লক্ষ্য করেচেন ? একটু অন্যমনস্ক রাখতে পারলেই যে চিকিৎসার বারোআনি হয়—'

রাজা কহিতে লাগিল—'তোমার অসুখ বলেই তো ঢাকের বাদ্যটা ইচ্ছেমত শোনা গেল না। জগবন্ধু তো বাজাতেই চায় ; কেমন কায়দা করে' নেচে নেচে বাজায়! বড় হলেই আমিও ঢাক বাজাতে শিখব। ভারি মজা লাগে, তাই না ? মনে হয়, যেন যাত্রাগানের যুদ্ধুটা হচ্চে। সব তুমি মাটি করে দিলে, মা! যাত্রাগান আর হলো না কেন, তোমার জন্যই তো! কী রকম সেবার অর্জ্জন তীর ছুঁড়েছিল, না মা! অর্জ্জুনের ধনুককে কি বলে জানো ? বলে, গাণ্ডীব—হি হি!—অসুখ করলে তবেই

বুঝি ডালিম খায় ?—ধ্যেৎ, না, না, অসুখের মানুষেরটা কি খেতে আছে ! পূজোটা গেলে আমিও একবার অসুখ করবো ভাবচি। অনেক মিছ্‌রি আর ডালিম দিতে হবে কিন্তু। অ ব আমি কিন্তু বিছানায় শুয়ে থাকতে পারব না।'

রাজা তার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আঙুল দিয়া হেমাঙ্গিনীর মাথা আঁচড়াইয়া দিতে লাগিল। অপূর্ব্ব সুখে এবং অপার নির্ভরতায় হেমাঙ্গিনী নিদ্রিত হইলেন। তখন রাজা আর এক মুহূর্ত্তও দেরি করিল না ; পা টিপিয়া টিপিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া উর্দ্ধশ্বাসে দুর্গামণ্ডপের দিকে ছুটিতে লাগিল। পঞ্চপ্রদীপের সেই আরতিটা শেষ হইয়া গেলেই সব মাটি করিয়াছে।

মধ্যরাত্রে হেমাঙ্গিনী সহসা নিদ্রা হইতে চমকিয়া জাগিয়া উঠিলেন। বিজড়িত গলায় কহিলেন—'কে আছ, ওগো, কে আছে এখানে ? আমি দুচোখে আর কিছুই দেখতে পাচ্চি নে—আমার কেমন জানি করচে।—'

দুর্গাপ্রসন্ন শিয়রের কাছে একটা চেয়ারে বসিয়া ছিলেন। বসিয়া থাকিতে থাকিতে একটু তন্দ্রা আসিয়াছিল। ডাক শুনিয়া তিনি ধড়মড়িয়া জাগিয়া উঠিলেন। কহিলেন—'কি হলো, কি হলো ?'

'উঃ, আমার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসচে—আমার কেমন জানি করচে !—'

দুর্গাপ্রসন্ন যেন কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া গেলেন। হেমাঙ্গিনীকেই ধরিবেন, না নিচের দারোয়ানকে প্রতুল ডাক্তারের নিকট ছুটিয়া যাইতে বলিবেন, স্থির করিতে পারিলেন না।

'জল, একটু জল।'

'চৌবে। রাম চৌবে !—জল ? হ্যাঁ, হ্যাঁ, জল দিচ্চি—অম্বিকা, অম্বিকা—'

'পদ্মা নিলে, আমাকে নিলে। তার সঙ্গে আর আমি লড়তে পারিনে। উঃ, বড় ব্যথা।'

'গোবর্দ্ধন, অম্বিকা, ইন্দিব দিদি, অতসীব মা—কিছু নয়, ও কিছু নয়, হেম।—জল? এই আমি জল দিচ্চি।'—দুর্গাপ্রসন্ন ভীত শিশুর মত কাঁপিতে লাগিলেন।

'ওগো, তোমার পা দুটো কোথায়? একবার শেষ প্রণাম করে যাই। কিছুই যে দেখতে পাচ্ছি নে। আঃ, কি সুন্দর জল। আমার হাতটা তোমার পায়ে ছুঁইয়ে দাও। আবার দেখা হবে—সাবধান, পদ্মাকে সাবধান! এ কি! বড় ভাল লাগচে, খুব ভাল লাগচে, আঃ—'

কম্পিত কণ্ঠে দুর্গাপ্রসন্ন হেমাঙ্গিনীর কানের কাছে উচ্চারণ করিতে লাগিলেন—'শিবাস্তে সন্তু পন্থানঃ—শিবং শিবং শিবং—'

পরদিন দুর্গাপ্রতিমা বিসর্জ্জনের পূর্ব্বেই চৌধুরি-বাড়ির গৃহিণীর বিসর্জ্জন সমাপ্ত হইল।

## পাঁচ

পূর্ব্বের ঘটনাবলীর সূত্র ধরিয়া কোটালভিটার আমবাগানের নতুন জন্ম হইল। তিন বৎসরের মধ্যে এই জনহীন অরণ্য যে নতুন আকার ধারণ করিল, তাহা আলাদীনের আশ্চর্য্যপ্রদীপেরই উপযুক্ত। দুর্গাপ্রসন্ন তাঁর শোকবিদগ্ধ চিত্তকে এই নতুন খেলা দিয়া ভুলাইয়া রাখিতে চেষ্টা করিলেন।

লৌহজঙ্গের পদ্ম সা' দেড়া দামে কোটালভিটা বিক্রয় করিয়া পরম

আত্মপ্রসাদ লাভ করিল। দুর্গাপ্রসন্ন সেই আমবন কিনিয়া জঙ্গল কাটাইলেন, রাস্তা পাতিলেন, দীঘির পঙ্ক উদ্ধার করাইলেন, দেবমন্দির প্রতিষ্ঠা করিলেন, নিজ ব্যয়ে বিদ্যালয় এবং দাতব্য চিকিৎসালয় খুলিয়া দিলেন, এবং আত্মীয়-অনাত্মীয়, বন্ধু ও অপরিচিত, অনাহূত এবং রবাহূতদের বিনামূল্যে জমিসত্ত্ব বিলাইয়া দিলেন। সমবায়-প্রণালীতে সুন্দর সুন্দর বাড়ি তৈরি হইল, সমবায় ভাণ্ডার সর্ব্বসাধারণের চাহিদা মিটাইতে লাগিল, আম্রছায়াচ্ছন্ন পথের পাশে আলোকস্তম্ভে প্রতিরাত্রে দীপ জ্বলিতে লাগিল, নলকূপের পরিস্রুত জল প্রতি গৃহে পৌঁছিল। নগর-পরিচালনার জন্য সমিতি গঠিত হইল। দুর্গাপ্রসন্ন কোটালভিটার নাম দিলেন কোটালনগর।

কোটালভিটায় শুধুমাত্র ভদ্রলোকেরই ডাক পড়ে নাই। একাধিক ঘর কুমোর আসিয়া চক্র ঘুরাইতে লাগিল, শাঁখারিরা বাড়ি-পত্তন করিয়া সশব্দে শঙ্খ ঘষিতে লাগিল; জেলে-পল্লীতে বাহিরে শুকাইতে লাগিল কতই জাল এবং প্রতি গৃহে কতই কোলাহল জাগিল, তাঁতিদের মাকুর শব্দে এবং কাঁসারিদের পিতল এবং কাঁসা পিটানোর ঘটায় একটা সম্পূর্ণ পাড়া মুখর হইয়া উঠিল। বন্দর হইতে কোটালনগরের ঘাটে বহু মালবাহী নৌকা যাতায়াত শুরু করিল, কাঁসার বাসন, শাঁখা, তাঁতের সূক্ষ্ম ও মোটা কাপড় এবং বিস্তর গামছা রপ্তানী হইতে লাগিল। বহু বৎসরের মৃত কোটালভিটা নবীন জন্মের মধ্যে সগৌরবে জাগিয়া উঠিল।

কিন্তু দুর্গাপ্রসন্ন কিছুতেই তৃপ্ত হন না। যে-পদ্মা তাঁর গৃহ, তাঁর আনন্দময় সংসার ভাঙিয়া দিয়াছে, তাহার উপর একটা মর্ম্মান্তিক আক্রোশ লইয়া তিনি কোটালভিটাকে সুন্দরতর করিয়া গড়িয়া তুলিতে লাগিলেন। রাক্ষসী পদ্মার নির্দ্দয় দম্ভের একটা সমুচিত প্রত্যুত্তর তিনি এক অপূর্ব্ব সৃষ্টির মধ্য দিয়া দিবেন।

কোটালনগরের মাঝখানে যে বিরাট দীঘি শৈবালদামে একেবারে আচ্ছন্ন ছিল, বহু অর্থব্যয়ে তিনি সেটাকে পরিষ্কার করাইলেন, তার চতুর্দ্দিকে বাগান তৈরি হইল,—সাধারণের বিশ্রামাগার, কৃত্রিম ঝর্‌না, শিশুদের জন্য দোল্‌না এবং ছেলেদের খেলার সবুজ মাঠের স্থষ্টি হইল। খালের পাড়ে বেড়াইবার জন্য দুর্গাপ্রসন্ন পাকা সড়ক তৈরি করিয়া দিলেন। এক স্থষ্টি-উন্মাদ ব্রহ্মার মত দুর্গাপ্রসন্ন প্রতিদিন নতুনতর সম্পদ স্থষ্টি করিয়া চলিলেন।

খালপাড়ে সর্ব্বসাধারণের জন্য যে মিলনীগৃহ তৈরি হইতেছিল, তাহা এখন সম্পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। ছুতোর মিস্ত্রীরা বর্ত্তমানে কাঠের কাজ লইয়া ব্যস্ত আছে,—করাতের শব্দ এবং র‍্যাঁদার ঘস্‌ঘসানিতে দুর্গাপ্রসন্ন সঙ্গীতের সুর শুনিতে লাগিলেন। মিলনীগৃহ কাঁচা ঘর নয়,—ইটের ইমারতের উপর করগেটেড্ টিনের ছাত দিয়া সুবৃহৎ বাড়ি তৈরি হইয়াছে। এমন একটি মিলনীর অভাব দুর্গাপ্রসন্ন বহুদিন যাবৎ অনুভব করিতেছিলেন,—শুধুমাত্র অন্যান্য কাজ বেশি জরুরি ছিল বলিয়া এই বিলম্ব। এই মিলনীবাড়ির একপ্রান্তে থাকিবে রঙ্গমঞ্চ, দেওয়ালের চারদিকে বই-ভরা আলমারী, গৃহতলে নানা-প্রকার খেলার সরঞ্জাম। পাশের এক ক্ষুদ্র কাম্‌রায় পড়িবার ব্যবস্থা থাকিবে। রঙ্গমঞ্চে মাঝে মাঝে শখের অভিনয় হইবে, এবং অন্যান্য সময়ে বক্তৃতাদির জন্য ইহা ব্যবহৃত হইবে। সন্ধ্যাবেলায় এই মিলনী-গৃহ আনন্দে কোলাহলে মুখর হইয়া উঠিবে।

মেয়েদের জন্যও দুর্গাপ্রসন্ন বন্দোবস্ত করাইয়াছেন। ফলে দীঘির পূব পাড়ের সার্ব্বজনীন দেবমন্দিরের সমুখের নাটমন্দিরে অন্তঃপুরিকাদের ভিড় আর কখনও কমে না। মরালদীঘির স্ফটিকস্বচ্ছ জল তাহাদের দ্রুতগামী জিহ্বার প্রতিধ্বনি তুলিতে তুলিতে ক্লান্ত হইয়া পড়িতেছে।

কিন্তু দুর্গাপ্রসন্নের তবু তৃপ্তি হয় না। সর্ব্বনাশী পদ্মা, তুই ভাবিয়া-

ছিলি সব ডুবাইয়া শেষ করিয়া দিবি, দুর্গাপ্রসন্ন সর্ব্বস্ব হারাইয়া হেঁট মাথায় বশ্যতা স্বীকার করিবে,—দেখিয়া তুই নির্দ্দয় আনন্দে অট্টহাসি করিয়া উঠিবি। চাহিয়া দেখ—কী আমি করিতে পারি, কত শক্তি আমার মনে, কত বল আমার বাহুতে,—আমার গৃহ ভাঙ্গা যায় না।

এই স্বপ্নের মত সুন্দর জনপদের দিকে চাহিয়া কখনও-বা গর্ব্বে দুর্গাপ্রসন্নের বক্ষ স্ফীত হইয়া উঠে। মনে মনে বলেন—'দাঁড়া, রাজা, তোর জন্য আমি কী অপূর্ব্ব বাড়ি তৈরি করে যাই দেখিস। আমার ঘর তো ভেঙেই গেছে—এ নতুন ঘর শুধু তোরই জন্য তৈরি করছি।—পদ্মা তোকে মাতৃহীন করেছে, গৃহহীন যেন না করতে পারে। যাবার আগে তোর উপযুক্ত একটা স্থান আমি গড়ে যেতে চাই।'

সে-দিন বৈকালে দুর্গাপ্রসন্নের বাড়িতে নগর-পরিচালনা সমিতির অধিবেশন বসিয়াছে। প্রকৃতপক্ষে দুর্গাপ্রসন্ন ভিন্ন অন্যান্য সভ্যেরা নগর-পরিচালনার সামান্যই বোঝেন। কিন্তু দুর্গাপ্রসন্ন চান, কোটাল-নগর তৈরি করিতে সকলেই যোগ দিক্, পৌর-ব্যবস্থার দায়িত্ব গ্রহণ করিতে শিখুক। কিন্তু এই শুভ-সঙ্কল্প তাঁহার বহু অশ্রুজলের কারণ হইয়াছে।

বৈঠকখানার কোঠা হইতে খালের বাঁকটা একটা বাঁকা তলোয়ারের মত দেখা যায়। এখান হইতে খাল পর্য্যন্ত প্রায় দেড় বিঘা জমি সবুজ তৃণে আস্তীর্ণ, অতি সামান্য দুয়েকটি গাছ দুর্গাপ্রসন্ন রাখিয়াছেন, বাকি সব কাটিয়া ফেলা হইয়াছে। চোখের সমুখে সর্ব্বক্ষণ তাঁর জল চাই, নহিলে তিনি অস্বস্তি বোধ করিতে থাকেন। খালের দৃশ্যটা এই জন্যই মুক্ত রাখা হইয়াছে। পদ্মাকে দেখার এত দিনের অভ্যাস তাঁর অস্থিমজ্জাগত হইয়া গিয়াছে; জল না দেখিয়া তিনি থাকিতে পারেন না।

কিছুদিন আগে গ্রামে বিদ্যুৎ-সরবরাহের ব্যবস্থা করিবার জন্ম পরিচালনা-সমিতিতে দুর্গাপ্রসন্ন প্রস্তাব তুলিয়াছিলেন, এবং সমিতির অভিমত অনুসারে এ-বিষয়ে উদ্যোগীও হইয়াছিলেন। কলিকাতার এক কোম্পানীর সঙ্গে ইতিমধ্যে তিনি পত্র-বিনিময় করিয়াছেন এবং এখন হইতেই চোখ বুজিয়া কোটালনগরের প্রতিঘরে, সাধারণ-উদ্যান এবং মিলনীগৃহে পদ্মের মত বিজলী বাতি জ্বলিয়া উঠিতে দেখিতে আরম্ভ করিয়াছেন।

পৌর-কর্ত্তব্যের তদারকের জন্য এক ডজন পৌরকর্ত্তা আছেন, কিন্তু একসঙ্গে ইহাদের অর্দ্ধেকের বেশি কখনও কোনও সভায় উপস্থিত হন না। আজ বিধু গাঙ্গুলী, নকুল চক্রবর্ত্তী, হেম দত্তগুপ্ত এবং প্রতুল ডাক্তার উপস্থিত ছিলেন। ইহাদের মধ্যে এক প্রতুল ডাক্তার ছাড়া মা সরস্বতী আর কাহারও উপর সদয় ব্যবহার না করায় আলোচনার অনেকটাই সভ্যদের মস্তিষ্কে প্রবেশ করিল না। তবে বিজলী-বাতি প্রবর্ত্তনের উপকারিতা সম্বন্ধে দুর্গাপ্রসন্নের সুচিন্তিত অভিভাষণ শ্রবণ করিয়া কেহ মাথা, কেহ-বা দাড়ি এবং কেহ-বা ভূঁড়ি দোলাইয়া একবাক্যে কহিলেন, 'সাধু!' সাধু!'

দুর্গাপ্রসন্ন কলিকাতার এক বৈদ্যুতিক-এঞ্জিনীয়ারের নিকট লেখা কতগুলি পত্র আদ্যোপান্ত পাঠ করিলেন। কহিলেন—কোনও কোম্পানী যদি নিজ দায়িত্বে কোটালনগরে বিদ্যুৎ-সরবরাহের ভার লইত, তবে আর চিন্তা করিবার কিছু ছিলনা, কিন্তু এই ছোট জায়গায় বিদ্যুৎ-সরবরাহ করিয়া উপযুক্ত লাভের আশা অতি সামান্য, এই কারণে সেইরূপ কোনও কোম্পানী সংগ্রহ করা যায় নাই। কাজেই নগর-পরিচালনা সমিতিকে নিজ দায়িত্বেই বিদ্যুৎ-যন্ত্র কিনিতে হইবে।

নকুল চক্রবর্ত্তী মশায় অর্দ্ধপক্ক দীর্ঘ দাড়িতে আঙুল চালাইতে চালাইতে কহিলেন—'নগর-পরিচালনা সমিতির দায়িত্বের কথাটা আমি

ঠিক বুঝতে পাবলাম না। দায়িত্ব কি আমাগো প্রত্যেকেব উপব ব্যক্তিগত ভাবেও বর্ত্তাইতে পারে? তা যদি হয়—'

দত্তগুপ্তের ভুঁড়িটা অত্যন্ত সন্ত্রাস্ত গোছেব, এবং সামান্য উত্তেজনায়ই কাঁপিতে থাকে। ভুঁড়িটা চাপিয়া ধবিয়া তিনি কহিলেন, 'কিন্তু এই সবেব দাম উঠব কি কইবা, তাই তো ভাবনাব কথা। দাম নেহাৎ কম হইব বইলা তো মনে হয় না—পাঁচ-সাত শো পডব গিয়া, কেমুন?'

দুর্গাপ্রসন্ন কহিলেন, 'না, না, আবও ঢেব বেশি পডবে। পাঁচ-সাত হাজাবেব কম তো নযই, বেশিই হবে। তবে আশা কবা যায়, বিদ্যুৎ-সবববাহ কবে যে আয হবে, মূলধন তা থেকে ক্রমে ক্রমে উঠে আসবে।'

তখন বিধু গাঙ্গুলী মশায় উদ্বিগ্ন হইযা কহিলেন, 'ওঃ, বাতির জন্য বুঝি আবাব পয়সা দিতে হইব?' অত্যন্ত করুণভাবে তিনি একটা দীর্ঘশ্বাস ছাডিলেন।

প্রতুল ডাক্তার ঈষৎ হাসিযা কহিলেন—'গাঙ্গুলী-মশায় কি বিনা পযসায়ই আলো পেতে চেয়েছিলেন?'

গাঙ্গুলী অপ্রতিভ হইযা কহিলেন, 'না না, তা ঠিক না, তবে কিনা—' ঠিক কি বলিবেন খুঁজিয়া পাইতেছিলেন না, এমন সময় নকুল চক্রবর্ত্তী গাঙ্গুলীব মুখেব কথা কাডিয়া কহিলেন—'কি বকম আন্দাজ খরচ পডব, সেইটা আগে থাকৃতেই জাইনা নেওন ভাল। কি কও, দত্তগুপ্ত?'

দত্তগুপ্তের ইহাতে মতদ্বৈধ হইল না। কহিলেন—'এইটা ন্যায্য কথাই কইচেন। লণ্ঠনেব থেইকা বেশি খবচা পডব, না কম পডব, যদি কম পডে, তবে কত কম, আব যদি বেশিই পডে—'

পৌবকর্ত্তাদেব আলোচনায় ক্রমে আবও দূরদর্শিতা এবং মিত-ব্যয়িতার পবিচয় পাওয়া যাইতে লাগিল। দুর্গাপ্রসন্ন ক্রমশই হতাশ হইয়া পডিতে লাগিলেন। বুঝিতে পাবিলেন কথাব ঢেউ কোন দিকে যাইতেছে।

অবশেষে দত্তগুপ্ত বিনীত হাস্য করিয়া কহিলেন, 'আপনার প্রস্তাব অতিশয় উত্তম সন্দেহ নাই ; কিন্তু খরচার কথাটাই আমরা ভাবতে আছি।' বলিয়া গাঙ্গুলীকে ইসারা করিলেন।

গাঙ্গুলী প্রস্তুত হইয়াই ছিলেন। কহিলেন—'এই ব্যয়ভার গ্রহণ করা আমাগো সাধ্যাতীত।'

দাড়িতে আঙুল-চালনা স্থগিত রাখিয়া নকুল চক্রবর্ত্তী বলিলেন, 'কেউ যদি থোকে কলকব্জা কিননের টাকাটা দিয়া দিত, একমাত্র তবেই পারন যাইত···'

দুর্গাপ্রসন্ন ইঙ্গিতটা খুবই বুঝিলেন। বড় আহত হইলেন। বহু অর্থই তিনি কোটালনগরের জন্য ব্যয় করিয়াছেন—ইহাকে সুন্দর এবং সুবিধা-জনক করিতে কোনও ত্রুটিই তিনি করেন নাই। সেই সঙ্গে কোটালনগর-বাসীদের পৌরকর্ত্তব্যও শিখাইতে চাহিয়াছিলেন, পুরব্যবস্থার দায়িত্ব-গ্রহণের উপযুক্ত করিয়া তাহাদের গড়িতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু কবে তা সফল হইবে, কে জানে! বর্ত্তমানে যাহারা মাতব্বর তাহারা ষোল আনা সুবিধাটুকু অন্যের হাত হইতে ফাঁকি দিয়া গ্রহণ করিতে পারিলে একটু-মাত্র ক্ষতি স্বীকারেও রাজি নয়, ইহারা অধিকার পূরামাত্রায় ভোগ করিতে চায়, কিন্তু দায়িত্বটাও সমান আগ্রহের সঙ্গে এড়াইয়া চলে।

সমিতির দূরদর্শিতার দরুণ ব্যাপারটা সেদিন ঐখানেই চাপা রহিল। দুর্গাপ্রসন্নের মনটা অত্যন্ত বিষণ্ণ হইয়া উঠিল, ঘরের মধ্যে থাকিতে অস্বস্তি বোধ হইতে লাগিল। হাঁটিতে হাঁটিতে নিজের প্রায় অজ্ঞাতসারেই তিনি খালের পাড়ে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। কল কল্ গল গল্ শব্দে জল হেলিয়া বাঁকিয়া টোল্ খাইয়া চলিয়াছে। অস্ত-আকাশের অবশিষ্ট রাগ-রেখার ক্ষীণ প্রতিবিম্ব পড়িয়া রূপালী জলে কোথাও কোথাও সোনার কারুকার্য্য আঁকা হইয়াছে। ক্যাঁচোর-কোঁচর শব্দ করিতে করিতে দু'চারটা নৌকা রঙিন জলে দাঁড় নিক্ষেপ করিয়া আগাইয়া চলিয়াছে। জল-

স্রোতের সঙ্গে দুর্গাপ্রসন্নের মনও যেন পদ্মার দিকে ভাসিয়া চলিল। নিস্তরঙ্গ নিদ্রালস পদ্মা রৌপ্যবর্ণ বিরাট এক চাদরের মত পড়িয়া আছে; শ্যামল তটে তটে শুভ্র কাশফুল এবং সবুজ ধান এ উহার গায়ে হেলিয়া পড়িতেছে; পাল-তোলা কত যে নৌকা সূর্য্যাস্তের দিকে যাত্রা করিয়াছে, তার ইয়ত্তা নাই। আকাশে সন্ধ্যার তারা ফুটিয়াছে, পদ্মার রৌপ্য-শুভ্র জলে তার প্রতিবিম্ব কাঁপিয়া উঠিতেছে। অঙ্গারে আঁকা ছবির মতন একটা কালো ডিঙি সর্‌সর্‌ করিয়া ছুটিয়া চলিতেছে। বৈঠার গা হইতে হীরার টুক্‌রোর মতো জল ছিট্‌কাইয়া আবার পদ্মাতেই মিলাইয়া যাইতেছে। সুদূর চরে চাষীর মাচার ঘরটাকে এক টুক্‌রা স্বপ্নের মত মনে হয়। কী শান্তি, কী স্তব্ধতা!—

সহসা দুর্গাপ্রসন্নের কল্পনার জাল ছিঁড়িয়া গেল। মিথ্যা! এ পদ্মার ছদ্মবেশ! ছদ্মবেশের অন্তরালে আছে কুৎসিত রাক্ষসী, এক নির্ম্মম সংহারিণী। মানুষের সুখ শান্তি এক নিমেষে সে চুরমার করিয়া দেয়। একটা অবর্ণনীয় প্রতিহিংসা-প্রবৃত্তি সহসা যেন দুর্গাপ্রসন্নকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল, মূর্ত্তিমতী পদ্মার দেখা পাইলে তিনি বোধহয় ব্যাঘ্রের মতন তাহার উপর ঝাঁপাইয়া পড়িতে পারিতেন।

'দেবো, বৈদ্যুতিক সরঞ্জামের সমস্ত টাকা আমি নিজেই দেবো, আর কেউ নাই দিক্।' দুর্গাপ্রসন্ন একাকী দাঁড়াইয়া সশব্দে কহিতে লাগিলেন। 'ওরা আমাকে ঠকিয়ে নেবে ভেবেছিল, কিন্তু আমি স্বেচ্ছায়ই দেবো।' কোটালনগরকে আমি অপূর্ব্ব সুন্দর ক'রে গড়তে চাই; পদ্মাকে দেখিয়ে বলতে চাই—বীরগঞ্জ ভেঙে বড় তুই আমার করলি, সর্ব্বনাশী! একবার তাকিয়ে দেখ, কী জিনিষ আমি গড়তে পারি।'

## ছয়

'মিস্তিরি!'

'কি কন্?'

'র‍্যাদা দিয়ে আব কি কি সাফ্ করা যায়?'

'কেমুন, কর্ত্তা?'

'মাটি থেকে ঘাস চেঁচে ফেলা যায়?'

'তা আর যাইব না ক্যান্, কিন্তু ধাব নষ্ট হইয়া যাইব যে। ঘাস কাইটা নি র‍্যান্দা নষ্ট কবে।'

'তবে তো র‍্যাদাব ভাবি জোর, ঘাস কাটতেই ভোঁতা—হি হি হি—ভারি তো ধারালো!'

মিলনীবাড়িব ভিতবে দাঁড়াইয়া নিজের অপূর্ব্ব রসিকতায় বাজা হি হি করিয়া হাসিতে লাগিল। ছুতাব মিস্ত্রীদেব সঙ্গে সে বীতিমত বন্ধুত্ব করিয়া লইয়াছে।

কাল তো মিস্ত্রীদেব জ্ঞানেব বহব দেখিয়া হাসিতে হাসিতে রাজাব পেট ফাটিবাব জোগাড় হইয়াছিল :—

'এই উঁচু জায়গাটাতে কি হবে, জান মিস্তিবি?'

'কোনো আবতা-ট্যাবতা বহাইব বোধ কবি।'

'আবতা-ট্যাবতা না রে বোকা, এটা থিয়েটাবেব স্টেজ! স্টেজ হলো উঁচু জায়গা।'

বিস্মিত নন্দন মিস্ত্রি কাজের মধ্যেও ঈষৎ আগ্রহান্বিত বোধ কবিল। কহিল, 'থেটাব কারে কয় ছোটকর্ত্তা? অ্যাংরাজি বাই-নাচ নাকি?'

'বাই নাচ আবাব কি? ধ্যেৎ, ওসব নয়। থিয়েটার হচ্ছে যাত্রাই, তবে আলাদা রকমের যাত্রা। বাই-নাচও নয়, ভালুক-নাচও নয়!'

'কেমুন?' নন্দন সবিস্ময়ে প্রশ্ন করিল।

'বভ্রুবাহন, ত্রিশঙ্কুর স্বর্গলাভ, হবিশ্চন্দ্র, গয়াসুর—সব পালা-ই হয়, কিন্তু তবু যাত্রা নয়।' বাজা বিজ্ঞেব মত ঘাড নাড়িতে লাগিল।

'না ক্যান্?'

'না 'ক্যান্' আবার! থিয়েটাবে 'সীন্' আছে যে!'

'ছিন্ কাবে কয়, ছোটকর্ত্তা?'

'এই না গযাসুব স্বর্গে গেল, পেছনে অমনি স্বর্গের ছবি! এই না হবিশ্চন্দ্র শ্মশানে আছে, পিছনে শ্মশান! যাত্রাতে আছে নাকি এমন? একই জায়গা, তাকে একবাব ভাব স্বর্গ, তাবপব যাক্ এক মিনিট, অমনি সেটাই হয়ে গেল শ্মশান—হি হি হি—'

নন্দন অত্যন্ত উৎসুক হইয়া উঠিল। অপাব খুসিতে দুই পাটি দাঁতই বাহিব কবিয়া কহিল, 'এমুন কবে ক্যাম্‌'ত? ভেল্কি নাকি ছোটকর্ত্তা, ভানুমতীব ভেল্কি?'

নন্দনেব এই বিবাট অজ্ঞতাব কথা শ্রবণ কবিয়া রাজা সম্পূর্ণ একটা মিনিট হি হি কবিয়া হাসিযা মবিল। কিছু যদি জানে এটা—হি হি—বলে ভানুমতীব ভেল্কি!—হি হি হি—। অবশেষে সে গম্ভীব হইয়া কহিল, 'ধ্যেৎ, কিছু যদি জানে! ভেল্কি বুঝি,—দূর্। ঐ তো বল্লুম, সীন্—সীন্ দিয়ে—। সীন্ হলো কি জান? মস্ত চওডা এক একটা শাদা পর্দায় এক একটা ক'বে ছবি এঁকে দেয়—কোনওটা স্বর্গ, কোনওটা শ্মশান, একটা বাজাব বাড়ি, একটা মন্ত্রীব বাড়ি, একটা কোটালেব বাড়ি, একটা নদী—এই সব কতই।'

এতক্ষণে দেখা গেল, নন্দন মিস্ত্রী একেবাবে বুদ্ধিহীন নয়। কহিল, 'এক পর্দা টাঙাইনা থাকলে আব পর্দা দেখা যায় ক্যামতে? সগ্‌গ দ্যাখলাম, অখন শ্মশান দেখমু ক্যাম্‌তে?'

রাজা হতাশ হইয়া কহিল, 'এক ফোঁটা বুদ্ধিও যদি তোমার মাথায় থাকে, মিস্তিরি! পর্দাগুলি একইসঙ্গে সব ঝুলতে থাকে বুঝি? মাথার

ওপরে বাঁশ টাঙিয়ে আলাদা আলাদা করে গুটিয়ে রাখে যে। তাবপব যেই না দড়ি ছেড়ে দিলে, অমনি পড়ল স্বর্গ, গুটিয়ে নিলে—তাবপব পড়ল শ্মশান; গুটিয়ে নিলে—তাবপর ফেললে—একে বসে সীন্ ফেলা। থিয়েটার আবম্ভ হোক্, দেখো আমি কী করি! বাবা বলেচেন—আচ্ছা ফেলিস্। বলবে না—আমি বুঝি কম চালাক হয়েছি।'

'কি করবেন, ছোটকর্ত্তা? কববেন কি?'

'থিয়েটারের সময় সীন্ ফেলব দেখো।' রাজা সগর্ব্বে কহিল।

ছুতারের কাজ দেখা রাজার এক নির্দ্দোষ আনন্দ। সময় পাইলে সে এখানে আসিয়া দাঁড়াইবে, র‍্যাদা এবং বাটালের সাহায্যে কাঠের তক্তা এমন সুন্দর দরজা-জানালায় রূপান্তরিত হয়, দেখিতে দেখিতে চেযার ও বেঞ্চি তৈরি হইয়া ওঠে যে, রাজা আকৃষ্ট না হইয়া পারে নাই। ছুতারের কাজের উপর গভীর শ্রদ্ধাই এই বন্ধুত্বের সূত্রপাত করিয়াছে।

'আচ্ছা, মিস্তিরি, তোমরা তামাক খাও কেন? খেতে মিষ্টি লাগে?'

নন্দন মিস্ত্রী হাতের কাজ সারিয়া নতুন কাজে হাত দিবার আগে কলিকাতে বেশ এক খাব্‌লা দা-কাটা তামাক ঠাসিয়া কাঠের চাঁচ দিয়া আগুন ধরাইয়াছে। কহিল, 'নিশা, ছোটকর্ত্তা, নিশা। নিশার টানে খাই, নাইলে আর ক্যান্।' নন্দন বিরাট একটা টান্ লাগাইয়া কাশিতে লাগিল।

'কাশতে বুঝি ভালো লাগে?'

'নিশা-মাহাইত্ম্য আপ্‌নে বুঝবেন না, ছোটকর্ত্তা—আগে বড় হইয়া লন্, তবে যদি বোঝেন।'

'ছাই।' রাজা অবজ্ঞার সঙ্গে কহিল।

'আইজ্ঞা হ—ছাইয়েরই সঙ্গী। মহাত্মার গায়ে ছাই মাইখা তবে না কল্কি ধরণ শিখচে। আর টানলেও শ্বাসে ছাই-ই থাকে—' বলিয়া

নিজের অপূর্ব্ব রসিকতায় হাসিয়া উঠিয়া নন্দন মিস্ত্রী আপ্রাণ জোরে কলিকায় টান লাগাইল, এবং পুনরায় কাশিতে কাশিতে গৃহের অপর প্রান্তকে উদ্দেশ করিয়া কহিল—'শুনচ, পট্‌লার বাপ্—নিবা নাকি, নেও।'

পট্‌লার পিতার এক মুহূর্ত্তও বিলম্ব হইল না। যেন এই আহ্বানের জন্য উৎকর্ণ হইয়াই সে অপেক্ষা করিতেছিল, ডাকা সমাপ্ত হইবার আগেই আবির্ভূত হইল, এবং নন্দনের হাত হইতে কলিকাটা এমন একটা টান্ মারিয়া ছিনাইয়া লইল যেন নন্দন তাহার সম্পত্তিই এতক্ষণ ধরিয়া বে-দখল করিয়া তাহার উপসত্ব অত্যন্ত অন্যায়ভাবে ভোগ করিয়া আসিতেছিল।

তামাকটা যে ইহাদের কাছে কত বড় পদার্থ, তাহা বলিয়া বোঝান যায় না। পাড়াগাঁয়ের এই সব দুর্গতের দল পেট ভরিয়া দুইবেলা ভাত খাইতে পায় না, ছেঁড়া ন্যাকড়া পরিয়া ইহাদের লজ্জা নিবারণ করিতে হয়। আরাম, আয়াস এবং বিশ্রাম ইহাদের নিকট দুরাশারও অধিক। দিনের পর দিন ছন্দহীন, বৈচিত্র্যহীন জীবনের নিরস পথে এই বঞ্চিত মানুষগুলি মৃত্যুর দিকে অগ্রসর হইতে থাকে। নিজেদের মধ্যে অভাব বোধ পর্য্যন্ত ইহাদের আর নাই, এমনি পরিপূর্ণভাবে ইহারা মরিয়া গিয়াছে। এই প্রকার জীবনের মধ্যে তামাকটা যে কত বড় বিলাসিতা, কত বড় আনন্দের উপাদান, তাহা পট্‌লার বাবার মতন এইরূপ লোলুপতা না দেখিলে বুঝিতে পারা সহজ নয়। যতই সে বলিতে লাগিল—'নাঃ, কিছু বাখস নাই, নন্দা—সব শ্যাষ্ কইরা দিছস্'—ততই সে কঠিনতর অধ্যবসায়ের সঙ্গে কল্কি টানিতে লাগিল, যেন আখের কলের মতন, ওর মধ্য হইতে রসের শেষ ফোঁটা পর্য্যন্ত টানিয়া লইবে। তার কাণ্ড দেখিয়া রাজা গভীর সহানুভূতির সঙ্গে হি হি করিয়া হাসিতে লাগিল।

'কেবলই তামুক খাস্ তোবা, কেবলই তামুক খাস্। বলি, কাজ-কম্ম করস কখন?'

ছুতারদের সঙ্গে রাজাও চমকিয়া পিছনে ফিরিল। দেখিল, একবাশ দাড়িব পিছনে নকুল চক্রবর্ত্তী মশায় দাঁড়াইয়া বহিয়াছেন। এ-তল্লাটে চক্রবর্ত্তী-মশায়েব দুর্ম্মুখ বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। নন্দন বড়ই ঘাব্ড়াইয়া গেল। জোড় হস্তেব উপর মাথা নিচু কবিয়া সবিনয় প্রণাম কবিয়া কহিল—'আইজ্ঞা না, তামুক খাই কই। সাবা দুপুইবে এইতো মাত্র ধরাইলাম। পট্লার বাপেবে জিগান্ না—'

'একবাব ধবালি!' চক্রবর্ত্তী নিতান্ত অসন্তুষ্ট হইযা কহিলেন, 'বলি দুটা কইবা চউখ কি আমাগো আছে, না নাই? ভোবে যাইতাছি, দেখি তামুক টানচস্; অখন যাইতাছি, অখনও তামুক টানচস্—এইব থেইকা কি প্রমাণ হয?'

পটলেব পিতা যেমন দ্রুত আসিয়াছিল, তেমনি আশ্চর্য্য ক্ষিপ্রতাব সঙ্গে সবিয়া পড়িযা একটা কাঠেব গিঁঠেব মধ্যে বাটাল মাবিয়া এমনি শব্দ তুলিতে লাগিল যে, তাব কর্ম্মতৎপবতা সম্বন্ধে আব কোন সন্দেহেরই অবকাশ রহিল না। কিন্তু নন্দন মিস্ত্রী ভোববেলায় একবার এবং বিকাল বেলায় অন্যবাব তামাক-টানা হইতে কি নিশ্চিত প্রমাণ হয় তাহা নিশ্চয় বুঝিতে না পাবিয়া মাথা চুলকাইতে লাগিল। কহিল, 'আইজ্ঞা, কাম-কম্ম তো উচিত মতনই কবতে আছি, চক্কত্তীমশয়। তামুক না খাইলে জোব পামু কইথন?'

'দেখ নন্দা, চালাকি কি আব আমি ট্যাব পাই না? চিবদিনেব ফাঁকিবাজ তুই। এক মাসেব মইধ্যে আমরা মিলনী খোলন ঠিক কবছি, আব এই দিকে তরা ফাঁকি মারতে শুরু কবছস্! উহু, ফাঁকি দেওন চলব না। ঠিক মতন কাম পাই বাখুম, নাইলে খেদাইয়া দিমু··' চক্রবর্ত্তী সহসা বীরদর্পে কহিলেন।

নন্দ আহত কণ্ঠে কহিল, 'আপ্‌নে এমুন কথাটা আমারে কইলেন, চক্কত্তী মশয়! কর্ত্তাবাবুও তো এমুন কথা নন্দন মিস্তিরিরে কইতে পারে না যে, নন্দন··'

'কর্ত্তা কে রে, কর্ত্তা আমরা হক্কলে। এইটা জমিদারের নিজের বাড়ির কাম না, মনে রাখিস্। জমিদার সমিতির সভাপতি হইলে কি হইব, এই নকুল চক্কর্ত্তী যা কইব, তাই হইব। কোনও কর্ত্তার-ফর্ত্তার দোহাই—এই যে, ছোটকর্ত্তা, কি করতাছ এইখানে? লাট্টুর বায়না ধরছ বুঝি?—হ্যাঁ, কি কইতে আছিলাম। কর্ত্তা একজন মানুষ বৈ তো না, সব দিকেই কি দৃষ্টি দিতে পারেন যে, কর্ত্তার দোহাই দেস্?—দে, নন্দা, কি চায় কইরা দে। তা বইলা যখন তখন আইসা কাজে ব্যাঘাত কইরো না, রাজপুত্তুর। সব্বসাধারণের কাজে—'

রাজার সম্মান আহত হইল। গম্ভীরভাবে সে কহিল—'আমি কিচ্ছুই চাই না—আমি ওমনিই দাঁড়িয়ে রয়েচি—'

নকুল চক্রবর্ত্তী ইঙ্গিত-গর্ভ হাসি হাসিলেন। কহিলেন—'প্যাটে প্যাটে এত বুদ্ধিও হইচে—হা হা—। তা পোলাপানমানুষ একটা লাট্টু চাইছ, এইতে লজ্জা কি? তা দিস, নন্দা, একটা বানাইয়া দিস্।' তারপর নন্দন মিস্ত্রীর দিকে ঝুঁকিয়া গলাটা খাটো করিয়া কহিলেন—'কাঠ-টাট যদি কিছু বাঁচে, তবে একটা তক্তাপোষ তৈরি কইরা দিস্ তো, বাবা। তবে কিনা সব্বসাধারণের কাজ বাঁচাইয়া তবে। একটু ছুটিছাটা পাস্ তো দুই-চাইর খান তক্তা লইয়া আমার বাসায়ই চইলা যাইস্, নাইলে আবার মাপ-জোকের অসুবিধা হইব, বুঝলি না?'

'আইজ্ঞা বুঝচি, যামুনে।'—নন্দন কহিল।

'খুবই মন লাগাইয়া কাজকম্ম করবি,—সব্বসাধারণের কাম কিনা। তামুক-টামুক খাবি বৈ কি, তবে একটু সাবধান কইরা দেওন, বাড়াবাড়িটা না হয়।—ছোটকর্ত্তার কি পড়াশুনা নাই, যত্রতত্র ঘুইরা বেড়ান হইতেছে?'

'ইস্কুল ছুটি।'—রাজা নির্লিপ্তস্বরে কহিল।

'ইস্কুলই না হয় ছুটি, তা বইলা ইচ্ছা থাকলে কি আর পড়াশুনা করন যায় না। টাকা-পয়সা না হয় ঢের আছে, কিন্তু বাবা, পড়াশুনা না করলে তো আর মানুষ হইতে পারবা না—তবে অখন আসি ..'

নকুল চক্রবর্ত্তী দরজার দিকে অগ্রসর হইলেন, কিন্তু চৌকাঠ অতিক্রম করিলেন না। সহসা থামিয়া পড়িয়া ফিরিয়া কহিলেন, 'শুনচস, নন্দন মিস্ত্রির, কাঠের চাঁচগুলি আইজ আমার বাসায় পাঠাইয়া দিস্ তো, এই দিয়া চুলা ধরাইতে বেশ সুবিধা।'—বলিতে বলিতে তিনি অন্তর্দ্ধান হইলেন।

রাজা ঠোঁটটা অবজ্ঞার ভঙ্গিতে বাঁকা করিয়া দাঁড়াইয়াছিল। নকুল চক্রবর্ত্তী কর্ত্তব্য সমাধা করিয়া বাহির হইবা-মাত্র নন্দন মিস্ত্রির দিকে চাহিয়া কহিল, 'র‍্যাঁদা দিয়ে দাড়ি চেঁচে দেওয়া যায় না, মিস্ত্রি? তাতেও ধার নষ্ট হয়ে যায়?'

বৈকাল হইবার সঙ্গে সঙ্গেই রাজা বাড়ির দিকে রওনা হইল। ইন্দির-পিসিমাকে তার যা ভয়, তা আর বলার নয়। খাইতে যদি সে একটু-মাত্র আপত্তি দেখায়, স্নানাহারে যদি একটুও অসময় করে, দুধ খাইতে যদি সামান্য অনিচ্ছাও প্রকাশ করে, তবে বুড়ি পিসি মায়ের নাম ধরিয়া এমনি বিলাপ শুরু করে যে, রাজার আর এক মিনিটও দেরি হয় না। ইন্দির ঠাকুরাণীও চমৎকার এক অস্ত্র হাতে পাইয়াছেন, রাজা কোনও প্রকার দৌরাত্ম্য প্রকাশ করার ইঙ্গিত করামাত্র তিনি মুখ ঈষৎ হেলাইয়া বাঁ হাতে বাঁ কানটা ঢাকিয়া সজল সুরে শুরু করেন—'কোথায় গেলা গো, বৌমা, এই বুড়া বয়সে আমার মাথায় বোঝা দিয়া, সোনার প্রিতিমা, কই হারাইয়া গেলা গো।'—যা ভয় করে রাজা পিসিমার এই কান্নাটা! তাই আগেই সাবধান হইয়া সে বৈকালিক জল-খাওয়ার জন্য বাড়ির দিকে অগ্রসর হইল।

খালে সোনার জল টলটল করিয়া উঠিয়াছে। রঙিন জলে ছপাৎ-ছপাৎ শব্দ তুলিয়া অলস গতিতে দু'চারটা নৌকা যাতায়াত করিতেছে। পাড়ের গাছ এবং অন্যান্য দ্রব্যের ছায়া জলের মধ্যে গা ধুইয়া লইতেছে, এক ঝাঁক বকের এক বিচিত্র ছাঁদের সারি পদ্মার দিক হইতে উড়িয়া আসিয়া অজানা কুলায়ের দিকে ছুটিয়া চলিয়াছে।

রাজার একবার ইচ্ছা হইল, এইখানে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া দেখে কতদূর পর্য্যন্ত বকগুলিকে দেখা যায়, কখনই বা তাহারা অকস্মাৎ অদৃশ্য হইয়া পড়ে। নৌকা-চলা দেখিতেও এমন ভাল লাগে যে, নড়িতে ইচ্ছা হয় না। নৌকার মধ্যে যখন সুদীর্ঘ ঘোম্‌টা-টানা বউ সওয়ারি থাকে, তখন তো রাজা দৃশ্যটাকে বড়ই উপভোগ করে,—বউয়েরা নাকি সব শ্বশুর-বাড়ি যায়, বড় করে ঘোম্‌টা না টান্‌লে শাশুড়ি বকবে কিনা, তাই—হি হি—ওরা নিশ্বাস নেয় কি করে? কিন্তু রাজার আর অপেক্ষা করা চলিল না, পিসিমার কান্নার চেহারা মনে পড়িতেই সে সকল ইচ্ছা মনে চাপিয়া দ্রুত অগ্রসর হইল।

'কোথা থেকে এলিরে, মাণিক?'

'আর কইথন্, ছোটকর্ত্তা, গাঙের থন্।'

জেলে-ডিঙিটা কাছে আসিয়া পড়িয়াছে। স্তূপীকৃত জালের পাশে বসিয়া মাণিক অলস-গতিতে বৈঠা বাহিয়া আসিতেছে। পাল টাঙাইবার বাঁশটা দাঁড়াইয়া আছে, কিন্তু পাল খোলা, মাণিকের কোনই তাড়া নাই। বেসুরা কণ্ঠে সে ভাটিয়ালি গাহিয়া আসিতেছিল, রাজার ডাক শুনিয়া চাহিয়া পরিচিতের হাস্য করিল।

বস্তুত, মাণিক রাজার একান্তই বন্ধুস্থানীয়। বয়স উনিশ হইতে একুশের মধ্যে, একহারা সুস্থ শ্যামল দেহ, মাথায় বাব্‌রি চুল, এবং মুখে সর্ব্বদাই হাসি লাগিয়া আছে। তবে দোষের মধ্যে তাঁর গানের শখটা

একটু বেশি, এবং এইখানেই ওর বিবেচনা-শক্তির সব চাইতে বেশি অভাব। কিন্তু ওকে রাজার বেশ ভালই লাগে। মাণিক মাছ ধরিবার কৌশলটা রাজাকে শিখাইয়া দিবে বলিয়াছে, এবং আগেই সাবধান করিয়া দিয়াছে, মাণিকের বাপ বা খুড়াদের কাছে এ-কথা সে যেন ঘুণাক্ষরেও প্রকাশ না করিয়া দেয়! রাজা প্রতিজ্ঞা করিয়াছে, সে বলিবে না।

'এত দেরি করলি কেন রে? সেই রাত্তিরে গিয়ে এখন ফিরে এলি?'

'হ, তাই তো।'

'এতক্ষণ মাছ ধরলি? তবে তো অনেক মাছ পেয়েচিস।'

'আরে না—দূর্! দিনে মাছ ধরি না। আমি আইলাম কুটুম-বাড়ির থন খাইয়া। ঝাউতলায় খুড়া-মশয়ের হোর-বাড়ি কিনা—তেনার ছোট-পরিবার—'

এতক্ষণে মাণিকের ডিঙি নিকটবর্ত্তী হইয়াছে। রাজা কহিল, 'এই, ভিড়া তো, আমি একটু উঠবো।'

'নাঃ, ছোটকর্ত্তা, উইঠো না, আঁইস্‌টা গন্ধ কইবো, তোমাগো ভদ্র-লোকের নাকে সইতে পারবা না।'

'খুব পারব। এইখানে না উঠলাম, মিলনী-বাড়ির কাছে নামিয়ে দিবি, বুঝলি?'

খুসি হইয়াই মাণিক ডিঙি পাড়ে ভিড়াইল। রাজাও সমান খুসির সঙ্গে জেলে-ডিঙিতে উঠিয়া গলুইয়ের উপর বসিয়া পড়িল। জেলে-ডিঙিতে চড়ার শখ তার অনেক দিনের, কিন্তু সাহস করিয়া মাণিককে ইতিপূর্ব্বে সে ডিঙিতে চড়াইতে অনুরোধ করে নাই। তাই এই অভিজ্ঞতা তার পক্ষে যেমন নতুন, তেমনি লোভনীয়।

'একদিন তোর সঙ্গে পদ্মায় মাছ ধরতে যাব।'

'পদ্মায়!' সবিস্ময়ে মাণিক কহিল।

'হ্যাঁ।'

শুনিয়া মাণিক হাসিয়া উঠিল। কহিল, 'তাম্‌সা রাখ, ছোটকর্ত্তা।'

'ধ্যেৎ, তামাসা নয়। দেখিস, একদিন যাব— তোর সঙ্গেই যাব।'

'ডরাইবা না?'

'ডরাতে বয়ে গেছে।'

'ভদ্রলোকে নি ডাঙ্গার বাইরে পাও বাড়ায়—ডরে মরে।'

'মরে, তোকে বলেচে।' রাজা অবজ্ঞার সঙ্গে কহিল।

মাণিক বুঝিল, কথাটা ছোটকর্ত্তার মন-মতন হয় নাই। তাই আর সে কথা চালাইবার চেষ্টা করিল না, ভুরু কুঁচ্‌কাইয়া, গলার রগ ফুলাইয়া বেসুরা কণ্ঠে গান উঠাইল।

'এই শুনচিস, গান থামা।'

'কও।' গান থামাইয়া মাণিক কহিল।

'নিয়ে যাবি একদিন পদ্মায়?'

'গ্যালে আর নিমুনা ক্যান্! আমার আর আপইত্যটা কি!'

'কবে নিবি, বল? নিয়ে যদি যাস, তবে দেখিস, তোকে আমি কি দেই।'

এই প্রলোভনে মাণিক যে বিশেষ প্রলুব্ধ হইল, তাহা মনে হইল না। অবিশ্বাসের সঙ্গে কহিল, 'বড়কর্ত্তায় রাজি হইলে, তবে না।'

রাজা সগর্ব্বে কহিল, 'আমি বল্‌লেই রাজি হবে, দেখিস।'

'তবে আর নিমুনা ক্যান্!—শোন, ছোটকর্ত্তা, আখ্‌ড়ার অমর্ত্ত বৈরাগীর থন্ নতুন গানটা কেমুন শিখচি।' বলিয়া সে তার সুরহীন কণ্ঠের অপূর্ব্ব সুরে অসম্ভব দরদের সঙ্গে গান শুরু করিল—

'চড়ে ইংরেজের গাড়িতে তোর কিবা প্রয়োজন।
ওরে অবোধ মন বলি শোন।'

## সাত

আজও রাজার ইস্কুল ছিল না। দুপুরটা আর কাটিতে চায় না। মানুষেরা যে কি করিয়া ঘুমাইয়া দুপুরটা কাটাইয়া দেয়, ভাবিয়া রাজা বড়ই বিস্ময় বোধ করে। সে নিজে সে-চেষ্টা করিয়া দেখে নাই, এমন নয়। পিসিমার সজল শাসনে একাধিক দিন দুপুর-রৌদ্রে পাড়া বেড়াইবার দুর্নিবার প্রলোভন মনে চাপিয়া কম পক্ষে পাঁচদশ মিনিট নিদ্রার চেষ্টা করিয়াছে। কিন্তু ঘুম আসা দূরে থাকুক, যত রাজ্যের কুল এবং আমগাছ, জেলে-ডিঙি এবং বৌয়ের নৌকা এবং তার বিচিত্র শ্রেণীর বন্ধুদের চেহারাগুলি চোখের সমুখে আসিয়া এমনিভাবে হাত-ইসারায় ডাকিতে আরম্ভ করিয়াছে যে, বিকালে ফিরিয়া আসিয়া ইন্দির ঠাকরুণের বিলাপ সহ্য করা ছাড়া আর গত্যন্তর থাকে নাই।

আজও আবার সেই সমস্যায় পড়িয়াছে। গত রবিবার সারা দুপুর আদাড়ে-বাদাড়ে ঘুরিয়া সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরিয়া বাবার কাছে যা বকুনি খাইয়াছিল, তা আর বলার নয়। তাই যদিও আজ দুপুর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বন-জঙ্গল, খালের পাড়, গয়লা পাড়া এবং জেলেপল্লী তাকে শুধুই ডাকিতে লাগিল, তবু সে শক্ত হইয়া রহিল।

কিন্তু এ রকম কৃচ্ছ্র-সাধন বেশিক্ষণ সম্ভব নয়। অবশেষে হতাশ হইয়া পা টিপিয়া টিপিয়া সে পিসিমার তাক্ হইতে আমের আচার চুরি করিতে গেল। এই আমের আচার রাজার একটা প্রকাণ্ড দুর্ব্বলতা। পিসিমা যতই আমের আচারের বোতল সাম্‌লাইতে ব্যস্ত হইয়া ওঠেন, রাজার লোভটা ততই আরও দুর্দ্দমনীয় হইয়া ওঠে। কিন্তু তা হইলে কি হয়, পিসিমার সাবধানতার গুণে এক দিনও সে বোতলটার নাগাল পায় না—কোথায় যে পিসিমা সেটাকে এমন অপূর্ব্ব কৌশলে লুকাইয়া রাখে, রাজা সুগভীর অধ্যবসায় সত্ত্বেও তার কোনও কিনারা করিতে

পারে নাই। এই হয়তো দেখিল বোতলটা মুড়িব টিনেব পিছনে, ঠিক করিয়া গেল, পিসিমা একটু সরিলেই হয়, কিন্তু পিসিমা সরিয়া গেলে বাজা যখন হৃষ্টচিত্তে পুনঃপ্রবেশ কবিল, তখন আমেব আচারও অদৃশ্য হইয়াছে। অন্য অনেক রকমেব আচাব আছে সন্দেহ নাই, কিন্তু তাদের উপর বাজার কিঞ্চিৎমাত্র লোভ নাই এবং সেইজন্য সে-সব ক্ষেত্রে পিসিমাব কৌশল-প্রয়োগের প্রযোজন হয় না।

দিনান্তেব পবিশ্রমেব পব ইন্দিব ঠাকুরুণ মহা আবামে নিদ্রা যাইতেছিলেন। নাকেব একটানা ডাক শুনিয়া বাজাব আব কোন আশঙ্কাই রহিল না, মুখেব সঙ্গে সঙ্গে সে গা'টাও দবজা দিয়া গলাইয়া দিল। একটু মুচকি হাসিয়া মনে মনে কহিল—লক্ষ্মী পিসিমা তো, বেশ একটু পাকা ঘুম ঘুমোও, বেশ একটু নিশ্চিন্ত ঘুম ঘুমোও। আমের আচাবেব জন্য তোমাব কোনও ভাবনা নেই।—

পা টিপিয়া টিপিয়া আদত একটা চোবেব মতন বাজা পিসিমার নিজ হাতে তৈবি যাবতীয় সুখাদ্যগুলি যে তাকেব উপব সাজান থাকে, সে দিকে অগ্রসব হইল। আম পাকাইয়া কেন যে লোকে সেগুলি নষ্ট কবে, বাজা ভাবিযা পায় না। কাঁচা থাকিতে পাড়িয়া আচাব করিয়া রাখিলে তা খাইতে ঢেব ঢেব ভাল। পায়েব বুড়ো আঙুল দুইটার উপব দাঁড়াইয়া, ঘাড়টা যথাসম্ভব প্রলম্বিত কবিয়া বাজা আমেব আচাবেব বোতল খুঁজিতে লাগিল। পাইবাব যে খুব আশা ছিল তা নয়—পিসিমাকে অতটা অসাবধান সে মনে কবেনা—তবে ববাতেব কথা কে বলিতে পাবে!

ববাতই বটে! বাজাব দুই চোখ লুব্ধ খুসিতে চক্‌চক্ কবিয়া উঠিল। বাতাসাব হাঁড়িটাব পিছনে, নাবকোল নাড়ু ও কিস্‌মিসের বড বোতল দুইটাব মধ্যখানে সেই বহুমূল্য আচাবেব বোতলটা একান্তই অসহায়ভাবে অবস্থান করিতেছে। সোনাব বর্ণ তেলের মধ্যে কম পক্ষে

দশ-পনেরো টুক্‌রা আমের আচার অপূর্ব্ব মাধুর্য্য বিস্তার করিতেছিল, রাজাকে দেখিয়া যেন খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। রাজার আর মুহূর্ত্ত সহিল না, একবার মাত্র ঘুমন্ত পিসিমার দিকে চাহিয়া লইয়া সে নিশ্চিন্ত হইল, এবং পরক্ষণে তাকের উপর দুই হাতের কনুইয়ে ভর করিয়া দেহের অর্দ্ধেক উঠাইয়া অবলীলাক্রমে আচার হস্তগত করিল। পরমুহূর্ত্তে রাজা আর সে ঘরে নাই।

খালের পাড়ের লিচু গাছটার তলায় বসিয়া সমস্ত আচার নিঃশেষ করিবার পর তবেই রাজার বিবেকটা একটু গোলমাল শুরু করিল। সবটা খাইয়া ফেলা ভাল হইল না, একটু বাড়াবাড়ি হইয়া গেছে। পিসিমা যে চাইলে একেবারেই দেয় না, এমন তো নয়—একবারে এক আধ টুক্‌রার বেশি দেয় না বটে, কিন্তু দেয় তো। ঘুম হইতে উঠিয়া আমের আচারের অবস্থা দেখিয়া পিসিমার যা বিলাপ শুরু হইবে—ছি ছি ছি—কিন্তু সবটা না খাইলেই ভাল ছিল। রাজা ভাবিতে লাগিল—খেতে খুব মজা লাগে কি না, তাই তো সবটা খেয়ে ফেল্লুম, যা ভাল লাগে আমের আচার! কিন্তু বুড়োমানুষেরটা সব শেষ ক'রে দিলুম—দূর! এত কষ্ট ক'রে সব সময়ে লুকিয়ে রাখে। নিরিমিষ খায় কি না, তাই আচার না হলে খাওয়া যায় না। এমন আমি লোভী হয়েছি, পেটুকের হাঁড়ি। রাজার মনটা সহসা খারাপ হইয়া গেল। এমন ভালমানুষ পিসিমা—কত পিঠা তৈরি ক'রে দেয়, কত রূপকথা বলে, মাথায় তেল মেখে দেয়, কত আদর করে—দূর, আচার খেয়ে একটুও ভালো হয় নি—

কিছুক্ষণ ভাবিয়া অবশেষে রাজা খালকে সম্বোধন করিয়া কহিল—'খেলুমই বা, আর বুঝি তৈরি করা যায় না। গাছে তো কতদিন বোল দেখা দিয়েচে—এইবার কচি আম দেখা দেবে। দিয়েচেই তো,—যমুনা

বোষ্টুমি সেদিন বল্লে না, আখ্‌ড়ার গাছে এরই মধ্যে আম ধরে গেছে—আমাকে আনতে যেতে বল্লে না? ধরেছেই তো, ঈশ্বরের জায়গায় আগেই সব ধরে!'

আচার খাওয়া উপলক্ষ্য করিয়া যমুনা বৈষ্ণবীর নিমন্ত্রণটা রাজার মনে পড়িয়া গেল।

গ্রামের প্রান্তে বাউলদের একটা বড় রকমের আখ্‌ড়া আছে। দুর্গাপ্রসন্নকে ধরিয়া এই বাউল-সম্প্রদায় কোটালভিটার উত্তর-প্রান্তে বিস্তৃত ভূমিখণ্ড জোগাড় করিয়াছে এবং গ্রামান্তর হইতে বাস উঠাইয়া আনিয়া এখানে মস্ত বড় আখ্‌ড়া ফাঁদিয়াছে। বিগ্রহ স্থাপিত হইয়াছে এবং পূজার্চ্চনা ও নামকীর্ত্তনাদি বিশেষ আড়ম্বরের সহিতই অনুষ্ঠিত হইতেছে। বৈরাগী-বৈষ্ণবীর সংখ্যাও কম নয়, এবং গ্রাম-গ্রামান্তরের বিভিন্ন বাউল-সম্প্রদায়ের বহু অতিথি সর্ব্বদাই এখানে যাতায়াত করে।

তবে গ্রামের সামাজিক জীবনের সঙ্গে আখ্‌ড়াবাসীদের কোনই সংযোগ নাই—তারা সব কিছুর বাইরে। এর কারণ এই নয় যে, বাউলেরা সংসারের সঙ্গে সম্পর্ক লোপ করিয়া সাধন-ভজন লইয়াই ব্যাপৃত থাকিতে চায়, প্রকৃত কারণ এই যে, গ্রামের লোকেরা এদের দেখিলে নাক সিঁটকায়—প্রায় অস্পৃশ্যের কাছাকাছি মনে করে, এবং ভিক্ষা দেওয়া ছাড়া এদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখা গর্হিত মনে করে।

বাউল-সম্প্রদায়ের মধ্যে কদাচার, দুর্ব্বলতা ও উচ্ছৃঙ্খলতার কিছু অভাব নাই, প্রকৃত বাউল এবং ছদ্ম-বাউলের তফাৎ সাধারণের কাছে লোপ পাইতে বসিয়াছে। কোটালভিটার আখ্‌ড়ারও দুর্নামের অভাব ছিল না, বিশেষত, যুবতী বৈষ্ণবীদের প্রাদুর্ভাব গ্রামের বুড়োরা বিশেষ সন্দেহের চোখে দেখিত, এবং আর যাই হোক, ইহারা যে শ্রীকৃষ্ণের সেবাদাসী নয়, তাহাতে তাহাদের সন্দেহমাত্র ছিল না। এই সম্প্রদায় কিছু দিন পূর্ব্ব পর্য্যন্তও পাশের গ্রামে বাস করিত, কিন্তু সেখানে

পরকীয়া-ভাবের এমন নাকি কাড়াবাড়ি হয় যে, গ্রামের লোকেরা মিলিয়া এদের দূর করিয়া ছাড়ে। সেই দুর্নামের অংশ এরা কোটালভিটায়ও বহন করিয়া আনিয়াছে, এখানেও ওরা নেড়ানেড়ির দল নামে পরিচিত।

যমুনা এই আখ্‌ড়ারই বৈষ্ণবী। কোটালনগরের বাড়ি বাড়ি সে গান গাহিয়া বেড়ায়, তাকে চেনে না, এমন মানুষ কম। বছর তিরিশেক বয়স, চেহারাটা ভদ্রমেয়ের মতন, গলাটা মিষ্টি এবং কীর্ত্তনে সত্যই কিছু দক্ষতা আছে। এই সব কারণে চাল সে সবার চাইতে বেশি সংগ্রহ করে।

রাজার সঙ্গে যমুনার বড় ভাব। ভিক্ষায় আসিয়া করতালে ঠোকাঠুকি করিয়াই সে হাঁক দেয়—'কোথায় গেলে আমার গোপাল—গান গাইব কার কাছে?'

রাজা হয়তো দোতলার ঘরের জানালার কাছে মুখ আনিয়া বলে—'এই, চেঁচাচ্ছ কেন, বোষ্টুমি? দেখচ না পড়াশুনো করচি। ফের 'গোপাল' 'গোপাল' করবে না বলে দিলুম।'

'ওঃ, ভুলে গেছ্‌লাম, ছোটকর্ত্তা। কিন্তু তুমি যদি না শুনবে, কার কাছে গাইব?'

'তার আমি কি জানি। আর শুনচো বোষ্টুমি, রোজ রোজ এক গান গেয়ো না, আমার মাথা ধরে যায়।'

যমুনা হি হি করিয়া হাসিয়া লুটাইয়া পড়ে। হয়তো ইন্দির ঠাকরুণের দিকে চাহিয়া সহর্ষে বলে—'দেখলেন, মা ঠাক্‌রুণ, ছোটকর্ত্তার কেমন গানের কান—বলেন, রোজ রোজ এক গান গেয়ো না, মাথা ধরে যায়! সারা গাঁয়ে যমুনাকে এমন কথাটি আর কেউ বলে না।'

ইন্দির ঠাকুরাণী দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলেন—'এখন ভগবান বাঁচাইয়া রাখে, তবে না!'

'রাখবে, রাখবে মা—রাজার ছেলে মল্লারাজ হবে। এমন চালাক ছেলে আর তো চোখে পড়ে না।'

সেই যমুনার কাছ হইতে রাজার নিমন্ত্রণ ছিল। আখ্‌ড়ার গাছে ইতিমধ্যেই আম বড় হইয়া উঠিয়াছে—রাজা গেলে সে তাকে বিস্তর পাড়িয়া দিবে; তা'ছাড়া আখ্‌ড়ার মতন এমন বিগ্রহ আর কোথাও নাই—রাধাকৃষ্ণ যেন খুসিতে সর্ব্বক্ষণ হাসিতেছেন—শ্রীখোলের সঙ্গে কীর্ত্তনও সে রাজাকে শুনাইয়া দিবে ইত্যাদি।

যদিও রাধাকৃষ্ণকে রাজা ভক্তি করে এবং শ্রীখোল শুনিতে তার আশৈশব আগ্রহ, তবু কিন্তু আমের কথাটাই তার মনে সব চাইতে বেশি লাগিয়াছিল। পিসিমার আচার শেষ করিয়া আজ যমুনা বৈষ্ণবীর আম দিবার প্রতিশ্রুতিটা তার মনে পড়িল। সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরিলে পিসিমা যখন তার স্বভাবসিদ্ধ বিলাপটা আজ অধিকতর তীব্রতার সঙ্গে শুরু করিবে, রাজা তখন কাপড়ের খুঁট হইতে সগর্ব্বে এতগুলি নতুন কচি আম বাহির করিয়া দিবে। দেখি, পিসিমার কান্নাটা কোথায় থাকে।

যমুনা ঠাকুরঘরের সমুখের মাটির দাওয়ায় পিটুলি-গোলা দিয়া আল্‌পনা আঁকিতেছিল, চোখ উঠাইয়া বিস্ময়ে একেবারে অবাক্ হইয়া গেল। রাজপুত্র পক্ষীরাজে চড়িয়া সত্যসত্যই যে তার দুয়ারে উপস্থিত হইতে পারে, তাহা কি সে স্বপ্নেও চাই ভাবিতে পারিয়াছে! মুখটা তার গর্ব্বে, আনন্দে, হাসিতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। দাঁড়াইয়া কহিল, 'ছোটকর্ত্তা, তুমি! এস, এস ভাই—তুমি আসবে, এ যে আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারি নি।'

রাজা দাওয়ার উপর উঠিয়া কহিল—'বাঃ রে, তুমিই তো আমাকে আসতে বলেছিলে। বলেছিলে যে—'

'বলেছিলুম তো, সারা জীবন ধরে' কত প্রার্থনাই তো করেচি, ক'টা চাওয়া আমাব পূর্ণ হয়েচে ? চল ভাই, এখানে আব নয়, রাজপুত্রকে একবার কুঁড়েঘরে নিয়ে বসাই।'

নিজেব কুটিবেব আল্‌পনা-আঁকা মাটিব মেঝেয় যমুনা পাড়েব সুতায় তৈবি আসন পাতিয়া দিল। চিত্রিত হাত-পাখাটা তাড়াতাড়ি পাড়িয়া আনিয়া বাজাকে জোবে হাওযা কবিতে লাগিল। অপূর্ব্ব মমতাব সঙ্গে বারম্বাব কহিতে লাগিল—'এই বৌদ্রেব মধ্যে সাবাটা পথ হেঁটে এসে মুখখানা যে বাঙা হযে উঠেছে—কত কষ্ট কবে এলে—আহা মবে যাই। কী গৌববই দিলে হতভাগিনীকে—'

'কী বলছ ? ও বকম কচ্চো কেন ?—অসুখ কবেচে ?'

'না, গোপাল, না, অসুখ নয। এব চাইতে বড সুখ যে আমি কল্পনা কবতেও পারি নে, গোপাল—'

'ফেব্ গোপাল ?'

'কি বলব তবে ? আব কোন্ বড গৌববেব নাম দিয়ে তোমায ডাকব ?'

'আমাব নাম তো বাজা।'

'বাজা যিনি, তিনিই তো গোপাল।' যমুনা চোখ বুজিযা কহিল। 'সবাব মনেব উপব তাঁবই তো বাজত্ব। বৃন্দাবনে একদিন তিনিই বাখালদেব সঙ্গে বাঁশি বাজিয়েছিলেন।—তাঁবি খোঁজে তো অন্ধকাবে হাত্‌ড়ে মবচি, পাব তাঁকে কবে ?'

'শুনচো, বোষ্টুমি, তাকাও।'

'কি বাজা ?' যমুনা চোখ মেলিয়া চাহিল।

'তোমাদের এখানে অনেক আমগাছ আছে, না ?—সবশুদ্ধ কতগুলো ?'

'অনেক আছে। সবই দেখাব তোমাকে। কত আছে বৈবিগী,

কতই আছে বষ্টুমি, কত গাছ, কত মিঠে ছায়া, কত ফুল, কত গান। রাধেশ্যাম রয়েছেন সবার মধ্যে রাজারাণীর মত—সব তোমাকে দেখাব।—তাব আগে আমিই তোমাকে দু' চোখ ভবে দেখে নি। ওদেরও দেখাব, কিন্তু ওবা চিনলে হয়।' যমুনা বৈষ্ণবী বিমুগ্ধ বিস্ময়ে রাজাব দিকে তাকাইযা যেন স্বপ্ন দেখিতে লাগিল।

বাজা বিব্রত হইয়া কহিল, 'ধ্যেৎ, এমন করলে আমার লজ্জা কবে। ও বকম ক'বো না।'

যমুনা তাডাতাডি নিজেকে সংযত কবিল। দীর্ঘশ্বাসেব মত কবিয়া কহিল, 'না, আব কববো না, গোপাল।'

যমুনা বাজাকে একেবাবে টানিযা লইযা বেডাইল। আশ্রমেব এমন কেহ বাকি বহিল না, যাহাকে যমুনা বাজপুত্র না দেখাইল। কিন্তু অন্য কাহাকেও সে বাজাব সঙ্গে অন্তবঙ্গতা কবিতে দিল না,—বাজা যেন তাব নিজস্ব সম্পত্তি, এমনি গৌবব এবং গর্ব্বেব সঙ্গে বাজাব হাত ধরিয়া সে ফিবিতে লাগিল। তাব ভাণ্ডাবে যত কিছু খাবাব ছিল, বিগ্রহেব ভোগেব যা কিছু শ্রেষ্ঠ ছিল, সব আনিয়া সে বাজাব জন্য জডো কবিল। বাজা খাইতে চায না, কিন্তু যমুনাকে আজ কে বোধ কবিতে পাবে। সে আজ দুর্ব্বাব হইযা উঠিযাছে।

কাণ্ড দেখিয়া আশ্রমেব প্রবীণ অধ্যক্ষ মথুবাদাস স্মিত হাস্য করিয়া কহিলেন—'যমুনাব আজ হলো কি? ওবে তোবা দেখ,—আমাব পাগ্‌লি মেয়েটা যে পদ্মাব মতো পাগ্‌লা হয়ে উঠেছে—'

'গোপাল?'

'ফেব!'

'বাজা!'

'কি?'

'বল, আবার আসবে, আবার তুমি আসবে। এই শেষ নয়। একটু আশা আমাকে করতে দাও। বল আসবে—'

'না।'

'না!' যমুনা স্তম্ভিত হতাশার সঙ্গে কহিল—'নয় কেন? কি অপরাধ আমি করলাম? সত্য বলতো, কি দোষ আমি করেচি—সজ্ঞানে তো কিছু করিনি, যদি—ওঃ! তোমাকে গান শোনাব বলেছিলুম, শোনাই নি—না? শুনবে? বল, কি গান আমি গাইব?—'

'দূর, তা নয়। বাঃ রে, তোমার একটুও মনে নেই বুঝি?' রাজা হতাশ হইয়া কহিল। 'আমার আম কোথায়? সেদিন তো কতই কাঁচা আম পেড়ে দেবে বলেছিলে, একটাও দিলে কি?'

'ও আমার পোড়া কপাল!' বলিতে বলিতে যমুনা উচ্ছ্বসিত হাসির বেগে একেবারে গড়াইয়া পড়িল। কহিল, 'আমি তো ভয়ে মরি, কেন জানি এতো রাগ!—কত আম তুমি নেবে, এই নাও।'—বলিয়া সে তক্তপোষের নিচে হইতে ডালা ভর্তি ছোট ছোট কাঁচা আম বাহির করিয়া আনিল।

এতগুলি কাঁচা শ্যামল সুন্দর কচি কচি আম দেখিয়া রাজা খুসিতে প্রায় নাচিয়া উঠিল। উচ্ছ্বসিত স্বরে কহিয়া উঠিল, 'ঈস্, কী সুন্দর রে!—হি হি হি—এই আমি খুঁট মেলে ধরলাম, ঢেলে দাও—সব ঢেলে দাও—'

'ও কি!' হাসিয়া যমুনা কহিল—'দূর্, তুমি খুঁটে করে' নিতে যাবে কেন? তোমার দুটো পকেট আজ ভর্তি করে নিয়ে যাও—বাকি যা থাকবে, কাল ভোরেই আমি পৌঁছে দিয়ে আসব—আরও কুড়িয়ে নিয়ে যাব। না না, ছি ছি, রাজপুত্রকে আমি আম খুঁটে বেঁধে দিতে পারব না—আমার কি একটুও কাণ্ডজ্ঞান নেই, লোকে আমাকে বলবে কি?'.

অত্যন্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেই রাজাকে রাজি হইতে হইল। কিন্তু নিচের দুইটি এবং উপরের একটি পকেট সে মুহূর্ত্তের মধ্যে পূর্ণ করিয়া ফেলিল এবং দুই হাতে সাধ্যাতিরিক্ত আম স্তূপীকৃত করিয়া কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত বোধ করিল। ইহার পর যমুনা বৈষ্ণবীকে পুনর্ব্বার আসিবার প্রতিশ্রুতি দেওয়া তার পক্ষে আর কষ্টকর হইল না। আর এক মিনিট সময়ও বৃথা নষ্ট না করিয়া সে আখ্‌ড়ার বাহিরে আসিল এবং দ্রুত বাড়ির দিকে ছুটিতে শুরু করিয়া দিল।

সন্ধ্যার আর বেশি বাকি ছিল না। রাজাকে বিদায় দিয়া সেই অত্যাসন্ন সন্ধ্যার ধূসর ছায়ায় আখ্‌ড়ার প্রবেশ-দুয়ারে হেলান দিয়া যমুনা বৈষ্ণবী একটা বিষণ্ণ উদাস-দৃষ্টিতে সম্মুখ দিকে চাহিয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। কিছুই যেন সে দেখিতে পাইতেছে না—ঘনায়মান সন্ধ্যার মত তার দৃষ্টিও ঝাপ্‌সা হইয়া আসিল। শুধু মনের মধ্যে বহুদিনবিস্মৃত একটা ক্ষীণ রাগিণীর লুপ্তপ্রায় একটু রেশ আসিয়া বারবার উপস্থিত হইতে লাগিল—আখ্‌ড়ায় ফিরিবার মত শক্তিও আর তার বজায় রহিল না।

## আট

দুর্গাপ্রসন্ন এক সময় রাজাকে একটা এয়ার-গান্ কিনিয়া দিয়াছিলেন। তাহার বহুদিন বহু চেষ্টা সত্ত্বেও কিন্তু সমুদয় পাখি এবং কাঠবিড়ালী অক্ষত থাকিয়া গেছে। এ-অবস্থায় রাজা যখন ছর্‌রা ছুঁড়িত তখন, গীতার নিষ্কাম কর্ম্মের ন্যায়, কোনও ফলেরই আশা করিত না। কিন্তু একদিন সহসা তার গুলি লক্ষ্য বেধ করিল—ছোট একটা চড়ুই পাখি ঘুরিতে ঘুরিতে হাওয়ার মধ্যে চক্র রচনা করিয়া মাটিতে আসিয়া পড়িল। কিন্তু সেই ক্ষুদ্র প্রাণীটার বুকের মধ্য হইতে যখন রাঙা শোণিত ফিনিক্ দিয়া

বাহির হইতে লাগিল, ক্ষুদ্র কোমল লোমগুলি যখন রক্তে রঞ্জিত হইয়া গেল, একটা নিরুপায় বেদনায় যখন সেটা ডানা এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পা দুইটা দাপ্‌ড়াইতে লাগিল, তখন রাজার সমস্ত বীরত্বগর্ব্ব একেবারে জল হইয়া গেল।

মনে মনে সে কহিল, 'দূর, এত্তোটুকু একটা পাখিকে আবার মারতে আছে—না মারলেই ভালো ছিল, কিচিরমিচির করে কতই খেলে বেড়াত!—আর ওর যদি একটা মা থাকে, তবে তো আমার পাপই হবে! মারতে যদি হয়, বাঘ মারো, সাপ মারো, বুনো শূয়োর মারো—যারা তোমার ক্ষতি করবে। ও-বেচারি আর কোন্ ক্ষতিটা করত'—শুন্‌লি পাখি, মানুষের হাতে না মরলি, স্বর্গে যাবি, বেশ মজাতে থাকবি, কিচিরমিচির আর করতে হবে না, সুন্দর সব গান গাইতে শিখবি—মরেছিস্ তাতে ভয় কি, না?'

রাজা ঠিক করিল, চড়ুইয়ের রীতিমত একটা অন্ত্যেষ্টি করিবে, যাতে উহার স্বর্গলাভে আর কোনও বিঘ্নই না ঘটে। স্বর্গে যদি যাইতে পারা যায়, তবে মরাটা যে অকিঞ্চিৎকর ও উপেক্ষারই জিনিষ, রাজার এই দর্শন আজিকার নয়। ওর মার মৃত্যুর পর হইতেই এই সুদৃঢ় বিশ্বাসকে সে আঁক্‌ড়াইয়া ধরিয়াছে।

দুপুর বেলা। চাকরবাকরেরা পর্য্যন্ত কাজকর্ম্ম সারিয়া দিবানিদ্রা উপভোগ করিতেছে,—শুধু রাজারই বিশ্রামের ফুরসৎ নাই। সমুখে তাহার কর্ত্তব্য পড়িয়া রহিয়াছে। দেশলাইয়ের বাক্সটা হাতের তেলোর মধ্যে ঝাঁকিতে ঝাঁকিতে সে দালান হইতে বাহির হইয়া আসিল। এখান হইতে খালের মধ্যপথে একটা চৌচালা ঘর ছিল—দালান সম্পূর্ণ হইবার আগে দুর্গাপ্রসন্ন সেইটাকে বৈঠকখানারূপে ব্যবহার করিতেন। তারই পিছনে তেঁতুলগাছটার তলায় রাজার প্রভাতের শিকার কচুপাতায় ঢাকা ছিল। রাজা সেইখানে আসিয়া থামিল।

পকেটের মধ্যে হাত চালাইয়া কয়েকখণ্ড কাঠের টুকরা বাহির করিয়া আনিল এবং সেই কাষ্ঠসহযোগে পরি'াটি করিয়া এক চিতাশয্যা রচনা করিল—মায়ের চিতা রাজার দেখা ছিল। অবশেষে পাতার আচ্ছাদন হইতে পরম মমতার সঙ্গে মরা পাখিটাকে বাহির করিয়া আনিয়া চিতার উপর শোয়াইয়া দিল এবং শুকনো পাতা দিয়া পুনরায় তাকে ঢাকিয়া দিয়া মুখাগ্নির ব্যবস্থায় উদ্যোগী হইল।

কিন্তু মুস্কিল হইল দেশলাই জ্বালান লইয়া; আংশিকভাবে দেশলাইটা পুরান হওয়ার দরুণ এবং আংশিক ভাবে বাতাসের দৌরাত্ম্যিতে কাঠি আর কিছুতেই ধরান যায় না। রাজা কাঠির পর কাঠি ঘষিতে লাগিল—মুখ বিকৃত করিয়া, ক্রোধে ঠোঁট কামড়াইয়া যতই সে অধ্যবসায়ের একশেষ হইল, দেশলাই ততই অদ্ভুত কৌতুকে মুখ গম্ভীর করিয়া রহিল—একটু ঝিলিকমাত্র দিল না। কিন্তু রাজাও নাছোড়বান্দা, একটা কাঠি সে খোলে, দেশলাইয়ের গায়ে প্রবল জোরে ঘষিয়া দেয়, এবং তাহা না জ্বলায় ক্রোধের সঙ্গে ঘরের বেড়ার দিকে ছুঁড়িয়া দিয়া নতুন কাঠি বাহির করিয়া প্রাণপণে ঘষ্ড়াইতে আরম্ভ করিয়া দেয়।

উদ্যোগী পুরুষসিংহের লক্ষ্মীলাভ সম্বন্ধে একটা কথা আছে, রাজার ক্ষেত্রেও তাহা ফলিল। সহসা একবার দেশলাইয়ের বারুদ মৃদুগুঞ্জন করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। শুকনো পাতায় আগুন ধরাইয়া দিতে রাজা একটুও আর দেরি করিল না। এক নিমেষে মরা পাতাগুলি রঙিন মহোৎসব শুরু করিয়া নৃত্য করিতে লাগিল—রাজার আর আক্ষেপ রহিল না। একটু দূরে গিয়া দাঁড়াইয়া চোখ বুজিয়া হাত জোড় করিয়া সে প্রার্থনা করিতে লাগিল—'ভগবান, ওকে তোমার কাছে স্বর্গে নিয়ে যাও। ও ভারি লক্ষ্মী পাখি,—কাউকে কিছু বলে না, শুধু আপন মনে কিচিরমিচির করে' খেলে বেড়ায়।'

সহসা আগুনের ঝাঁজটা বড় বেশি উগ্র মনে হইল। পাতার উপর যে-আগুন নাচিতেছিল তার চাইতে বহুগুণ অধিক এক অগ্নিশিখার আভা আসিয়া মুদ্রিত চোখের মধ্য দিয়া প্রবেশ করিল। রাজা তাড়াতাড়ি চোখ মেলিয়া ঘরের দিকটায় চাহিল, এবং এক মুহূর্ত্তে ভয়ে স্তম্ভিত হইয়া গেল। দেখিল, ঘরের এদিককার বেড়ার নিচে একরাশ আগুন জ্বলিয়া উঠিয়া উন্মাদের মত উপরের দিকে ছুটিতে আরম্ভ করিয়াছে। দেখিতে দেখিতে তাহা বেড়ার সমস্ত দৈর্ঘ্য আবেষ্টন করিয়া ফেলিল—সাপের ফনার মত অগ্নিশিখা উদ্ধতরোষে বাঁশের বেড়ায় ছোবল মারিতে লাগিল। মাটি হইতে ছাড়া পাইয়া যেন সহস্র দৈত্য লাফাইয়া উঠিয়াছে—তাহাদের লোলুপ জিহ্বা হইতে স্ফুলিঙ্গের পর স্ফুলিঙ্গ উড়িয়া আসিতেছে। বাঁশের গিঁঠ্‌গুলি বন্দুকের গুলির মত সশব্দে ফাটিতেছে, সমস্ত বেড়া অগ্নিজালে ছাইয়া গেছে।

রাজার মুখ দিয়া কথা বাহির হইল না, চিৎকার করিতে গেল, দেখিল গলা দিয়া শব্দ বাহির হইল না। তখন চোখ বুজিয়া প্রাণপণে সে বাড়ির দিকে ছুটিতে লাগিল।

সংবাদ পাইয়া সারা বাড়ির লোক সেদিকে ছুটিল। সমস্তা অম্বিকা-চরণ দৌড়ের প্রতিযোগিতায় অপরাপর সকলকে হারাইয়া দিয়া ছুটিতে ছুটিতে চিৎকার করিতে লাগিল—'ওরে বালতি আন্, জল আন, আগুন, আগুন!' দুর্গাপ্রসন্নও রাজার ভীত চিৎকার শুনিয়া বাহিরে আসিয়া পড়িলেন এবং ইন্দির ঠাকরুণ ছুটিতে ছুটিতে বিলাপ শুরু করিলেন—'ওরে আমার সর্ব্বনাশ হইল রে—কোন্ পাপে এমুন হইল রে—বৌমা, তোমার সোনার সংসার আমার হাতে পুইড়া ছাই হইল গো—'

একাধিক পাঁচিল, ঘর ও দালানের বাধা ডিঙাইয়া তবে সেই পুরাতন বৈঠকখানা ঘরের কাছে যাওয়া যায়। অম্বিকাপ্রমুখ সকলে যখন অকুস্থানে যাইয়া উপস্থিত হইল, তখন বিস্ময়ে সবাই হতবাক্ হইয়া গেল। দেখিল,

একদিকের সুদীর্ঘ বেড়ার সমস্তটা মাটিতে কাৎ হইয়া পড়িয়া তখনও স্থানে স্থানে জ্বলিতেছে, কিন্তু সারা ঘরের ভ র কোথাও আগুনের চিহ্নমাত্র নাই। যেন কে একজন মহা বলবান ব্যক্তি একদিকের সমস্ত বেড়াটা আলগোছে তুলিয়া লইয়া এদিকে ছুঁড়িয়া ফেলিয়াছে—অন্যান্য বেড়াতে যাতে আগুন লাগিতে না পারে, সেদিকে তার হুঁসিয়ারির দরুণ সারা ঘর জ্বলিয়া উঠিতে পারে নাই। অথচ আশেপাশে যতদূর দৃষ্টি চলে, একটা জনপ্রাণীরও চিহ্ন দেখা যায় না। পোড়া বেড়াটাতে আগুনের যতটা আধিপত্য দেখা গেল, তাহাতে বিস্ময়ের আর অন্ত থাকিল না এই ভাবিয়া যে, কোন্ অদ্ভুত উপায়ে বাড়িটা রক্ষা পাইল—অন্যান্য বেড়ায় আগুনের ছোঁয়াচ লাগিল না কেন? কোন্ অত্যদ্ভুত উপায়ে তারের বাঁধনগুলি খুলিয়া সুবিশাল এই বেড়া এতটা দূরে ছিট্‌কাইয়া পড়িল? এই আশ্চর্যজনক ঘটনার কোনও সন্তোষজনক ব্যাখ্যা কেহই পায় নাই, রাজাও নয়। সে শুধু এইটুকু দেখিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছিল যে, তার পাখিটার দাহকার্য্য বেশ ঘটা করিয়াই সম্পন্ন হইয়াছে এবং ওর স্বর্গপ্রাপ্তি সম্বন্ধে আর কোনও সন্দেহ থাকাই উচিত নয়।

কিন্তু এই ঘটনার পরে এবং এই উপলক্ষ্যে কতকগুলি মন্তব্য রাজাকে অত্যন্ত বেশি রকম প্রভাবান্বিত করিয়াছিল। শিশুর মধ্যে যে মরমী চিরবিরাজমান, তার নিকট এগুলির মূল্য কম নয়।

সদর-গমস্তা অম্বিকাচরণ বুড়া নায়েবমশাইকে এ-সম্বন্ধে বলিতেছিল, 'বড় দুরন্ত ছেলে, আগুনটা জোর করে ধরলে এই দালানটাই কি রক্ষা পেত, মনে করেন—উল্টো দিকের জোর হাওয়ায় আগুন এ-অবধি টেনে এনে ছাড়ত।—তবে আশ্চর্য্য বলতে হবে, একটা সারা বেড়াময় আগুন ধরে উঠল, অথচ ঘরের অন্য কোথাও একটু আঁচড় পর্য্যন্ত লাগল না। আর বেড়াটাই বা অমন করে' খসে দূরে ছিট্‌কে পড়ল কেমন করে? জনমানুষ তো একটাও চোখে পড়ল না। আর যদি মানুষেই করে'

থাকে, তবে সে পালিয়ে যাবে কেন, গর্ব্ব করে' দাঁড়িয়ে থাকত—ছোট-লোক হলে বখ্‌শিষ আদায় করে' ছাড়ত!'

বৃদ্ধ নায়েব গম্ভীরস্বরে জবাব দিয়াছিলেন, 'এমনি করেই ভগবান শিশুর সঙ্গে খেলা করেন, অম্বিকা।—ঐ তো তাঁর আনন্দ।'

রাজা এই কথাগুলি আড়ালে দাঁড়াইয়া শুনিয়াছিল। শুনিয়া এক অদ্ভুত ভয়মিশ্রিত পুলকে সে কণ্টকিত হইয়া উঠিয়াছিল। ভগবান! সত্যই তো ভগবান!—শুধু চোখে দেখতে পাওয়া গেল না—এই যা দুঃখ!

তার বাবাকেও সে একদিন এ-সম্বন্ধে পিসিমার কাছে মন্তব্য করিতে শুনিতে পায়।—'ঘর-ভাঙ্‌বার প্রবৃত্তি ওর রক্তের মধ্যে আছে, দিদি, পুড়ে যে সব শেষ হয়নি, এ ভগবানেরই ইচ্ছা।—নইলে অমন আগুন এমন করে' থেমে যায়?—এ যেন তিনি আপনি এসে নিজ হাতে নিবিয়ে দিয়ে গেলেন, শিশুর সঙ্গে অদ্ভুত খেলা খেলে গেলেন!'

ইন্দির ঠাকুরাণী অসীম স্নেহের সঙ্গে কহিলেন, 'অখন ভগবান বাঁচাইয়া রাখে, তবে না।—রাখব—যেমুন এইবার রাখল, এমুন কইরাই রাখব!'

ইহার পর প্রায় একটা সপ্তাহ গত হইয়াছে। সেদিন বিকালে রাজা জেলেপাড়ার দিকে রওনা হইয়া পড়িল। উদ্দেশ্য, মাণিকের সঙ্গে দেখা করিয়া পদ্মায় মাছ ধরিতে যাওয়ার বিষয়ে একটা পাকাপাকি করিয়া আসিবে। এমন ফাঁকি দেয় মাণিকটা—এ-ছুতায় ও-ছুতায় রাজার অমন সঙ্গত প্রস্তাবটা এড়াইয়া চলে। রাজা আজ ঠিক করিয়াছে, মাণিককে যাইয়া বলিবে যে, বাবা যাইতে অনুমতি দিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে, মাণিক রাজাকে শীঘ্র একদিন না লইয়া গেলেই বরং তাঁর রাগ হইবে।

বড় সড়ক ছাড়িয়া রাজা জেলেপাড়ার কাঁচা রাস্তা ধরিল। বাঁ-দিকে

কিছু দূবে চোখে পড়িতেছে মুণ্ডেশ্ববীব বাগান। অমাবস্যা রাত্রে এই বাগানেব দুই প্রান্তেব দীর্ঘ দুইটা তালগাছে পা দিয়া মুণ্ডমালিনী কালীকে নাকি এখনও দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখা যায। 'আজগুবি!'—বাজা মনে মনে বলে। 'মা কালীর খেয়ে-দেয়ে আর কাজ নেই।'

কিন্তু মুণ্ডেশ্ববীর বাগানটা গ্রামবাসীদেব কাছে একটা মহা আতঙ্কের স্থান। ঘনসন্নিবিষ্ট আমবাগানের মধ্যে মুণ্ডেশ্ববীব মন্দিবটা এখন একটা ভঙ্গিহীন ভগ্নস্তূপ ছাড়া আব কিছুই নয়। সেই স্তূপ ফুঁড়িয়া একাধিক অশ্বত্থ এবং বটগাছ ক্রমেই স্ফীতকায হইয়া উঠিতেছে। নিচেই কচুবি এবং শ্যাওলায় আচ্ছন্ন একটা ডোবা পূতিগন্ধ বিস্তাব কবে। ইহা নাকি একসময সুবৃহৎ দীঘি ছিল—স্ফটিকেব মত স্বচ্ছ জলে মুণ্ডেশ্ববীব সুন্দব মন্দিব ইহাতে সততই প্রতিফলিত হইত। কত লোক ইহা হইতে জল লইত, কত লোক স্নান কবিত—ঘণ্টা এবং বাদ্যেব শব্দ জলবাশিতে প্রতিধ্বনিত হইয়া সমস্ত আমবাগান মুখবিত কবিয়া বাখিত। যাহা অতীতেব গৌবব ছিল, ভক্তিতে এবং প্রাণেব উচ্ছ্বাসে যে-দেবায়তন এককালে স্পন্দমান থাকিত, আজ তাহা গ্রামেব আতঙ্কেব বস্তু। সবস্বতী পূজাব সময়ে ইস্কুলেব ডানপিটে ছেলেরা এখানে পলাশফুল সংগ্রহ করিতে আসে—আব কেহই আসে না, আসিবাব প্রয়োজনও হয় না। জেলেবা ছাডা এ-পথ দিযা চলিবাব অন্য কাহাবও প্রয়োজন হয় না এবং জেলেবাও অধিকাংশ সময়ে খালেব পথেই যাতায়াত কবে।

শিষ্ দিতে দিতে বাজা মুণ্ডেশ্ববীব বাগানেব কাছ দিয়া আগাইয়া চলিল।—এই বাগানে নাকি ভূত থাকে। ভূত কেমন হয়, রাজার বডই দেখিতে ইচ্ছা, আবাব ভয়ও কবে। মুণ্ডেশ্বরীর বাগানে একদিন মাণিককে সঙ্গে লইয়া আসিতে পাবিলে মন্দ হইত না। পবম কৌতূহলেব সঙ্গে বাজা গভীব জঙ্গলেব মধ্যে মুণ্ডেশ্ববীর ভগ্নস্তূপ দেখিতে চেষ্টা করিল। কিছুই চোখে পড়িল না। সে বরাবব হাঁটিয়া চলিল।

মাণিকের দেখা পাওয়া গেল না। বটতলির হাটে সে মাছ বেচিতে গিয়াছে, সুতরাং রাজাকে হতাশ হইয়া ফিরিতে হইল।

সন্ধ্যা আসন্নপ্রায়। মুণ্ডেশ্বরীর বাগানের কাছ দিয়া হাঁটিতে হাঁটিতে রাজার গা'টা একটু ছম্‌ছম্‌ করিতে লাগিল।—সত্যি, কী আছে এই বাগানের মধ্যে? কেন লোকেরা এর ভিতরে যায় না? গেলে কি হয়? ভূত কি সত্যিই আছে? বাবা বলেন, ভূত যদি থাকেও, তবু আমাদের চোখ দিয়া ভূত দেখা সম্ভব নয়; অনিষ্ট করিবার শক্তিও ভূতের কিছু নাই। আর ভূত যদি সত্যই দেখা যায়, তবে কেমন দেখিতে হইবে?

সহসা চম্‌কাইয়া রাজা দেখিল, কখন্ সে দুর্ব্বাচ্ছন্ন অসমতল পায়ে-চলা পথ ধরিয়া মুণ্ডেশ্বরীর বাগানের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে, টেরই পায় নাই। অদূরে একটা ইঁটের পাঁজা দেখা যাইতেছে—হয়তো এটাই মুণ্ডেশ্বরীর মন্দির। তার নিচেই হাজিয়া-যাওয়া, ঘাস ও দামে সম্পূর্ণ আচ্ছন্ন একটা দীঘি। এক মুহূর্ত্তে রাজা দুই চোখে অন্ধকার দেখিতে লাগিল। সর্ব্বনাশ! কেমন করিয়া, কোন্ পথে সে এই ভয়ঙ্কর বাগানের মধ্যে আসিয়া ঢুকিল? কোথায় ছিল তার চোখ, কোথায় ছিল তার বুদ্ধি! অ্যাঁ, ভূত! ভূত! যন্ত্রচালিতের মত রাজা মুণ্ডেশ্বরীর মন্দিরের ভগ্নস্তূপের দিকে আকৃষ্ট হইয়া চলিল। ছুটিয়া ফিরিয়া পালাইতে ইচ্ছা হইল, কিন্তু কে যেন একটা লোহার শিকল দু' পায়ে পরাইয়া দিয়াছে এবং সেই শিকল টানিয়া তাহাকে কাছে আকর্ষণ করিয়া লইতেছে। অত্যদ্ভুত পরিশ্রমে রাজার কপাল দিয়া টস্‌টস্ করিয়া ঘাম ঝরিয়া পড়িতে লাগিল, এবং ভগ্নস্তূপের নিকট সে যে কখন গিয়া বসিয়া পড়িল, নিজেই টের পাইল না।

কারা সব ও-দিক হইতে আগাইয়া আসিতেছে? চতুর্দ্দিক হইতে

যেন সহস্র সহস্র অশরীরী আত্মা একটা জীবিত মনুষ্যের সঙ্গ পাইবার জন্য অন্ধকার বাগানের সংখ্যাহীন গোপন আবাস হইতে প্রাণপণ ছুটিয়া আসিতেছে। সহসা একটা ডাল মড়মড় করিয়া ভাঙিয়া পড়িল, এবং যেন অদৃশ্য বহুজনের মিলিত পদশব্দে শুকনো পাতারা মুখর হইয়া উঠিল। একটা প্রবল বাতাস ছুটিয়া আসিয়া ভগ্নস্তূপের ছিদ্রগুলির মধ্যে হি হি করিয়া অট্টহাসি আরম্ভ করিল।

হাঁটু দুইটা বুকের মধ্যে গুঁজিয়া রাজা ভয়ে কাঁপিতে লাগিল। চোখের দৃষ্টি ক্রমশ ঝাপ্‌সা হইয়া উঠিতে লাগিল। ভয়ে আর সে চোখ মেলিতে পারিতেছে না। শুধু নিজের মধ্যে সাহস আনিবার আপ্রাণ চেষ্টা করিয়া কহিতে লাগিল—'বেশ তো, ভূত দেখা গেলে ভালই তো—আমার মাও তো এখন ভূত—মাকে দেখলে তো মজাই—কতদিন যে দেখিনি। বেশ তো—'

রাজা চোখ মিটিমিটি করিয়া চাহিল। অস্পষ্ট অন্ধকার ক্রমশই দুর্ভেদ্য হইয়া উঠিতেছে। রাজা উঠিতে চেষ্টা করিল, পারিল না, ইটের স্তূপে কনুই ভর করিয়া কোনও প্রকারে সে অবসন্ন দেহটাকে খাড়া করিয়া রাখিল। কে যেন চুপিচুপি শুধুই পরামর্শ দিতে লাগিল—আর কেন, শুইয়া পড়, জাগিয়া থাকিয়া লাভ কি। শুইয়া পড়

অকস্মাৎ অতি সূক্ষ্ম সানুনাসিক একটা শব্দ রাজার কানে প্রবেশ করিল। শব্দ লক্ষ্য করিয়া রাজা দূরের তেঁতুলগাছটার দিকে চাহিল। পলকে দুই হাতে সে চোখ ঢাকিল। স্পষ্ট দেখিয়াছে—একটা অশরীরী কালো ছায়া অদ্ভুত নাকী শব্দ করিতে করিতে সরু সরু দীর্ঘ পা বাড়াইয়া এক ধাপ এক ধাপ করিয়া কাছে আগাইয়া আসিতেছে। রাজা সে শব্দ কানে শুনিল, মুদ্রিত আঁখি-পল্লব অশরীরী মূর্তিকে আটকাইতে পারিল না। ভয়ে রাজা মূর্চ্ছা যাইবার উপক্রম হইল।

সহসা বৃদ্ধ নায়েব-মশায়ের কথাটা তার মনে পড়িয়া গেল—'এমনি করেই

ভগবান শিশুর সঙ্গে খেলা করেন, অম্বিকা।—ঐ তো তাঁর আনন্দ!' ইহা যেন মন্ত্রের মতো কাজ করিল; এই ভয়াল আবেষ্টনের গহন অন্ধকার ও রহস্যকণ্টকিত বনস্থলী চমকিত করিয়া সহসা রাজা উচ্চহাস্য করিয়া উঠিল—'কিছু না, ভগবান, কিছু না—সব তোমার চালাকি —আমি সব বুঝতে পেরেচি।'—হি হি করিয়া রাজা কেবলই হাসিতে লাগিল। কৌতুক এবং ভয়ের সংমিশ্রণে এক বিচিত্র হাস্য।

হি হি হি—ছেদহীন, সমাপ্তিহীন হাসি।

জেলেপাড়ার দিক হইতে ক্রমশ একটা সঙ্গীত অগ্রসর হইয়া আসিতেছিল। শীঘ্রই গানের পদগুলি পর্য্যন্ত স্পষ্ট হইয়া উঠিল—'ও মন-মাঝিরে তুই আমারে ভবপারে লয়ে চল্!'

রাজা প্রথমেই অনুমান করিয়াছিল, গলা শুনিয়াই চিনিতে পারিল এ মাণিক ছাড়া আর কেহ নয়। এবার সে বুক ফুলাইয়া দাঁড়াইয়া পড়িল, এবং প্রাণপণে চিৎকার করিয়া ডাকিতে লাগিল—'মাণিক, মাণিক, আমি রাজাবাবু—ছোটকর্ত্তা—মুণ্ডেশ্বরীর জঙ্গলে এসে পড়েছি, তুই এসে নিয়ে যা তো আমাকে—ও মাণিক—'

'ও মন-মাঝিরে তুই আমারে ভবপারে লয়ে চল্—'

মাণিকের গান থামিল না। রাজা বুঝিল, সে শুনিতে পায় নাই। গলায় যতটা শক্তি ছিল সমস্ত সংগ্রহ করিয়া সে চিৎকার করিতে লাগিল। অতঃপর মাণিকের গান থামিয়া গেল। কতক্ষণ চুপ থাকিবার পর তার হাঁক শোনা গেল—'কে? বাগানে কে কথা কয়?'

রাজা সচিৎকারে কহিল, 'আমি, রাজাবাবু, ছোটকর্ত্তা—তুই শীগগির আয়—আমার ভয় করছে।'

'ছোটকর্ত্তা! দূর!—হ, আমি বুঝি আর তোমাগো কৌশলটা বুঝি না! ভুলাইয়া কাছে নিতে চাও!—মাণিক-মাঝি অত কাঁচা ছাওয়াল কিনা

—ছোটকর্ত্তা না হাতী ।—ছাই পড়ুক, ছাই পড়ুক তব মুখে।'

'আরে না, না—আমি সত্যই আমি। আমিই রে, আমি ভূত না।'

'এইতে কি আব মাণিক-মাঝি ভোলে—হক্কল ভোল্‌ই আমি জানি—মাঝিব ছাওযাল না? কও দেখি—বাম বাম।'

এই বিপদের মধ্যেও বাজাব হাসি পাইল। বলিল—'হি হি হি—বাম বাম, লক্ষ্মণ, সীতা, বাধাকৃষ্ণ, দুর্গা—আব কত শুনবি। দূর ভীরু, আমি ছোটছেলে হয়ে এখানে আসতে পেবেচি, আব বুডো-ধাড়ী তুই ভয় পাচ্ছিস?'

বাজাব কণ্ঠস্বব চিনিতে পাবায়, এবং সর্ব্বাপেক্ষা বেশি, তাহাকে রাম নাম উচ্চাবণ কবিতে শুনিয়া মাণিকেব প্রত্যয় হইল। হাঁক দিয়া কহিল, 'ওঃ, তুমি নি, ছোটকর্ত্তা? দাঁড়াও, আমি আইলাম।'

মাণিক ছুটিতে ছুটিতে বাগানে ঢুকিল। কিন্তু বাজাকে ইটের স্তূপেব কাছে স্পষ্ট দাঁড়াইযা থাকিতে দেখিয়াও সে নিশ্চিন্ত হইল না—তাব অঙ্গপ্রত্যঙ্গেব প্রতি সন্দেহপর দৃষ্টি বুলাইয়া এবং অবশেষে মাটিতে তার ছায়া দেখিয়া তবেই সে নিকটবর্ত্তী হইল।

বাজা বাগিয়া কহিল—'যা ভীরু তুই মাণিক, ভয়েই মরিস্।'

মাণিক কহিল—'এই কি কাণ্ড কবছ, ছোটকর্ত্তা! মুণ্ডেশ্ববীব বাগানে জুয়ানমর্দ্দও দিনদুপুইবে একলা ঢুকতে সাহস পায় না—আব তুমি এই গহিন্ বাত্রে কবচ কি—অ্যাঁ? আবে সব্বনাশ।—এইখানে যে দানাদৈত্যি, ভূতপেত্নীব মহোচ্ছব!—'

বাজা সগর্ব্বে কহিল, 'হলোই বা, ভূত দেখতেই তো এসেছিলাম, দেখেওছি। ঐ তেঁতুলগাছটা থেকে নেমে, বুঝলি—'

'থাউক, থাউক, কর্ত্তা,—আগে ভালয ভালয বাগানেব বাইবে চল।'

হাত ধবাধবি কবিযা তাহাবা মুণ্ডেশ্ববীব বাগান হইতে বাহিব হইয়া আসিল।

## নয়

দুর্গাপ্রসন্নের শরীর ভাল যাইতেছিল না। তবু কিন্তু তাঁর উৎসাহের এবং পরিশ্রমের বিরতি নাই। কোটালনগরকে তিনি স্বপ্ননগর করিয়া তুলিবেন, জগতকে তাক্ লাগাইয়া দিবেন; শ্রদ্ধা এবং কল্পনা থাকিলে জঙ্গলকেও কত সুন্দর করিয়া গড়িয়া তোলা যায়, তাহা দেখাইবেন। লোকেরা সম্মুখে বলিল—ধন্য, ধন্য ক্ষমতা, ধন্য বদান্যতা! এবং আড়ালে বলিল—পাগল, পাগল, আস্ত পাগল! কিসের নেশায়, কোন্ উদ্দেশ্যে, কি আক্রোশে দুর্গাপ্রসন্ন এই অদ্ভুত সৃষ্টিকার্য্যে মাতিয়াছেন, বাহিরের লোক তার কিছুই জানিলনা। তিনি অর্থের মায়া করিলেন না, শরীরের মায়া করিলেন না,—এক দুর্নিবার শক্তিতে নতুন পৃথিবী গড়িতে লাগিলেন।

হৈমন্তী লিখিয়াছে—অম্বিকাদার চিঠিতে জানিতে পারিলাম, তোমার শরীর তেমন ভালো যাইতেছে না। শুনিয়া আমরা অতিশয় চিন্তিত হইলাম। উনি বলিলেন যে, এ অবস্থায় আমার অবশ্য যাওয়া দরকার। যদিও এখন কতগুলি জরুরি মোকর্দ্দমা লইয়া ব্যস্ত আছেন, তবু বলিলেন যে, পাঁচ-সাত দিনের মধ্যেই একবার সময় করিয়া আমাকে কোটালনগরে পৌঁছাইয়া দিয়া আসিবেন। আমার চাইতে তোমাদের জামায়ের উদ্বেগ কম নয়, উনি বারবার বলিতেছেন যে, আমি গেলে তোমার আদর-যত্ন হইতে পারিবে। অসুস্থ শরীরের পক্ষে সেবার প্রয়োজনই সবচেয়ে বেশি। আশা করি, রাজা ভাল আছে, আমাদের একমাত্র ভয়, ও একেবারে গেঁয়ো না হইয়া ওঠে। উনি তো প্রত্যহ একবার করিয়া ওকে এলাহাবাদে লইয়া আসিবার কথা বলেন—ইত্যাদি ইত্যাদি।

'রাজা, তোর দিদি আসচে যে রে!' দুর্গাপ্রসন্ন রাজাকে দেখিতে পাইয়া কহিলেন।

'দিদি! ধ্যেৎ! কবে?' রাজার দুই চোখ সামান্য অবিশ্বাস এবং প্রভূত আনন্দে পূর্ণ হইয়া উঠিল।

'এই আট-দশ দিনের মধ্যেই।' দুর্গাপ্রসন্ন কহিলেন।

'ফাঁকি দিচ্ছ না তো?' রাজা এক গাল হাসিয়া কহিল,—'ঈস্, কী মজা! কতদিন দিদি আসে না, না বাবা? জহর আর মিলিও আসবে তো? হি হি হি,—ভারি মজা হবে তো! মিলিটা বলে—মাম্ মা—এখন বড় হয়ে গেছে, না?—'

'তা হয়েচে বৈ কি।'

'লিখে দাও না, বাবা, আট-দশ দিনের আগেই আসুক, নইলে কাঁচা আম আবার সব ফুরিয়ে না যায়। আম কুরে' কুরে' দিদি যা চমৎকার মাখতে পারে।'

ইহার পর রাজাকে বাড়িতে ধরিয়া রাখা অসম্ভব হইল। আশে-পাশে যাহাকেই সে পাইল, তাহাকেই এমন উৎসাহের সঙ্গে এই অভাবনীয় সংবাদটা বিবৃত করিয়া শুনাইল যে, ব্যাপারটা প্রায় বোধ-গম্যই হইল না। দাবাগ্নির মত রাজা এ-পাড়ায় ছুটিল, ও-পাড়ায় ছুটিল—তার দিদি আসিবার অমূল্য সংবাদটা গ্রামময় প্রচারিত হইতে একটু মাত্র বিলম্ব হইল না।

'জানিস্, আমার দিদি আস্‌বে—জামাইবাবুর সঙ্গে। জামাইবাবু ব্যারিস্টর সাহেব। আর জহর আর মিলি না, সারাক্ষণ কেবল—মামা, মামা। দেখবি অখন দিদিকে,—যা ফর্সা দেখতে, দেখিস অখন।'

'শুন্‌চেন, আমার দিদি না, এই আট-দশ দিনের মধ্যেই এসে পড়বে, এবার ঠিকই আসবে, দেখবেন। জামাইবাবু ব্যারিস্টরি চাকরি করে কিনা, তাই—' ব্যারিস্টরি চাকরি করে, এই কথাটা জানাইয়া দিবার জন্যই ব্যারিস্টর কথাটার আমদানি করিয়াছিল, তাই কি তাহা ঠিক রকম সংগ্রহ করিতে না পারিয়া কহিল—'তাই আসতে পারে না। তবে

এবার আসবেই লিখেচে। জহুব আ:ব মিলি কেবলি বলে—মামা, মামা—'

সেদিন বিকালে রাজা খালপাড়ে হাঁটিতে গিয়াছিল। উৎসুক আগ্রহের সঙ্গে নৌকার পর নৌকা লক্ষ্য করিবার পর সে সম্পূর্ণ হতাশ হইল—একটামাত্রও ঘোম্‌টা-টানা বউ দেখিতে পাইল না। ঝাঁকি-জাল দিয়া ক'টা লোক মাছ মারিবার ফন্দিতে ছিল, কিন্তু মাছেরা বুদ্ধি-খরচ করিয়া জালগুলি এড়াইয়া গেল। তাই ওদিকেও রাজার আকর্ষণ রহিল না।

খালের জলে পাড়ের গাছপালাজঙ্গলের ছবি অপূর্ব্ব সুন্দর হইয়া কাঁপিতে থাকে; নলখাগড়া বনের কাছটায় দু'একটা বক ধার্ম্মিকের মত বসিয়া মন্ত্র-জপ করিতে থাকে—একটা মাছ ঠোঁটে ধরিয়া উড়ান দিলে তবে তাদের চেনা যায়, এমন চালাক!—রাজা মনে মনে বলে। আর এই যারা নৌকার দাঁড় বাহিতে বাহিতে সুর উঠায়, রাজার বড় ভাল লাগে তাদের। ওদের গান শুনিলে মন যেন হু-হু করিতে থাকে, ওদের সঙ্গে অনেক দূরের সব দেশে যাইতে ইচ্ছা হয়—নদী আর সমুদ্রের সুর যেন এই গানগুলির সঙ্গে জড়ান আছে, মনটা কেমন করিয়া দেয়। এই অপূর্ব্ব ধূসর পথ দিয়া ঘোম্‌টা-টানা বউয়েরা কোন্ রহস্যের দেশে যায়?

সমবেত ক্লারিওনেট, ফ্লুট, পাখোয়াজ এবং তব্‌লা প্রভৃতির ঐক্য-তানে সহসা রাজার চমক্ ভাঙিল, ভাটিয়ালি লজ্জিত হইয়া দূরে পলায়ন করিল, এবং রাজা বুঝিতে পারিল, মিলনীতে থিয়েটারের মহড়া শুরু হইয়াছে। এ-সম্বন্ধে অবশ্য আগেই সে সংবাদ পাইয়াছিল, কিন্তু মোশান-মাস্টার নটুবাবুর ব্যবহার সম্বন্ধে ইস্কুলের সহপাঠিদের কাছে যে রিপোর্ট পাইয়াছিল, তাহাতে ওদিকে ঢুঁ মারিতে বড় বেশি একটা

ভরসা পায় নাই। কিন্তু এই অপূর্ব্ব ঐক্যতান শ্রবণ করিয়া তার পক্ষে ধৈর্য্যধারণ করা আর সম্ভবপর হইল না—মিলনীর দিকে সে সকৌতূহলে অগ্রসর হইল।

মোশন-মাস্টার ও অভিনয়-শিক্ষক নটুবাবু একজন কম যোগ্য লোক নয়। জীবনে তিনি বহু স্থানে বহুবার অভিনয় করিয়া যেমন দক্ষতা তেমনি অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছেন। একাধিক শখের অভিনয় পরিচালনা করিয়া সহরে নাকি তিনি রীতিমত নাম কিনিয়া আসিয়াছেন, এবং শুধু তাহাই নয়, একসময় কলিকাতার পেশাদারি থিয়েটারে গেটে দাঁড়াইয়া টিকিট পর্য্যন্ত সংগ্রহ করিতেন! এত সকল কৃতিত্বের পর তিনি যে মিলনী-ক্লাবের অভিনয়-সম্প্রদায়ের পাণ্ডা হইয়া বসিবেন, তাহাতে বিস্ময়ের কিছুই নাই। তাঁর অপরিসীম জ্ঞানে এবং দক্ষ পরিচালনায় 'চন্দ্রগুপ্তের' অভিনয় যে অভিনয়-কলার চরম্ উৎকর্ষ বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে, তাহাতে কাহারও সন্দেহমাত্র নাই।

কিন্তু নটুবাবুর কাজ সহজ নয়। প্রথম হইতেই চন্দ্রগুপ্ত সাজিবার জন্য অভিনেতাদের মধ্যে যেমন কাড়াকাড়ি পড়িয়া যায়, নন্দ সাজিবার জন্য তেমনি লোকের অভাব হয়। এত অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও ইহা নটুবাবুর নিকট পরম বিস্ময়কর মনে হইল, কেননা, সহরে সে দেখিত চাণক্য সাজিবার জন্যই যত মনোমালিন্যের সৃষ্টি হয়,—একটু বোকাটে গোছের লোক ছাড়া চন্দ্রগুপ্ত সাজিবার জন্য অন্যদের কখনও বিশেষ আগ্রহ সে দেখিতে পায় নাই। কিন্তু কোটালনগরের অতি-অতি বুদ্ধিমানদেরও চন্দ্রগুপ্তের জন্য এই লোলুপতা দেখিয়া সে ভারি বিস্ময় বোধ করিল, ঝাঁকড়া চুল দোলাইয়া কহিল—'আহা হা—এর জন্য আর ঝগড়া করছেন কেন! চন্দ্রগুপ্ত তো আর এখন রাজা নয়, নন্দই রাজা। চন্দ্রগুপ্ত মোটেই রাজা হবে কিনা, সবই নির্ভর করচে ঐ আপনার চাণক্য পণ্ডিতের ওপর। চাণক্য যদি একবার বেঁকে বসে, তবে নাও হ'তে পারে—'

শুধু কি তাই। মোশন ঠিক করিয়া দেওয়া কি চাট্টিখানি কথা। উপযুক্ত ভাবভঙ্গি সম্বন্ধে কাহারও কি ছাই কিছু জ্ঞান আছে। 'পশ্চার' দেখাইতে দেখাইতে নটুবাবু মেহন্নতের একশেষ হইল। তবে তার উদ্দেশ্যটা এই যে, শিক্ষাদানে কৃতিত্ব দেখাইয়া দুর্গাপ্রসন্নকে মোহিত করিয়া ফেলিবে এবং অভিনয়-শিক্ষকের একটা স্থায়ী পদ সৃষ্টি করিয়া নিজেকে একমাত্র উপযুক্ত প্রার্থীরূপে দাঁড় করাইবে। অবশ্য তার পরিশ্রমের কথাটা ভাবিয়া দেখিলে সংকল্পটা এমন কিছু দূষনীয় মনে হইবে না, এবং অভিনেতাদের অজ্ঞতা একটা দৃষ্টান্ত দিলেই বুঝিতে পারা যাইবে।

কাত্যায়নের ভাবভঙ্গি দেখিয়া নটুবাবু হতাশ হইল। কহিল—'শুনচ, গদাধর, এ কি যা-তা কবচ। অভিনয় করা একটা সহজ কথা নয়, রীতিমত মাথা খাটিয়ে পার্ট করতে হয়। অমন গদগদ স্বরে বলচ—পানিনি বলেছেন—। অমন কাঁদকাঁদ হয়ে পানিনির নাম বল্লে ধমক খেয়ে মরবে যে। গর্ব্বের সঙ্গে বলবে, তবেই যদি চাণক্য পণ্ডিতের শ্রদ্ধা হয়—'

গদাধর কিন্তু মোশন-মাস্টারের এই অন্যায় নির্দ্দেশ মুখ বুজিয়া বরদাস্ত করিল না। কহিল, 'গদগদ কইরা বলতাছি, তাতে দোষটা হইল কি? নিজের ইস্ত্রীর নাম হক্কলেই অমুন কইরা কয়—'

নটু আকাশ হইতে পড়িয়া কহিল—'ইস্ত্রী! পানিনি?'

গদাধর কহিল—'না তো কি? নাইলে আর চাণৈক্য পণ্ডিত অত চইটা উটব ক্যান্? নিজের ইস্ত্রী নাই কিনা, তাই পরের ইস্ত্রীর নাম সইহ্য করতে পারে না। এইতো এক্কেরে পষ্ট বোঝন যায়—'

নটু বারম্বার ঢোঁক গিলিয়া তবে নিজের কণ্ঠস্বরের উপর দখল পাইল। কহিল—'স্ত্রী! আরে গর্দ্দভ, পানিনি একজন জ্যোতিষী! হস্তরেখা দেখে ভবিষ্যৎ বলতে পারত। তার নিজের হাতের লেখা পুঁথি পর্য্যন্ত আমি কলকাতার যাদুঘরে দেখে এসেচি'

গদাধব গজর্ গজর্ করিতে লাগিল। স্ত্রী হইলেই সে বেশি পছন্দ কবিত এবং অভিনয়ও ঢের সহজ ও মর্ম্মস্পর্শী হইতে পাবিত। কিন্তু যে স্বচক্ষে সেই জ্যোতিষীর পুঁথি দেখিয়া আসিয়াছে, তাব কথা অবিশ্বাস কবিবার উপায কি। কাজেই চাণক্যেব নিকট পানিনির নাম এখন আর সে গদগদ স্বরে উচ্চারণ করে না,—মোশন-মাস্টার নটুবাবুব নির্দ্দেশ-মত, নিজেব কবতল চাণক্য পণ্ডিতের চোখেব সামনে মেলিয়া ধবিয়া তাহাকে ইঙ্গিতে এই কথাটা বুঝাইতে চায় যে, মানুষেব ভূত-ভবিষ্যৎ হাতেব পাতায় অতি সংক্ষেপে লেখা আছে, এবং এ-বিষয়ে পানিনিব গণনাই নিঃসন্দেহে প্রামাণিক। বেচাবি পানিনি।

স্টেজেব উপব সতেজ বিহার্সাল চলিতেছিল। নিচে স্টেজেরই সম্মুখে চেয়াব এবং বেঞ্চি টানিষা আনিয়া সমজ্‌দারেরা বসিয়া ভালমন্দ বিচার কবিতেছিলেন। স্টেজেব উপবে মোশন-মাস্টাব নটুবাবু প্রতিটি ভঙ্গি অভিনয় কবিয়া দেখাইয়া দিতেছেন, যাহাতে কাহাবও একটুমাত্র ভুলচুক না থাকে। ওদিকে এক দৃশ্যশিল্পী দেওয়ালে ক্যাম্বিস টাঙাইয়া বাজসভা আঁকিতে আবম্ভ করিয়াছে। মিলনীব দ্বারোন্মোচনের আব দেরি নাই, তাই সকলকেই তাডাতাড়ি কবিতে হইতেছে।

বাজা ভিতরে প্রবেশ কবিয়া প্রথমে সীন্ দেখিযা আকৃষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু চাণক্য পণ্ডিত যেমন গর্ব্বসহকারে নন্দবংশ ধ্বংস কবিতে লাগিল, তাহাতে বাজা অধিকতব আকৃষ্ট না হইয়া পারিল না। চুপে চুপে সে শ্রোতৃমণ্ডলীর পিছনে আসিয়া দাঁড়াইল এবং অতি শীঘ্রই অভিনয়-নৈপুণ্যে একেবারে মুগ্ধ হইয়া গেল।

অবশেষে হেলেন রঙ্গমঞ্চে আসিল। বেচাবার মুখে কতকগুলি দুষ্ট ব্রণ হওয়াতে এক পক্ষেব অধিককাল সে দাডি কামাইতে পাবিতেছে না, আধ ইঞ্চি লম্বা লম্বা দাড়িতে তাহার সারা গাল আচ্ছন্ন হইয়া আছে।

যথাবিহিত যুবতীসুলভ দম্ভভরে সে দাঁড়াইয়াছিল, এমন সময় এণ্টিগোনাস আসিয়া উপস্থিত হইল।

শ্রীমতী হেলেনের দাড়ি দেখিয়া এক মুহূর্ত্তে হাসিতে রাজার পেটটা মোচড় দিয়া উঠিয়াছিল। ভাবি মজা তো,—একগাল দাড়ি—মেয়েমানুষের —কাণ্ড দেখ! পরিশ্রম সহকারে রাজা গাম্ভীর্য্য রক্ষা করিল, কিন্তু হেলেনের যা মেয়েলী হাবভাব তাহাতে হাসি অধিকক্ষণ চাপিয়া থাকা সহজ নয়। এণ্টিগোনাস তখন বীরদর্পে বলিতেছে—'আমি জানতে চাই, হেলেন, তুমি আমায় বিবাহ করবে কিনা, আমি জান্‌তে চাই—'

পিছন হইতে সহসা একটা তীব্র হি হি হি সমস্ত ঘরের মধ্যে প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল—সে হাসি যেমন তীক্ষ্ণ, তেমনি অফুরন্ত। কাঁপিয়া কাঁপিয়া উচ্চ হইতে উচ্চগ্রামে বাঁশির মত সেই হাসি পরম পুলকের আবেগে লুটোপুটি খাইতে লাগিল। চকিতে দর্শকমণ্ডলী ফিরিয়া চাহিল। মোশনের মধ্যে বাধা পাইয়া নটুবাবু হুঙ্কার করিয়া উঠিল—'কে রে, কোন্ শুয়ার এসেচে—ওঃ। ছোটবাবু—কখন এলে? এসো এসো, এগিয়ে এসো।—তা এরকম একগাল দাড়ি নিয়ে হেলেনের পার্ট করতে এসেছিস, দাসু—ওতে তো আমারই হাসি পায়, আর ছোটবাবু তো ছেলেমানুষ! এসো, এদিকে এগিয়ে এসো—বেশ, বেশ, বড় হাসালে সবাইকে—'

এমন গর্ব্বিত রাজা জীবনে আর কখনও বোধ করে নাই। স্বয়ং চাণক্য পণ্ডিত চন্দ্রগুপ্তের পরিবর্ত্তে তাহাকে নন্দের সিংহাসনে বসাইবার প্রস্তাব করিলেও সে এতটা কৃতার্থ হইত না। মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব হইল না, সগর্ব্বে অগ্রসর হইয়া সে স্টেজে যাইয়া উঠিল এবং শীঘ্রই নটুবাবুর শিক্ষাদান-নৈপুণ্য দেখিয়া সম্পূর্ণ অভিভূত হইল।

কিন্তু বেশিক্ষণ এ আনন্দ ভোগ করা কপালে লেখা ছিল না। গ্রামের নানান্ দিক হইতে শাঁখের শব্দ উত্থিত হইল—সন্ধ্যার আবির্ভাব

সম্বন্ধে আর সন্দেহ রহিলনা। বাবার শাসন এবং পিসিমার ক্রন্দনের ভয়ে এই অপূর্ব্ব এবং বিস্ময়কব বিহার্সেলের মধ্যপথেই রাজাকে একান্ত অনিচ্ছাব সঙ্গে বাহির হইয়া আসিতে হইল। রাত যাইবে, সকাল হইবে, তবে না ইস্কুল বসিবে। নটুবাবু নিজে, স্বয়ং, তাহাকে স্টেজের উপর ডাকিয়া লইয়াছিল,—বিশ্বাস করো, আর না করো! নটুবাবুব এই অনুগ্রহের খবরটা সহপাঠিমহলে প্রচাব করিবার দুরন্ত আগ্রহে বাজা ছটফট্ করিতে লাগিল। সন্ধ্যা না হইয়া গেলে দু'এক বাড়িতে এবই মধ্যে খববটা সে নিশ্চয়ই দিয়া আসিত! হ্যাঁ, বলিবে, নিশ্চয়ই বলিবে,—নটুবাবু বাবাকে যাহা যাহা বলিতে বলিয়াছে, সব সে বলিবে। 'একেবাবে গাধা-গরু পিটিয়ে মানুষ কবতে হচ্ছে,—বলতে গেলে একলার পবিশ্রমেই প্লেটা দাঁড কবাচ্ছি'—এ কথাটাও সে বাবাকে বলিবে। শুধু নটুবাবুর একটা কথা বাজাব মনঃপূত হয় নাই। নটুবাবু বলিল, 'প্লে-র দিন এসো কিন্তু ছোটবাবু,—দেখো, এইসব রদ্দি মাল দিয়ে কি একখানা প্লে আমি দাঁড কবাই,—সবার তাক্ লেগে যাবে—।' নটুবাবু কি ছাই ঘুণাক্ষবেও জানে যে, এই প্লে-ব সকল 'সীন্' বাজা নিজ হাতে ফেলিবে, তবে নাটক হইবে!

তিথিটা পূর্ণিমাব দিকে ছিল, খালেব উপর মস্ত একটা চাঁদ উঠিযাছে। রুপার মত চক্‌চকে জোৎস্না বাজাব বড ভাল লাগে। গান সে জানে না, এই দুঃখ, নইলে অনায়াসে সে গান উঠাইতে পাবিত, এমনি তার মনেব অবস্থা। কিন্তু শীঘ্রই গানেব সুর তাহাব শ্রুতিগোচব হইল। বাজা কৌতূহলী হইয়া এদিক ওদিক তাকাইয়া গতি স্তিমিত কবিল, কিন্তু জনমনুষ্য দেখিতে পাইল না। পরীব গান নাকি বে—হি হি—লোক দেখতে পাচ্ছি না যে—বাজা মনে মনে কহিল। তাব কৌতূহল অসম্ভব বাড়িয়া গেল।

খালেব পাড় অমনি সন্ধ্যা হইতে না হইতে জনবিরল হইয়া ওঠে;

তার উপর সড়ক এখানটায় মোড় ফিরিয়াই জমিদারবাড়ির ফটকে প্রবেশ করিয়াছে। জমিদার-বাড়িতে প্রয়োজন না থাকিলে এ-সময় বড একটা কেউ এদিকে আসে না। মোড়েব কাছে কোনও রহস্যময় স্থান হইতে এই সঙ্গীতেব উৎপত্তি, এ বিষয়ে বাজা ক্রমেই নিঃসন্দেহ হইল,—শুধু মানুষে গাহিতেছে, না, আকাশেব কোনও পবী বা অপ্সরা গাহিতেছে, এ সম্বন্ধে সে নিঃসন্দেহ হইল না। উৎসুক চোখে পা টিপিয়া টিপিয়া সে অগ্রসর হইতে লাগিল।

যেখানে বুড়া তালগাছটা ক্ষুদ্র তালগাছগুলিকে কনুই দিযা পিছনে ঠেলিয়া খালেব উপর একেবারে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে, সেখানে সহসা বাজাব দৃষ্টি পড়িল। দেখিল, এক ছায়ামূর্তি বুড়া তালগাছেব গুঁড়িতে হেলান দিয়া দিব্য আনন্দে গান উঠাইয়াছে—এবং গানটা এমনি করুণ এবং সানুনাসিক যে, রাজা উল্টা দিকে ফিবিয়া এক ছুট্ লাগাইবে কিনা ভাবিতে লাগিল। কিন্তু অবশেষে সাহসে ভব কবিয়া সে আগাইয়া গেল এবং অকস্মাৎ কণ্ঠস্বব চিনিতে পাবিয়া ফিক্ কবিযা হাসিয়া ফেলিল। কিন্তু বেশিক্ষণ নয়, সহসা একটা মতলব তাব মনে খেলিয়া গেল। হাসি বন্ধ করিয়া পা টিপিযা টিপিয়া সে বুড়া তালগাছেব দিকে অগ্রসর হইল। মনে মনে বলিতে লাগিল—কি পাগ্‌লা বে, বোষ্টুমিটা, একবার কাণ্ড দেখ, কোথায় এসে গান ধবেচে—যেন এই বাত্তিরে এই গাছতলায় এসে লোকে ওকে চাল দিয়ে যাবে—হি হি হি—

যমুনা বৈষ্ণবী তালগাছের গোড়ায় হেলান দিয়া, খালেব জলে পা বাড়াইয়া দিয়া তন্ময় হইযা গান গাহিতেছিল, চোরেব মত চুপিচুপি রাজা পিছনে আসিয়া দাঁড়াইল। ‘এম্‌নি গানে মনোযোগ, কিছুই টের পায় নি —একটু ঠেলে দিলেই ঝুপ্ করে জলে পড়ে যাবে!’—রাজা ভাবিতে লাগিল। কানেতে ভূতের ফুঁ এবং ঘাডেতে ভূতের আঙুলের আঁচড দিয়া যমুনাকে চম্‌কাইয়া দিয়া অপাব কৌতুকে সেই দৃশ্যটা উপভোগ

করিবে কি ?—রাজা ভাবিতে লাগিল। কিন্তু সহসা বৈষ্ণবীর সঙ্গীতে মন আকৃষ্ট হইল। বিস্মিত হইয়া পিছনে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া সে গান শুনিতে লাগিল।

বৈষ্ণবী বারম্বার গানের ধূয়াতে ফিরিয়া আসিতেছে :—

'মনের মধ্যে অচিন্ পাখি কেম্নে আসে যায়
ধরতে পারলে মনোবেড়ি দিতাম পাখির পায় ॥'

খুব বেশিক্ষণ রাজার ধৈর্য্য রহিল না। সহসা রাজা হি হি করিয়া হাসিয়া উঠিয়া কহিল, 'পাখি কই ?—হি হি হি—পাখির পায়—বেশ তো গানটা, পাখির পায় !'

যমুনা চকিতে গান বন্ধ করিল। পিছনে ফিরিয়া সবিস্ময়ে কহিল, 'রাজা! তুমি! কখন এলে ? কি করে তুমি এলে ?—আমার স্বপ্নের মধ্যে থেকে এলে নাকি ?'

রাজা কহিল—'তুমিই বা এখানে এলে কেন এখন ? রাত্তিরে বুঝি কেউ চাল দেয়।' বলিয়া সে যমুনার পাশেই বসিয়া পড়িল।

'চাল চাইতে তো আসিনি, রাজা।'

'তবে কেন এসেছ ?'

'তোমাকে দেখতে পাব, তাই এসেছি।'

'দূর্।'

'বালগোপালকে না দেখে দিন যে আমার কাটে না। তাই তো পথের ধারে বসে আছি, রাত-বিরেতের ভয় করলে কি আমার চলে !'

'ধ্যেৎ, পাগলী, কেবল মিছে কথা !'—রাজা কহিল।

যমুনা একটা দীর্ঘশ্বাস চাপিয়া ফেলিল, অদ্ভুত এক স্নেহ-বুভুক্ষু দৃষ্টিতে রাজার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। ক্রমে তার চোখ স্তিমিত হইয়া উঠিল, এবং যেন চেষ্টা করিয়া সে অতি ক্ষীণ কণ্ঠে কহিল—'মিছে কথা নয়, রাজা, মিছে কথা নয় !—রাজা বাবু—'

'কি ?'

'আখ্ড়াতে আর তো তুমি গেলে না। আমি কত আশা কবে পথ-চেয়ে থেকেচি, ভেবেচি—ছোটবাবু বলে গেছে, আসবে, ঠিক আসবে। কিন্তু কই, তুমি এলে কোথায় ?'

বস্তুত, রাজার আখ্ড়ায় যাইবাব প্রলোভনের কারণ আব বিদ্যমান ছিল না। আজকাল যেখানে সেখানে অজস্র কাঁচা আম পাওয়া যাইতেছে, এমন কি নিজেদের গাছতলা হইতে শত কাঁচা আম মালীরা কুড়াইয়া আনিয়া দেয়, তাহা রাজা এবং রাজাব পিসিমাব পক্ষেও যথেষ্টেব চাইতে বেশি। কিন্তু সত্য কথাটা বলিতে রাজাব কেমন জানি মায়া হইল—মনে হইল, প্রকৃত কথাটা বলিলে বৈষ্ণবী, যেমন কবিয়াই হোক্, আহত হইবে।

'বাঃ বে, পড়াশুনো আছে না বুঝি।'

'ওঃ, তা তো আছেই। আমাবই মনের রাশ নেই কিনা, তাই পাগল হয়ে উঠি। অন্যেব যে মেলাই কাজ, ভুলে যাই।'

'বোষ্টুমি, তোমার ছেলে আছে ?'

'ছেলে।' যমুনা বৈষ্ণবী অসম্ভব বকম চমকাইয়া উঠিল। কম্পিত কণ্ঠে কহিল—'ছেলে! হ্যাঁ, আছে, ছিল—মানে, এখানে নেই, কিন্তু আছে, সত্যই আছে—তোমাকে মিছে বলচি না, বিশ্বেস কব, সত্যই আছে—' এক অদ্ভুত আবেগোচ্ছ্বাসে তাব কণ্ঠস্বব যুগপৎ সজল এবং অস্পষ্ট হইয়া উঠিল। 'সব ছিল রাজা, সব ছিল। কি আমাব ছিল না ? আমাব স্বামী ছিল, আমার ছেলে ছিল—'

'তবে ?' রাজা বৈষ্ণবীব এই উচ্ছ্বাসে কিছুটা ভড়্কাইয়া গিয়া কহিল। 'তাদের কি হলো ?'

যমুনার সহসা আর্তনাদ কবিয়া কাঁদিতে ইচ্ছা হইল। অতি কষ্টে নিজেকে সে দমন করিল। অশ্রু-বিকৃত গলায় কহিল—'তুমি বুঝবে না, রাজা। তুমি তা বুঝবে না—'

বাজা বোদ্ধার মত কহিল, 'সে ছেলে মবে গেছে, না ?'

ভীতস্ববে যমুনা চেঁচাইয়া উঠিল—'ষাট্, ষাট্, সে মরবে কেন। যমেব দুয়াবে কাঁটা দিয়ে চিরকাল সে বেঁচে থাক্। আব ছায়ার মত শুধু তাব কচি মুখটা মনে পড়ে। এতদিনে তোমাবই মত ডাগর হয়েচে, ভাবচি, তোমাবই মত এমনি ডাগর দুটো চোখ হযেচে কিনা ? এম্‌নি কি তাব বুদ্ধি হযেছে ? এম্‌নি সুন্দব হযেচে আমাব খোকা ?—একটা কাজ কববে, বাজাবাবু ?'

'কিঃ ?' বাজা শুধাইল।

যমুনা বৈষ্ণবী কিছুক্ষণ কোনও সাড়াই দিল না, যেন এক বিগত-যুগেব বিস্মৃতপ্রায় স্মৃতি চোখেব সমুখে টানিয়া আনিযা আতুর লোলুপতাব সঙ্গে নিবীক্ষণ কবিতেছে। সহসা বাজাব দিকে চাহিয়া সে অতি মিষ্টকণ্ঠে ডাকিল—'গোপাল।'

'ফেব্!'

'গোপাল, তোমাব মাথাটা আমাব বুকেব ওপব একটু বাখবে ? শুধু একটু, শুধু একবাব, একটু ক্ষণেব জন্য। মায়েব বুকটা যে জ্বলে যাচ্ছে, একটু একটু কবে পুড়ে যাচ্চে—শুধু একবার গোপাল, শুধু একটি মুহূর্ত্ত—' যমুনা তাব দুইটি ব্যাকুল বাহু বাজাব দিকে প্রসাবিত কবিয়া দিল। দুই চোখ দিয়া ঝর্‌ঝর্‌ কবিয়া অশ্রু পড়িতে লাগিল—যমুনা বৈষ্ণবী এক মুহূর্ত্তে সম্পূর্ণ বদ্‌লাইয়া গেল।

'ধ্যেৎ!' বলিয়া বাজা উঠিয়া পড়িল। কহিল—'ধ্যেৎ, তুমি একদম পাগ্‌লী, বোষ্টুমি—'

চক্ষেব পলকে বাজা ছুটিয়া পালাইল।

যমুনা সবেমাত্র আখড়াব অর্দ্ধেক পথ অতিক্রম করিযাছে। এমন সময় পিছন হইতে একটা ডাক শুনিয়া সে পিছনে ফিরিয়া দাঁড়াইল।

দেখিল, ম্লানজ্যোৎস্নায় ঈষৎ অন্ধকার পথ দিয়া কে একজন ছুটিতে ছুটিতে আসিতেছে।

'বোষ্টুমি, শুনচো, দাঁড়াও,—একটা কথা আছে।'

রাজার গলা চিনিতে যমুনার মুহূর্ত্তও বিলম্ব হইল না। পরমুহূর্ত্তে রাজা নিজেই হাঁপাইতে হাঁপাইতে আসিয়া উপস্থিত হইল। কহিল—'তুমি এমন পাগ্‌লার মত করতে পার! ধ্যেৎ, অমন করে!—এই নাও, হলো তো—' বলিয়া হতবাক্ যমুনার বুকের উপর রাজা গভীর স্নেহভরে মাথাটা রাখিয়া মৃদুস্বরে ডাকিল—'ছোট মা!'

'ছোট মা! গোপাল!' বলিয়া যমুনা বৈষ্ণবী তার পুত্রস্নেহ-বুভুক্ষু বুকের মধ্যে রাজার মাথাটা সবলে আঁকড়াইয়া ধরিয়া সংজ্ঞা হারাইয়া ফেলিল। যখন জ্ঞান হইল, দেখিল, পথের একপ্রান্তে সে বসিয়া আছে—রাজা কখন চলিয়া গিয়াছে টেরই পায় নাই।

পাণ্ডুরজ্যোৎস্নাস্তিমিত অন্ধকারে যমুনা বৈষ্ণবী পাগলের মত নৃত্য করিতে করিতে চলিল—'ছোট মা!—ছোট মা। আমি মা।'

## দশ

হৈমন্তী দুদিন হয় কোটালনগরে আসিয়াছে। স্বামী অর্দ্ধেন্দু কদিন থাকিয়াই এলাহাবাদে ফিরিয়া যাইবে, হৈমন্তী হাইকোর্টের দীর্ঘাবকাশের শেষ পর্য্যন্ত এখানে থাকিবে, এমনি কথা আছে। ইহাদের আগমনে দুর্গাপ্রসন্নের বাড়িতে যেন উৎসব পড়িয়া গেল। গয়লা আসিয়া দই ও ক্ষীর দিয়া যায়, জেলে মাছ পৌঁছাইয়া দেয়, ময়রা খাবার লইয়া আসে। রাঁধুনী এবং দাসী-মহলে উত্তেজনার আর অন্ত নাই; সমস্ত বাড়ি গম্‌গম্ করিয়া উঠিয়াছে।

কোটালনগরের ইতরসাধারণ আর রাজার দেখাই পায় না। জহর

আর মিলিকে লইয়া সে অতিশয় ব্যস্ত আছে; এমন কি থিয়েটারের রিহার্সাল শুনিতে যাইবার পর্য্যন্ত সে ফুরসৎটুকু পায় না। তবে ইতি-মধ্যেই জহরকে সে সগর্ব্বে জানাইয়াছে যে, মিলনীতে থিয়েটার হইবার সময় সীন্ সে-ই ফেলিবে! নিজের এয়ার-গান্‌টাও সে জহরকে দিয়া দিয়াছে এবং সাবধান করিয়া দিয়াছে, পাখির দিকে যেন গুলি না ছোঁড়ে —অনেক সময় হঠাৎ ওদের গায়ে ছর্‌রা লাগিয়াও যায়! মিলি এখন আর 'মাম্ মা' বলে না—ব্যাপারটাকে সংক্ষিপ্ত করিয়া সে মামা বলিতে শিখিয়াছে, কিন্তু রাজার খুসি তা'তে একটুও কম নয়। নিজের সমস্ত পুরাতন খেল্‌না মিলিকে সে উজাড় করিয়া দিল, এবং শুধু তাহাই নয়, গঙ্গারাম কুমোরের কাছে চুপে চুপে ফরমাস দিয়া রাঁধিবার যাবতীয় বাসন-কোসন আনিয়া দিল এবং মিলির হাতের ঘাস-পাতার অপূর্ব্ব রান্না খাইয়া বিশেষ তৃপ্তি প্রকাশ করিল। কহিল, 'দই রাঁধতে জানিস নে বুঝি? শিখিয়ে দেবো অখন, তেলাকুঁচের পাতা দিয়ে কেমন সুন্দর দই হয়। একটু সবুজ দই হয় এই যা—হি হি—'

দুইটি শিশুও বালক-মামার অদ্ভুত ভক্ত হইয়া উঠিয়াছে। সারাদিন ওরা রাজারই সঙ্গে আছে, রামধনি বেয়ারা খবরদারি করিতে আসিলে রীতিমত আপত্তি জানায়। রাজার ভারি ইচ্ছা করে, ডিঙিতে করিয়া ওদের একদিন খালের মধ্যে বেড়াইয়া আনে, কিন্তু দিদি বারবার সাবধান করিয়া দিয়াছে—'খবরদার, রাজা, ওদের জলের ধারে কক্ষনো নিবি নে—খালের আশেপাশেও নয়!' তাই রাজা সে চেষ্টা করে নাই, শুধু মনে মনে ভাবিয়াছে—দিদিটা ভারি ভীতু! কেউ যদি জলে পড়েই যায়, তবে বুঝি আমি আর তুলতে পারবনা! কত ছোটবেলায়ই পেরেছিলাম। যেন আমি কম সাঁতার জানি—

এদিকে হৈমন্তী পিতার সেবায় গভীর ভাবে আত্মনিয়োগ করিল। খাওয়া-শোওয়ার এমনি বাঁধাবাঁধি করিয়া দিল, ছুটাছুটি এমনি বন্ধ করিল

যে, দুর্গাপ্রসন্ন প্রথমটায় অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিলেন। তবু বহুদিন পরে আপন জনের সেবার স্পর্শ পাইয়া অকস্মাৎ আজকাল স্ত্রীর কথাটা কেবলই তাঁর মনে পড়িতে লাগিল। হৈমন্তীকে কহিলেন, 'এত করিস নে, মা,—এত করিস নে। এ আমার সইবে না।'

'সাত সমুদ্র তেরো নদীর পারে থাকি বাবা, একটু তোমার সেবা করব, তার অবসর পাই কোথায়? কিন্তু সারাক্ষণ ভেবে মরি—দেখবার কেই বা আছে।' বলিয়া হৈমন্তী ডালিমের রস ছাঁকিতে লাগিল।

'দেখ্‌বার লোক হবে বৈ কি, মা, হবে। কেমন মজবুত করে আমি ঘর বানাচ্ছি, দেখচিস তো? এই ঘরে রাজার বৌ এসে দেখিস আমার কত আদর করে—বুড়োকে নিয়ে কত খেলাই সে খেলে, দেখিস।'

'রাজার বৌ!' বিস্মিত হইয়া হৈমন্তী কহিল। 'সে কি দু'পাঁচ দিনের কথা?'

'দেখিস্, ওর আমি শীগগিরই বিয়ে দেব—এণ্ট্রান্স পাশ হলেই। রাজা যাবে কলেজে পড়তে, আর এই কোটালনগরে থাকবো আমি আর বৌমা, বৌমা আর আমি। দেখিস্, কেমন মজা হয়—কেমন লক্ষ্মীর মত একটি বউ আমি আনি, দেখিস্।'

'আর ছেলেমেয়েগুটোও এমন হয়েচে,' হৈমন্তী কহিতে লাগিল, 'সারাক্ষণ কেবল—দাদু, দাদু। বিশেষ করে জহর, যেন বাপ আমার নয়, ওর। শাশুড়ি বলেছিলেন ওদের রেখে আসতে। আমি কি রাজি হই। বল্লুম, ওরা গেলে বাবার মন অনেকটা হাল্কা হবে—বলে' আমি নিয়ে এলুম।—'

'বেশ করেচিস্ মা, খুব ভাল করেচিস্।'

'কিন্তু এখানে এসে অবধি তোমার কাছেও ঘেঁষতে দেখিনে—লজ্জা পায় বোধহয়, কতদিন দেখেনি।'

দুর্গাপ্রসন্ন সস্নেহ মৃদু হাসিলেন। কহিলেন—'আমার সঙ্গে

খুবই ভাব হয়েচে—তার সঙ্গেই সারাক্ষণ ঘুরে বেড়ায়। ছোট ছেলেমেয়ে, যাতে ওরা খুসি হয়, তাই করুক—তাতেই আমি খুসি হবো।'

বাজা কহিল—'জানিস্‌, তারপর সেই ভূতটা না, এগিয়ে আসতে লাগল। আমি দাঁড়িয়ে উঠে বল্লাম—আয় দেখি তোব সাহস কত—দূব, ভয় পাচ্চিস কেন বে, মিলি, আয় আমাব পাশে এসে বোস্‌—আয় দেখি তোব সাহস কত? ভযে ভূতটা তো আব কাছে এগোয় না। এমন আমাব ভূতটাকে ধবতে ইচ্ছে হল, কি আব বলব।—খাঁচাতে ভবে বাখলে কত লোক এসে দেখতে পাববে। কিন্তু ভূতটা পিছনে না ফিবে এক ছুট্‌—ছুট্‌তে ছুট্‌তে—হি হি হি—'

সন্ধ্যাব সময় নিজেব বসিবাব ঘবে নির্জ্জনে ইজিচেয়াবে হেলান দিয়া দুর্গাপ্রসন্ন তামাক টানিতেছিলেন। গড়গড়াব ধূমেব মধ্য হইতে কোটালনগবেব ভবিষ্যতেব বহু স্বপ্ন তাঁব দুই চোখে ভাসিযা ওঠে, তাব কিছুটা তিনি বাস্তবে রূপ দেন, কিছুটা ভবিষ্যতে বাজা কবিবে বলিয়া বাখিয়া দেন। মনে মনে সংকল্প আছে, কোটালনগব সম্বন্ধে তাঁর সমস্ত অসমাপ্ত কল্পনা তিনি পবিপূর্ণভাবে লিপিবদ্ধ কবিয়া যাইবেন, যাহাতে বাজা ভবিষ্যতে সহজেই তাঁব আশাগুলিকে রূপ দিতে পাবে।

এমন সময় জামাতা অর্দ্ধেন্দুশেখব আসিযা প্রবেশ করিলেন। তাহাকে দেখিতে পাইয়া মুখ হইতে নল সবাইয়া দুর্গাপ্রসন্ন কহিলেন, 'এস বাবা, বস।—এই চেয়াবটায বস।'

অর্দ্ধেন্দু বসিয়া পড়িয়া সামান্য ইতস্তত কবিয়া কহিলেন—'রাজাব সম্বন্ধে আমি একটু আলোচনা কবতে চাই। ও আমাদের সকলেবই প্রিয, তাই ওব বিষয়ে—আপনাব কোনও অসুবিধে হবে না তো এখন?'

'না, না!, কিছু নয়। তুমি কি বলবে, বল—রাজার বিষয়ে বলবে ?'

'আজ্ঞে, হ্যাঁ।—আমার মনে হচ্ছে, গ্রামে ওর উপযুক্ত রকম শিক্ষা, মানে ট্রেনিং, হচ্চে না—অর্থাৎ সেই রকমই আমার সন্দেহ হচ্চে—'

দুর্গাপ্রসন্ন নল টানিতে টানিতে নিঃশব্দে শুনিতে লাগিলেন, এবং অর্দ্ধেন্দুশেখর বিষয়টা ব্যাখ্যা করিয়া চলিলেন—'আমি কদিন ধরেই লক্ষ্য করচি, পড়াশুনোয় ওর মন নেই—বরঞ্চ সারা দিন চারদিকে খেলে বেড়ায়। তাছাড়া যাদের সঙ্গে ও মেশে, তাদের মধ্যে ভদ্রলোকের সংখ্যা কম। যত রাজ্যের জেলে, তাঁতি, বোষ্টম,, এদের সঙ্গেই ওর মাখামাখি। প্রথমত, মনঃশিক্ষার দিক থেকে এই সব অন্ত্যজের সঙ্গ ওর পক্ষে অত্যন্ত অনিষ্টকর, দ্বিতীয়ত, আপনার সম্মান, মানে, প্রেস্টিজের দিক থেকেও এটা—কি বলে—একটু দৃষ্টিকটু—'

দুর্গাপ্রসন্ন অনেকক্ষণ কোনও জবাব দিলেন না, নিঃশব্দে ভাবিতে লাগিলেন। তারপর কহিলেন—'তুমি কি করতে বল ?'

'আমরা বলছিলাম—আমাদের সঙ্গে ও না হয় এলাহাবাদে চলুক, ভাল স্কুলে ভর্ত্তি করে দেওয়া যাবে, এবং সেখানে সামাজিক আদবকায়দায় অভ্যস্ত হওয়া ওর পক্ষে অনেক সহজ হবে। অবশ্য আপনার কথাটাও ভাবা দরকার—কিন্তু ওর ভবিষ্যতটাই সকলের অধিক কাম্য—'

'না, বাবা, তা হয় না।' দুর্গাপ্রসন্ন সহসা স্থিরচিত্তে এবং নিষ্পত্তির স্বরে কহিলেন। 'হয় না, এইজন্য নয় যে, আমার স্বার্থপর স্নেহের জন্য ওর ভবিষ্যতটা আমি নষ্ট করতে চাই, কারণ এই যে, আমি মনে করি, শিশু প্রকৃতির কাছ থেকে যে-শিক্ষা পায়, সে শিক্ষার তুলনা নেই—তেমন শিক্ষা আর কেউ দিতে পারে না। জীবনের প্রথম দিক্‌টায় প্রকৃতির নিজের পাঠশালায় শিক্ষা পেলে মানুষের মন, বুদ্ধি, শক্তি অধিকতর বিকাশ পায় বলে আমার বিশ্বাস।'

'ওঃ, তবে আর কোনও কথাই ওঠে না।' অৰ্দ্ধেন্দু বিনীতস্বরে কহিলেন। 'আর একটা কথা আমি জিজ্ঞে করতে একটু ইতস্তত করচি—তবে রাজারই ভবিষ্যতের কথা ভেবে—'

'বল।'

'আপনার কি উইল করা হয়ে গেচে?'

'আমার তো অনেক ওয়ারিশ নেই, উইলের কি দরকার?'

'তবু, মানে, স্পষ্ট একটা বিবৃতি থাকা সব সময়েই বাঞ্ছনীয়। তাতে ভবিষ্যতে যেমন কোনও ফ্যাকড়া বাঁধবার অবকাশ থাকে না, তেম্‌নি উইলকারকের প্রতিটি খুঁটিনাটি ইচ্ছা ওয়ারিশকে জানিয়ে দেওয়া যায়, আর বিশেষ করে আমি এই কথাটাই ভাবচি—রাজা এখনও নিতান্ত নাবালক, সাবালক হতে ওর অনেক দেরি—এ অবস্থায় খুব বিবেচনার সঙ্গে একজিকিউটার নিযুক্ত করে যাওয়া উচিত—যাকে-তাকে নিযুক্ত করা বিপজ্জনক বলে মনে করি। অবশ্য সেটা আপনিই ভাল বুঝবেন—তবু কর্ত্তব্যের খাতিরে—'

'এ-বিষয়ে আমি ভেবে দেখবো, বাবা।'

সে-রাত্রে শুইতে আসিয়া অৰ্দ্ধেন্দু স্ত্রীকে কহিলেন, 'সে কথাটা কালকেই উঠিও, বুঝলে?'

আয়নার সমুখে দাঁড়াইয়া হৈমন্তী চুল আঁচ্‌ড়াইতেছিল, কহিল—'আমার ভারি লজ্জা করে।'

অৰ্দ্ধেন্দু ঈষৎ বিরক্তির স্বরে কহিলেন, 'লজ্জা করে! এতে লজ্জার কি আছে শুনি? চিরকাল তুমি এমনি বোকা। বিচার-বিবেচনা বলে একটা জিনিষ—'

'বেশ, বেশ, বলবো'খন।' বলিয়া হৈমন্তী নিজের চুলের মধ্যে নির্দ্দয়ভাবে চিরুণী চালাইতে লাগিল।

নিশ্চিন্ত হইয়া অর্দ্ধেন্দু কহিলেন, 'এ আর কার জন্য, তোমার ছেলে-পুলের জন্যেই তো—শুনচো, চুরুটের বাক্সটা এগিয়ে দাও তো ?—'

দুর্গাপ্রসন্নের ডান পায়ের গোড়ালিতে সামান্য ব্যথা হইয়াছিল। ভোরবেলা হৈমন্তী তাহাতে কবিরাজি তেল মালিশ করিয়া দিতেছিল। দুর্গাপ্রসন্ন প্রথমে আপত্তি করিয়াছিলেন,—মালিশ করিয়া দিবার লোকের অভাব কি, কিন্তু হৈমন্তী কিছুতেই শুনিল না, ঘরের মেঝেতে বসিয়া চেয়ারে উপবিষ্ট দুর্গাপ্রসন্নের পায়ে সস্নেহে ওষুধ ঘষিয়া দিতে লাগিল। সুখ-দুঃখের অনেক কথাই হইল।

'হয়েচে, মা, হয়েচে, যথেষ্ট হয়েচে।' অবশেষে দুর্গাপ্রসন্ন কহিলেন। 'আর দরকার নেই।'

'কেবল তোমার ফাঁকি দেওয়া, বাবা—ভাবচ, হৈমর বুঝি খুব কষ্ট হচ্চে। কিছু নয়, ওখানে শ্বশুর-শাশুড়ির আমি কত সেবা করি, এতে আমার একটুও—এই শুনচিস্, জহর, যাচ্চিস কোথায়, শুনে যা—'

জহর বারান্দা দিয়া ছুটিয়া যাইতেছিল, মায়ের ডাক শুনিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে উপস্থিত হইয়া কহিল—'কি, ডাকচ কেন ? আমার একটুও সময় নেই, মামা টিয়ে পাখি ধরতে গাছে উঠেছে—আমি চল্লুম—'

'দাদুর কাছে কখনও আসতে নেই, না রে দুষ্টু ছেলে ? এলাহাবাদে সারাক্ষণ তো শুধু দাদু দাদু করতিস!—আর দাদুর সঙ্গে ভাব করলেই লাভের আশা আছে, হাবা ছেলে। দেখ্, দাদুকে ভুলিয়ে টুলিয়ে জাদু করে' এক টুক্‌রো জমিদারি আদায় করতে পারিস কিনা। সোনারূপো যতই থাকুক, জমিদারি না থাকলে সে মান হয় না,—জমিদার হওয়ার সম্মানই আলাদা—'

'আমি গেলাম,' জহর যাইবার উদ্যোগ করিয়া কহিল।

'ফের্ দুষ্টুমি? দাদুর কোলে এসে বোস্। রোজ ভোরে উঠে দাদুকে পেন্নাম করতে বলেছিলাম সেই এলাহাবাদে থাকতে—করিস্?'

ধর, মামা যদি একটিমাত্র টিয়া ধরিতে পারিয়া থাকে, তবে নিশ্চয়ই সেটা মিলিই দখল করিবে, কেননা সে কাছে আছে, কিন্তু অনায়াসেই এতক্ষণে সে যাইয়া উপস্থিত হইতে পারিত, এবং কাড়া-কাড়িতে মিলি তার সঙ্গে কিছুতেই পারিয়া উঠিত না। অথচ এইরূপ অন্যায়ভাবে অকিঞ্চিৎকর কারণে তাকে আট্‌কাইয়া রাখা মিলির উপর মায়ের পক্ষপাতের দৃষ্টান্ত ছাড়া আর কি?

জহরের অবস্থা দেখিয়া দুর্গাপ্রসন্ন কৌতুক বোধ করিলেন। কহিলেন—'দে, ওকে যেতে দে হৈম, কেমন ছট্‌ফট্ করচে, দেখ্।'

হৈমর আর মুখ ফুটিয়া বলিতে হইল না, দাদুর নির্দ্দেশ শোনা মাত্র জহর পলকে অদৃশ্য হইয়া গেল।

হৈম কহিতে লাগিল—'শাশুড়ি রোজই শোনায়, দাদু কিছু দিয়ে যাবে না। শুনে আমার যা রাগ হয়! জহরের দাদুকে যদি চিন্‌তো, তবে এমন কথা বলতে পারত না। বলে, এতো বড় সম্পত্তি, ছেলেতে মেয়েতে সমানভাগে ভাগ করে দিলে তবে না ন্যায়ের কাজ হতো, দুর্গাপ্রসন্ন চৌধুরির উপযুক্ত কাজ হতো—তা মেয়েকে তো কিছুই দিলেন না—'

'কেন মা, তোর বিয়েতে আমি তো লাখ টাকার ওপর ব্যয় করেচি।' দুর্গাপ্রসন্ন অন্যমনস্ক হইয়া কহিলেন। 'পঞ্চাশ হাজার টাকা আমি তো নগদই দিয়েচি, তবে এমন কথা ওরা বলবেন কেন?—'

'কিন্তু এ-কথাও ঠিক, বাবা,' হৈমন্তী তাড়াতাড়ি কহিল, 'এমন তফাৎই বা তোমরা করবে কেন? মেয়ে তো নিজেরই সন্তান, তবে এই বৈষম্য কেন? তোমার এতো আছে, অথচ সামান্য এই ক'টি টাকা দিয়েই আমাকে বিদেয় করে দেবে?—এলাহাবাদে আমাদের মহিলা-

সমিতিতে এই অন্যাযেব বিরুদ্ধে আমরা কত প্রস্তাব পাস্ কবেচি।—কিন্তু এ-ও আমি তোমার কাছে আব্দার ধরলুম, জহবকে একটা সম্পত্তি তোমার লিখে দিতেই হবে, কোনও ওজবই আমি শুনব না। জমিদাবেব মেয়ে আমি, জমিদাবেব মাও হ'তে চাই—'

দুর্গাপ্রসন্ন একেবাবে বিব্রত হইয়া পডিলেন। কহিলেন, 'আমি ভেবে দেখব, মা, ভেবে দেখব। বেশ, আমি ভেবে দেখি—'

সত্যই তিনি ভাবিলেন। হৈমেব কথাব মধ্যে নিশ্চযই খানিকটা সত্য আছে। মেয়ে বলিয়াই না তিনি সম্পত্তিব অতি সামান্য অংশ দিয়া তাকে বিদায কবিতে চান,—কিন্তু মেয়ে তো নিজেবই সন্তান! কোন্ প্রাকৃতিক বিধান অনুসাবে তিনি এই বৈষম্যেব সাফাই দিবেন? অথচ ইহাও সত্য, যে-বহস্যময় কাবণেব জন্যই হোক্, বাজাব জন্য সমস্ত কিছু জমাইয়া বাখিতে ইচ্ছা করে, একটুও ভাগাভাগি কবিতে ইচ্ছা কবে না। এই বিপুল সম্পত্তিব প্রতিটি অংশ বাজা একক ভোগ করুক, সমস্ত অন্তব যেন ইহাই চায়। সমস্ত জমাইয়া তিনি একটিমাত্র গৃহ তৈবি করিতে চান,—সে গৃহের শুধু একটিমাত্র মালিক থাকিবে।

কিন্তু হৈমের কথাগুলি যেন তাঁব দুর্ব্বলতা এবং পক্ষপাতিত্বকে নিজেব কাছেই সুস্পষ্ট করিয়া তুলিল। তাঁব বিবেকেব এক অখ্যাত কোণ হইতে একটা অস্বস্তিকর প্রশ্ন আসিতে লাগিল—তাইতো, তাইতো! কিন্তু মনটা পরমুহূর্ত্তেই কঠিন হইয়া বলিতে লাগিল—'না, তা নয়—তা নয়। আমার সমস্ত স্থাবব এবং অস্থাবব সম্পত্তি সঞ্চিত করিযা আমি বাজার জন্য গৃহ প্রস্তুত কবিযাছি, এতে হাত দিবাব কাহাবও অধিকাব নাই।—কিন্তু হৈমব কথাগুলিও ভাবিয়া দেখিবার মত। কোন্ ন্যায়ে আমি তাহাকে উপেক্ষা করিতে পাবি? আইনের উপরও তো একটা জিনিষ আছে—নাঃ, জহরকে অন্তত কিছু একটা আমাকে দিতেই হইবে—'

গভীব বাত্র। সামান্য কিছু আগে কাঁছাবিবাড়িব ঘণ্টাতে বাবটা বাজিয়াছে। এবং সেই ঘণ্টা শুনিবাব পব হইতেই বাজা বিছানায় ছটফট্ কবিয়া মবিতেছে। কথা আছে, এই সময় মাণিক বাজার ঘবেব নিচে আসিয়া শিষ দিবে, কিন্তু মাণিকেব আসিবাব কোনও লক্ষণই দেখা যাইতেছে না। অতি সতক হইয়া সে কান পাতিয়া বহিল, দমকা বাতাসেব প্রতিটি হিস্ হিস্ শুনিতে পাইল, কিন্তু মাণিকেব শিষের দেখা নাই।

অধৈর্য্য হইয়া অবশেষে পা টিপিয়া টিপিয়া বাজা দোতলাব বাবান্দায় গিযা দাঁড়াইল, এবং সমুখে চাহিয়াই দেখিল সুদূব খালেব পাড়ে একটা ডিঙি ভিড়িয়াছে। ডিঙিতে অস্পষ্ট ছায়াব মত একাধিক লোক দাঁড়াইয়া আছে, এবং সেই ছায়াব মধ্যে একটি পাড়ে নামিয়া ক্রমেই এদিকে আগাইয়া আসিতে লাগিল। বাজাকে আব বলিতে হইল না,—যথাসম্ভব পা টিপিযা টিপিয়া সে সিঁড়ি দিয়া একতলায় নামিয়া আসিল। এমন দেরি কবতে পাবে মাণিকটা। একেবাবে বাগ ধবে যায়। কিন্তু পদ্মায় মাছ ধবতে যাওযা ভাবি মজা—হি হি—

নিঃশব্দে জেলেডিঙি ছাড়িযা দিল। মাণিক কহিল—'বড়কর্ত্তায় কইচে তো—দেইখো ?'

রাজা গলুইয়ের উপরে চড়িয়া বসিয়া কহিল—'হ্যাঁ, হ্যাঁ, হয়েচে —এখন চল্।'

মাণিকেব বাবামশায় ও খুড়ামশায় আজ গাঙে যাইবে না। বাড়িতে কুটুম আসিয়াছে, তাহাদেব আপ্যায়নের জন্য আজ তাহারা কাজে কামাই দিবাব সিদ্ধান্ত করিয়াছে। তবে শুধু মাণিক নয়, ও-বাড়ির আবও দুইজন জেলে সঙ্গে আছে। তাদের সঙ্গে রাজার ভাব নাই, কিন্তু মাণিক জানা থাকিলেই তার চলে; কেউ জানা না থাকিলেও এমন

কিছু আসিয়া যায় না। জেলেডিঙি চড়িয়া পদ্মায় মাছ ধরিতে যাইতে পারিলেই হইল। অবশ্য বাবামশায় এবং খুড়ামশায় উপস্থিত থাকিবে না বলিয়াই মাণিক রাজাকে লইতে সম্মত হইয়াছিল। আজ সে-ই দলের সর্দ্দার। তার গানের বাড়াবাড়িতেই সেটা টের পাওয়া গেল :—

'যদি পদ্মা পাড়ি দিবি তবে ঢাকা দেখতে পাবি
মখসুদাবাদ করবি অন্বেষণ।

শুনচ, হরিমণ্ডল, একটু জোরে বাও—ঐরে বৃন্দাবন, ঘুমাস্ নাকি—শ্যাযের লাইন দুইটা একটু শুইনো ছোটকর্ত্তা—

আছে কলিতে কলিকাতা, তিন সহরে আঁটা
সাঁতার দে যায় রসিক যে-জন॥'

স্তব্ধ ঘুমন্ত খালের মধ্য দিয়া, বিচিত্র ঝোপঝাড়ের তলে তলে বিচিত্র প্রাণস্পন্দ তুলিয়া জেলেডিঙি পদ্মার দিকে অগ্রসর হইয়া চলিল। এমন অপূর্ব্ব লাগিতে লাগিল এই নিদ্রিত পৃথিবী, এই রহস্যময় জলপথ, এই অত্যদ্ভুত সঙ্গীরা এবং পদ্মায় যাইয়া মাছ-ধরা দেখিবার স্বপ্ন যে, রাজা কোনও বাক্যালাপই করিল না—বিমুগ্ধ বিস্ময়ে সমুখ দিকে শুধু চাহিয়াই রহিল।

ওদিকে তামাক টানিতে টানিতে তখন হরি মণ্ডল বৃন্দাবনকে কহিতেছে,—'আইজ যদি শালারা ডিঙ্গির সমুখ কাইটা যায়, তবে আইজ কিন্তু একটা দাঙ্গা হইব, কইয়া দিলাম।'

বৃন্দাবন কহিল—'আরে দাঙ্গা করুম ক্যান্, মণ্ডলের পো, আমরাই অগো সমুখ দিয়া ক্ষ্যাপ্ ফালামু—দেখি জব্দটা হয় কে? নাওয়ের আগ্ কাটতে বুঝি আর আমরা জানি না।—'

'জানুম না আর ক্যান্—জানি সবই। সর্দ্দারেরা ডরে মরে, সাধে কি আর চুপ মাইরা থাকি? নাইলে কও দেখি, কুসুমপুরের বিরাট

জাউলা আমাগো থন্ কোন্ কুলিনটা? না হয় কম্মকারের বাড়িতে মাইয়া বিয়া দিছেই। কম্মকাব এমুন কোন্ কুলিন?'

'দেইখো, আইজ আমরাই কেমুন অগো আগ্ কাটি। জালের মাছগুলি ছিনাইয়া নিলে বুঝুক কেমুন রাগটা হয়—'

মাণিক গানের মধ্যে একটু ছেদ টানিয়া কহিল,—'ফিস্‌ফাস্ কইরা কি কওয়া-কওয়ি লাগাইছ? গাও লাগাইয়া বাও না—আছে কলিতে কলিকাতা তিন সহবে আঁটা—'

ডিঙি পদ্মাব মোহনায় আসিয়া পড়িল। আকাশে সামান্য মেঘ কবিয়াছে,—একটু হাওয়াও আছে। ওরা পাল উঠাইল, এবং দেখিতে দেখিতে পদ্মাব বুকে যাইয়া প্রবেশ কবিল। অসংখ্য জেলেডিঙি ইতস্তত জাল নিক্ষেপ করিয়া চলিয়াছে—দূব হইতে তাহাদেব অস্থির মৃদু আলোগুলিকে আলেয়ার মত মনে হয়। এই ডিঙির ভিড়ের মধ্যে মাণিকের ডিঙিও মিশিয়া গেল।

আকাশেব প্রান্তে মেঘ থাকিয়া থাকিয়া মৃদু মৃদু গর্জ্জন কবিতে লাগিল, দু'একবাব বিদ্যুৎ উঁকি দিয়া শাসাইয়া গেল, এবং পদ্মার অন্তহীন বাবিরাশিব বুকে কতগুলি নির্ভীক মানবসন্তান জালের মধ্যে অদ্ভুত কৌশল এবং ক্ষিপ্রতার সঙ্গে সহস্র সহস্র বৌপ্যবর্ণ ইলিশমাছ বন্দী কবিতে লাগিল। জেলেদেব ছিপ্ নৌকাগুলি যেন মানুষে চালাইতেছে না, মানুষ যেন এই জালগুলি নিক্ষেপ কবিতেছে না, নৌকাগুলি যেন যন্ত্রেব মত সুনির্দ্দিষ্ট পথে আঁকিয়া-বাঁকিয়া চতুর্দ্দিকে ধাবিত হইতেছে এবং জলবাশি নিষ্পেষিত কবিয়া এই জাল-যন্ত্রেবা মৎস্য উৎপন্ন করিয়া নৌকার পাটাতনের তলায় নিক্ষেপ করিতেছে—এমনি এই সকল জেলেদের দক্ষতা। বৃষ্টি নাই, ঝড় নাই, শীতগ্রীষ্ম নাই, এই জল-কৃষকেরা পদ্মাব জল চাষ করিয়া মাটির মানুষের জন্ত

অজস্র খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহ করিয়া আনিতেছে। রাত্রির অন্ধকারে ইহাদের কর্মতৎপরতা সভ্য মানুষের দৃষ্টিগোচর হয় না। ধরণীর এই বীরপুত্রদের কথা এমন কি কবিদের কাব্যেও স্থান পায় না, ইতিহাসে স্থান পাওয়া তো দূরের কথা। কিন্তু এই অ-স্তুত বীরেরা অতি সামান্য এক মুঠা উদরান্নের জন্য অস্থির এবং হিংস্র জলরাশির মধ্যে জগতের শ্রেষ্ঠ সাহসিকতার পরিচয় দেয়,—জীবনকে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া ধরিত্রীর সর্বাপেক্ষা হিংস্র আবেষ্টনের মধ্যে অবহেলায় সংগ্রাম করিয়া ফিরে।

সহসা সেই নিস্তব্ধ অন্ধকারে একটা কর্কশ হুঙ্কার শোনা গেল—'নাওয়ের আগ কাট্‌লি, শালা,—চউখে দেখস্ না? নাওয়ের আগ কাট্‌লি, অ্যাঁ?'

'বেশ করচি, করুম না, একশোবার করুম।' প্রত্যুত্তর আসিল। 'রোজ রোজ যখন আমাগো আগ্ কাইটা যাও, তখন কেমুন? সেই কথাটা মনে নাই—'

'খপরদার কইলাম', নিঃশব্দ জলরাশিতে আবার সেই কর্কশ স্বর প্রতিধ্বনিত হইল—'সাবধান, পরিণাম ভাইবা কথা কইও।'

'ওরে আমার ই রে।' সব্যঙ্গে জবাব আসিল।

'যা, যা দেখি আবার! কেমুন মরদের পো দেখি, কাট্ দেখি আবার নাওয়ের আগ্। আমি কুসুমতলির বিরাট জাউলা, হুঁস্ থাকে য্যান্!—'

'যামুনা, হাজারবার যামু', হরিমণ্ডলের গর্বিত কণ্ঠস্বর শোনা গেল। 'যেমুন ইচ্ছা যামু—কওর বাপের জাগা দিয়া যাই কিনা? লাগা বৃন্দা—আগে লাগা।'

মাণিক শঙ্কিত হইয়া কহিল—'আরে কর কি মণ্ডলের পো—কাইজা বাধাইলা যে—কি মস্কিল—আ হা হা, কর কি—'

'করি, বেশ করি। চুপ মাইরা যামু? বা' বা' বৃন্দা, আগ কাট্—'

চক্ষের পলকে ডিঙিটা অন্য ডিঙির সমুখ দিয়া শাঁ করিয়া বাহির হইয়া গেল, এবং হরি মণ্ডলের দক্ষতা' এক জাল ইলিশ মাছ চক্‌চক্‌ করিয়া উঠিল।

'গেলি!' বিরাট জেলে বিভৎস হুঙ্কার করিয়া উঠিল।

'গ্যালাম।' হরি মণ্ডলও সমান তেজের সঙ্গে জবাব দিল।

'তবে রে শালা, মজাটা বোঝ্‌।' সঙ্গে সঙ্গে বিরাটের ছিপ্‌ এই ডিঙিটার প্রায় গায়ের উপর আসিয়া পড়িল। পলকের মধ্যে চার চার জোয়ানের হাতে চার চারটা শড়্‌কি ঝল্‌সিয়া উঠিল।

'শালার পো শালা', ভীমদর্শন বিরাট জেলে ডাকাতের সর্দ্দারের ভঙ্গিতে গর্জ্জন করিয়া কহিল—'আগ্‌ কাটস্‌—জলের মইধ্যে পুইতা ফালাম্‌ না—'

হরি মণ্ডলও জেলের বাচ্চা, সেও কম যায় না। চক্ষের পলকে সেও পাটাতনের তলা হইতে একটা শড়্‌কি বাহির করিয়া রুখিয়া দাঁড়াইল এবং বৃন্দাবন বৈঠাটা মাথার উপর উদ্যত করিয়া বন্‌ বন্‌ করিয়া ঘুরাইতে শুরু করিয়া দিল।

ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিয়া বিরাট আদেশ দিল,—'লাগা—শালাগো মাথা বরাবইর লাগা—'

'এই, শুনচো? শুনচো? এই—'

যুধ্যমান দুই দলই চমকিয়া চাহিল।

'এই, কে তোমাদের ঝগ্‌ড়া করতে বলেচে? থামো, থামো বলচি—এক মিনিটে শড়্‌কি নামিয়ে নাও,—নামাও। কেউ ঝগ্‌ড়া করতে পারবে না বলচি—ব্যস্‌!'

দুই হাতের দুই কনুই দিয়া পাশের লোক ঠেলিয়া রাজা সমুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। বুকটা সমুখ দিকে ফুলাইয়া দিয়াছে, মাথাটা আধিপত্যের গর্ব্বে উদ্ধত, কণ্ঠে তাহার আদেশের সুর।

'কে আমি, জানো? জমিদার দুর্গাপ্রসন্ন চৌধুরি আমার বাবা। আমার বাবা বাঘ, জানো, বাঘ। তার যদি রাগ হয়, ঘাড়ের ওপর তবে আর কারুর মাথা থাকবে না। সেই আমি বলচি,—খবর্দার, একটুও ঝগ্‌ড়া করতে পারবে না—ব্যস্‌।'

বিরাট জেলে শুধু যে দুর্গাপ্রসন্নের প্রতাপের কথা জানিত, তাহাই নহে, উৎসব উপলক্ষ্যে একাধিকবার জমিদার চৌধুরিদের বাড়িতে মৎস্য সরবরাহ করিয়াছে এবং যাত্রাগান শুনিতে কতবার যে সেখানে গিয়াছে তার ইয়ত্তা নাই। রাজাকে দেখিয়া বিস্ময়ে সে হতবাক্‌ হইয়া গেল। কহিল, 'ছোটবাবু! আরে রে, আপনে আইলেন ক্যাম্‌তে?'

'আমি মাছধরা দেখতে এসেচি। নামাও সব, শড়্‌কি নামাও—দু'দলই নামাও—ব্যস্‌।' রাজা আর ক্ষুদ্র বালক নয়, সে প্রভু, সে হুকুম করিতে জানে। পলকে সমস্ত শড়্‌কি নত হইল।

বিরাট কহিল—'কিন্তু অগো কাণ্ডটা দেখলেন তো, হুজুর? আগ্‌কাইটা এই যে মাছ লইয়া গেল, এইর কোনো বিচার হইব না?'

'কাল বিচার হবে—যাবে আমার বাবার কাছে। কিন্তু খবরদার, নিজেরা ঝগ্‌ড়া করবে না।—যাও, মাছ ধর গিয়ে,—আর শুনচো, দু'দলই আমাকে পাঁচ পাঁচটা করে ইলিশমাছ দেবে, বুঝেচো? আমার দিদি এসেচে কিনা,—কমে হবে না।'

যুদ্ধের মেঘ মন্ত্রবলে উড়িয়া গেল। পাটাতনের তলায় শড়্‌কি-গুলি অদৃশ্য হইল, দুই ডিঙি বিভিন্ন দুইদিকে মৎস্য-শিকারে ছুটিল। শুধু বিরাট দূর হইতে চিৎকার করিয়া শুনাইয়া দিল—'বড় বাঁইচা গেলি রে, বড় বাঁইচা গেলি।' কিন্তু প্রত্যুত্তর না পাওয়ায় চুপ করিয়া গেল।

অসম্ভব রকম ইলিশমাছ সেদিন উঠিতে লাগিল; এত মাছ সচরাচর কোনও দিন ওঠে না। সারা রাত তাহারা মাছ ধরিল, এবং যখন থামিল, অন্ধকার আর তখন নাই।

## এগারো

রাজার অন্তর্দ্ধানের বিষয় শেষরাত্রেই ধরা পড়িয়া গেল ; এবং তারপর হইতে সারা বাড়িতে এবং ক্রমে সারা গ্রামময় হুলস্থূল পড়িয়া গেল। শেষরাত্রে দুর্গাপ্রসন্ন প্রথামত প্রার্থনা করিতে উঠিয়াছিলেন এবং প্রথামতই তিনি পাশের ঘরে নিদ্রিত পুত্রকে দেখিতে গিয়াছিলেন। দেখিলেন, রাজা নাই। সামান্য বিস্মিত হইয়া বারান্দায় খোঁজ করিতে গেলেন, সেখান হইতে ক্রমে নিচে নামিয়া সভয়ে আবিষ্কার করিলেন,—নিচের বড় দরজা বন্ধ নয়, আলগোছে ভেজানোমাত্র। তারপর হইতে কী যে বিরাট অন্বেষণ শুরু হইয়াছে, তাহা আর বলিবার নয়। গ্রামের প্রতি পাড়া, প্রতি বাড়ি তন্নতন্ন করিয়া খোঁজা হইল, জেলে নামাইয়া প্রতিটি পুষ্করিণী জাল দিয়া ছাঁকিয়া ফেলা হইল—যদিও রাজা জলে ডুবিবে, এমন সম্ভাবনা খুব কম। এমন কি জেলেরা খালের মধ্যে পর্য্যন্ত ইতস্তত জালের ক্ষেপ ফেলিয়া চলিল। কিন্তু রাজার কোনও খোঁজ পাওয়া গেল না। সম্পূর্ণ রহস্যজনক ভাবে সে অদৃশ্য হইয়াছে।

অর্দ্ধেন্দুশেখর কেবলই মাথা চুলকাইয়া হয়রাণ হইতেছেন—'অদ্ভুত, অদ্ভুত শিক্ষা পাচ্ছে পাড়াগাঁয়ে—অবাক্ হয়ে যাই, দেখতো একবার কাণ্ডটা—ট্রেনিংয়ের অভাব ছাড়া আর কিছু নয়। জহর আর মিলিকে এমন করে ওর সঙ্গে ঘুরে বেড়াতে দেওয়া কিছুতেই আর সেফ্ হবে না—'

হৈমন্তী সত্যিকারের ভয় পাইয়া গেল, এবং আন্তরিক উদ্বেগে রাজার উপর সহসা তার অত্যন্ত ক্রোধ হইতে লাগিল—'হাড় দুষ্টু ছেলে, একবার কাণ্ড দেখ তো! কোথায় গেল, কি হলো, তার কি একটু পাত্তা আছে! —ও অম্বিকদাদা, একবার নেড়ানেড়ির আখ্ড়ায় লোক পাঠাও না, শুনেছি ওদিকে ওটা—'

'তা কি এতক্ষণ আব বাকি আছে, দিদিমণি—কিন্তু তাব টিকিব ও দেখা নেই। ভোজবাজির মত একেবারে অদৃশ্য হয়ে গেছে, নিজে না বেরিয়ে এলে অন্যেব সাধ্য কি খুঁজে বের করে। আমাব তো এখনও মনে হচ্ছে, ইচ্ছে করেই কোথাও লুকিয়ে আছে—চালাক ছেলে দিদিমণি—তার অনিষ্ট করা কারুর পক্ষে সহজ নয়। ইদিকে কর্ত্তা মুখ দিয়ে আব কথাটুকু বের কবতে পারছেন না, একেবারে শুদ্ধ মেবে গিয়েছেন—'

ইন্দির ঠাকুরাণী কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া তাহাব সনাতন পদ্ধতি অনুসারে উচ্চৈস্বরে ক্রন্দন উঠাইলেন—'বৌমা গো, আমাব সোনাব প্রিত্তিমা গো, তোমাব নয়নের মণি আমি নিজ অবহেলায় হারাইলাম গো—কেমুনে তোমারে মুখ দেখামু—'

সমস্ত বাডিব যখন এই অবস্থা, এমন সময়ে দুই হাতে অত্যন্ত মুস্কিলেব সঙ্গে পাঁচ পাঁচটা ইলিশমাছ বহন কবিয়া বজ্জতপ্রসন্ন খালেব দিক হইতে প্রসন্নবদনে অগ্রসব হইয়া আসিতে লাগিলেন। বেলা নয়টা কিংবা সাডে নয়টা হইয়াছে, অতি দ্রুত নৌকা বাওয়ায় তবেই এত শীঘ্র আসা সম্ভব হইয়াছে। ব্যাপারীদেব কাছে মাছ বিক্রি কবিতেই বেলা হইয়া যায়, রৌদ্র জমিয়া ওঠে, তারপর খালের পথে তিন ক্রোশ পথ ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যে আসা কম উদ্যমেব কথা নয়।

রাজাব বিশ্বাস ছিল, পাঁচ পাঁচটা ইলিশমাছ দুর্ভেদ্য বর্ম্মেব কাজ কবিবে। বাবা যদি ধমক্ দেন বা দিদি যদি বলে—কোথায় গিয়েছিলি, সে বলিবে, দিদির জন্য পদ্মা হইতে তাজা ইলিশমাছ আনিতে গিযাছিল—'কেমন বড বড মাছ নিজ হাতে বেছে এনেছি, দেখ।' কিন্তু বাজাকে দেখা মাত্র একটা অতিশয় পুষ্ট জনতা হইতে যে প্রকাব উচ্চগ্রামেব বাক্-ঐক্যতান উত্থিত হইল, তাহাতে বাজার ভবসা কবিবার বিশেষ কিছুই আব বজায় রহিল না।

হৈমন্তী সর্ব্বপ্রথমে ছুটিয়া আসিল। চেঁচাইয়া কহিল—'ওরে

ডাকাত, গিয়েছিলি কোথায়? ওরে, তুই যে মানুষ খুন করতে পারিস্।'

'ছ্যাখো না, দিদি, একবার চেয়ে--কেমন পাঁচ পাঁচটা মাছ নিয়ে এলাম। পদ্মার থেকে তুলেছি আর নিয়ে এসেছি,—একটু আগেই নড়ছিল—'

'পদ্মায় গিয়েছিলি কি রে ডাকাত। আরে ওরে বলিস কি তুই?'

'নইলে খালে বুঝি আবার ইলিশমাছ ধরা যায়!' অবজ্ঞার সঙ্গে এই কথা বলিয়া রাজা অগ্রসর হইতে উদ্যত হইল। তার বড়ই ঘুম পাইয়াছে, তাছাড়া এত ক্ষিধে পাইয়াছে এবং দুর্ব্বল লাগিতেছে যে, বলিবার নয়। কিন্তু অগ্রসর হওয়া সহজ কথা নয়। বাধা পাইয়া সে দেখিল, অভিমন্যুর মত চতুর্দ্দিকে শুভাকাঙ্খীদের জনতা ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়া সমস্ত উপদেশ এবং মন্তব্যগুলি একই সঙ্গে নিঃশেষ করিয়া ফেলিবার জন্য প্রস্তুত।

'অদ্ভুত ছেলে হয়েছে—ঠিক মতন ট্রেনিং পাচ্ছে না।' 'ও আমার নয়নের মণি, এমুন কইরা কই গেছিলি রে।' 'বড় দুরন্ত ছেলে, কিন্তু চালাক্ আছে, এই তো পাঁচ পাঁচটা মাছ জোগাড় করে নিয়ে এসেচে।' 'বলিহারি যাই সাহসের! হ্যাষরাত্রে পদ্মায় গিয়া মাছ ধইরা লইয়া আইল। বলি, দেখচোনি বুকের পাটা—'

'সর্ না মোক্ষদা,—পথ আটকে রেখেছিস্ কেন? মানুষের বুঝি ঘুম পায় না। নিজেরা মজা করে সারারাত ঘুমিয়েচেন কিনা—'

'মোক্ষদা, বাঁদরটাকে নিয়ে যা—খাইয়ে দাইয়ে শুইয়ে দে গে। আগে একটু সুস্থ হোক, তারপর দেখা যাবে—'

কণ্ঠস্বর শুনিয়া রাজা শিহরিয়া উঠিয়া আড়চোখে চাহিয়া দেখিল, বাবা—এবং ওদিকে আর চোখ না তুলিয়া সটান দালানের দিকে হাঁটিয়া

চলিল, এবং মোক্ষদার হাতে অমূল্য ইলিশমাছগুলি জিম্মা করিয়া বরাবর দোতলায় উঠিয়া গেল।—মিছিমিছি সবাই রাগ দেখাইতেছে! পাঁচ পাঁচটা ইলিশমাছ জোগাড় করিয়া আনিল, একটু প্রশংসাও যদি কেউ করিল—বয়ে গেল—

দুর্গাপ্রসন্ন যেন নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিলেন। বুকের মধ্য হইতে যেন একটা ভারি পাথর নামিয়া গেল—দ্রুত নিঃশ্বাস টানিয়া তিনি বুক পূর্ণ করিতে লাগিলেন। গতরাত্রে তিনি একপ্রকার মনস্থির করিয়াছিলেন যে, জমিদারির একটা অংশ হৈমের পুত্র জহরকে লিখিয়া দিবেন; কিন্তু রাজার অন্তর্দ্ধানের সঙ্গে সঙ্গে সেই অংশটার আয়তন ক্রমেই কমিয়া আসিতে আরম্ভ করিল, এবং অবশেষে রাজার নিরাপত্তা সম্বন্ধে আশা করিবার যখন আর কিছু রহিল না, তখন অকস্মাৎ তিনি সিদ্ধান্ত করিলেন—না, একটুও না—প্রত্যেকটা টুক্‌রা আমার রাজার, এর এক কণাও আমি বিলিয়ে দেব না; সব তার—সব তার, সব কিছু তার। অন্যকে উপহার দিতে পারি, কিন্তু সত্যি বলচি, সম্পত্তির একভাগও তোর ছাড়া আর কারুর নয়,—তুই রাগ করিস্ না—

রাজা আসিয়া পৌঁছানয় বাড়িতে আলোচনা থামা দূরের কথা, ক্রমেই তাহা বর্দ্ধিত হইয়া উঠিতে লাগিল। পুরুষ-মহল এবং স্ত্রী-মহলে চাঞ্চল্যকর সব গল্প উঠিল, এবং রাজার অন্যান্য বহু দুঃসাহসিকতার কাহিনী শুনিয়া কেহ বা চমৎকৃত, কেহ বা শিহরিত, কেহ বা রাগান্বিত হইয়া উঠিল।

বেলা আন্দাজ বারোটা; রাজা তখনও অকাতরে নিদ্রা যাইতেছিল। কাছারিবাড়িতে বসিয়া দুর্গাপ্রসন্ন তখনও লোকজনের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করিতেছেন, বেলা একটা দেড়টার আগে মধ্যাহ্নের আহার হয় না। ভোর হইতে এই দ্বিপ্রহর অবধি তিনি জমিদারির কাজকর্ম্ম দেখেন।

নানাস্থানের প্রজা, অর্থী-প্রত্যর্থী, পণ্ডিত এবং অন্যান্যের অভাব-অভিযোগ শ্রবণ করেন এবং লোকজনের সহিত আলাপ-আলোচনা প্রভৃতি করিয়া থাকেন।

'আইজ্ঞা, কর্ত্তা, নমস্কার—আমি কুসুমতলির বিরাট জাউলা—'

দুর্গাপ্রসন্ন ফিরিয়া তাকাইলেন, দেখিলেন, প্রৌঢ়াকৃতি বলিষ্ঠকায় এক জেলে বেতের আঙ্‌টায় বাঁধা বড় বড় পাঁচটা ইলিশমাছ হাতে ঝুলাইয়া দণ্ডবৎ করিয়া উঠিল।

'কি চাই তোমার?' দুর্গাপ্রসন্ন কহিলেন।

'আইজ্ঞা, হুজুরের বাড়িতে আমি বিয়া-থাওয়ায় কতবার মাছ দিছি। আমি কুসুমতলির জাউলার সর্দ্দার—'

'কিন্তু এখন তো মাছের কোনও দরকার নেই, বিরাট।'

'আইজ্ঞা তা না।—ছোটবাবু কাইল গাঙে গেছিল কিনা মাছ ধরণ দেখতে, কইয়া দিছিল পাঁচটা মাছ দেওনের লাইগা। একটু দেরি হইয়া গেল, কর্ত্তা,—কিন্তু ছোটবাবু কই?—'

'ঘুমোচ্ছে। তোমারই সঙ্গে কি পদ্মায় গিয়েছিল?'

'আইজ্ঞা না। গেছিল পদ্ম জাউলার পোলা মাইন্‌কার ডিঙ্গিতে। কিন্তু হুজুর অমুন আর যাইতে দিবেন না—বড় সর্ব্বনাশের কথা। কাইলই তো দাঙ্গা বাঁধছিল আর কি। এমুন সময় ছোটবাবু উইঠ্যা দাঁড়াইয়া দুই ধমকে আমাগো থামাইয়া দিল। এক্কুটুক্ পোলা, তার ত্যাজ কি কর্ত্তা। বকা খাইয়া নি আমরা থ' মাইরা গ্যালাম।' বলিয়া বিরাট আনুপূর্ব্বিক গত রাত্রের কাহিনী বিবৃত করিল। শুনিয়া আতঙ্কে, বিস্ময়ে, এবং তারপর অকস্মাৎ এক পরম গর্ব্বে দুর্গাপ্রসন্ন শিহরিয়া উঠিলেন। রাজা! রাজা যে এত্তোটুকু ছেলে! ওরে, তোরা বলিস্ কি—

'পদ্ম জাউলার বিরুদ্ধে আমার এই নালিশটা আমি হুজুরের কাছে নিবেদন কইর‍্যা গ্যালাম।' অবশেষে বিরাট কহিল।

'আচ্ছা, আমি দেখব, নিশ্চয়ই দেখব;—তুমি পেয়াদাদের ঘরে বিশ্রাম কর গিয়ে, না খেয়ে যেওনা কিন্তু,—অম্বিকা, যাবার সময় একে নতুন একজোড়া কাপড় দিতে ভুলোনা যেন—।' অদ্ভুত, অদ্ভুত তো—এতটুকু ছেলে—রাজা যে এতটুকু ছেলে!

'ও ইন্দির দিদি, করচে কি সে—জেগেছে?'

'না, অখনও ঘুমায়।'

'ঘুমাক্, ঘুমাক,—বেশ করে' ওকে ঘুমোতে দাও—কেউ যেন ওকে জাগিয়ে না দেয়। এত্তোটুকু ছেলে, কী ওর কাণ্ড, কী বীরত্ব দিদি—প্রায় বিশ্বেস হয় না!—' সহসা পরলোকগতা স্ত্রীর জন্য দুর্গাপ্রসন্নের দুই চোখ বাষ্পাকুল হইয়া উঠিল—'দেখে যেতে পারল না, ওর মানুষ হয়ে ওঠা দেখতে পেল না—'

নিদ্রা হইতে উঠিতে রঞ্জতপ্রসন্নের প্রায় বিকাল হইল। দেখিল, চতুর্দ্দিক কেমন ছায়াচ্ছন্ন; বিস্মিত হইয়া সে এধার ওধার তাকাইতে লাগিল। ঠিক পিছনেই ইন্দির পিসিমা বসিয়াছিলেন, পরম স্নেহে রাজার পিঠে হাত বুলাইতে লাগিলেন।

'মেঘ করেচে, পিসিমা?'

'ম্যাঘ? ম্যাঘ দেখলি কই? আরে, পোল্লাপ বকস্ নাকি?'

'ধ্যেৎ! তবে তেল আন, চান করব।'

'ছান করবি? কস্ কি। আরে বিকাল পড়েছে যে, ছান কইরা জ্বরজারি কর আর কি।'

'বিকাল!' সবিস্ময়ে রাজা কহিল। 'দুপুরে খেলাম কই? বাঃ রে, আমার ইলিশমাছের ঝোল! এতো হাঙ্গামা করে আনলাম—বেশ তো, আমাকে খেতেই দিলে না—বেশ তো—'

'সব আছে, যাদু, তোমার লাইগা সব তোলা আছে, খাইবা চল। আমার সোনার বাছা রে, মুখটা কতটুক হইয়া গেছে—'

পিসিমার সঙ্গে যাইয়া রাজা পিঁড়ির উপর জাঁকিয়া বসিল, এবং পর-মুহূর্তে এমনই গোগ্রাসে ভাত গিলিতে আরম্ভ করিয়া দিল যে, স্পষ্ট মনে হইল এক মহাদুর্ভিক্ষের দেশ হইতে সে সদ্যমাত্র পালাইয়া আসিয়াছে! সমস্ত পদ একই সঙ্গে ভাতের উপর ঢালিয়া লইল—আলাদা আলাদা মাখিবার মতন সময় অপব্যয় করা পেটের এই অবস্থায় অসম্ভব। দেখিতে দেখিতে সমস্ত ভাত এবং তরকারি অদৃশ্য হইয়া গেল। কহিল, 'কী চমৎকার ইলিশমাছ,—কোনও জন্মে এমন মাছ খাইনি—যা স্বাদ। কত হাঙ্গামা করে আনলুম—তা কেউ কি একটুও ভাল বল্‌লে—'

'ছোটবাবু, কর্ত্তায় তোমারে ডাকচে।—'

রাজা আঁচাইতেছিল, নিশার স্বপন সম মোক্ষদা আসিয়া এই বার্ত্তা জ্ঞাপন করিল। পলকে ইলিশমাছের অপূর্ব্ব স্বাদ পর্য্যন্ত রাজার মুখ হইতে তিরোহিত হইয়া গেল। এমন আহ্বান যে মোটেই লোভনীয় নয়, তাহা বুঝিয়া লইতে তার একটুও বিলম্ব হইল না। বাবার তখনকার চোখের সেই দৃষ্টি দেখা অবধি রাজার মনে আর শান্তি ছিল না।

'কেন?'

'তার আমি কি জানি,—ডাকচে যাও।'

'ডাকচে, যাও!' রাজা ভেঙ্‌চাইয়া কহিল। 'কোথায়?'

'ঐ খালপাড়ে তেনি খাড়াইয়া আছেন, বাদামগাছের তলে—তড়াতড়ি যাইতে কইচেন।'

ফাঁসিকাঠে ঝুলিতে যাইবার সময় কয়েদী যেমন যায়, রাজা মুখখানাকে তেমনি বিরস এবং মরীয়ার মত করিয়া অত্যন্ত অনিচ্ছুক পদক্ষেপে খালের দিকে অগ্রসর হইল। বেশ, মারুক্, যত ইচ্ছা মারুক—একটা

কথাও সে বলিবে না, একটুও কাঁদিবে না, একটুও চেঁচাইবে না—মিছি-মিছি সবাই মারবে—এমন্ পদ্মায় গিয়ে মাছ-ধরা দেখে এলুম—এমন পাঁচ পাঁচটা মাছ মাণিকেব কাছ থেকে নিয়ে এলুম—বিরাট জেলেটা ভারি কিপ্‌টে, দিলেনা মাছ, নইলে সবশুদ্ধ দশটা হতো—তা একদিন না হয় গেলুমই, ডুবে তো আর যাইনি—

'রাজা।'

দুর্গাপ্রসন্নের ডাকে রাজা চমকিয়া থামিল। দেখিল, বাবাব মুখ অতিশয় প্রসন্ন, ক্রোধের চিহ্নমাত্র নাই।

'বাজা, কাছে আয়, বাবা!'

এ কণ্ঠস্বর শুনিয়া বাজাব আর ভয় রহিল না। এ তো তিরস্কাবের কণ্ঠস্বর নয়, এ যে স্পষ্ট আদবেব ডাক। এইটুকু বুঝিতে পারিয়াই হাসি চাপা তার পক্ষে দু:সাধ্য হইয়া পড়িল—কি ভয়ে ভয়েই না আসিয়াছিল! হি হি কবিয়া হাসিতে হাসিতে সে কহিল—'কেমন তামাসা করে এলাম, না বাবা—হি হি হি—এই বারটি তুমি বকো না, বাবা। কেমন, ইলিশমাছগুলি খুব ভাল নয়?—খুব স্বাদ—'

'হ্যাঁ, খুব।'

'তবু তো বিরাট জেলেটা মাছ দিয়ে গেল না। ওটা শডকি নিয়ে ঝগ্‌ডা বাঁধাতে এসেছিল—আমি বল্লুম—খববদাব, ঝগ্‌ডা কবতে পারবে না,—ব্যস্—আমাব বাবা বাঘ।—যদি শোনে, তোমাদের কাঁধে একটিও আব মাথা থাকবে না—হি হি হি—এমন ধম্‌কে দিলাম—'

'বিবাট তোর মাছ দিয়ে গেচে, রাজা।'

'ক'টা? পাঁচটাই দিয়েচে তো?' রাজা সাগ্রহে প্রশ্ন করিল।

'রাজা?'

'বাবা।'

'আমি যখন মরে যাব, এত সব প্রজাকে তুই শাসন ক'রে রাখতে পারবি তো?'

'খুব। কিন্তু তুমি মরবে না—ধ্যেৎ!'

'শুধু শাসনই নয়, এদের কত সাহায্যও তোকে সর্ব্বদা করতে হবে। বড় গরিব ওরা, বড় সহায়হীন। ওরা যাতে উপোস করে না মরে, তা তোকে দেখতে হবে, ওরা যাতে বিনা চিকিৎসায় না মরে, তা তোকে দেখতে হবে—'

'দেখবই তো।' রাজা সগর্ব্বে কহিল।

'সব তোকে আমি দিয়ে যাব—সব তোকে দিয়ে যাব। আমি নিশ্চয় জেনেছি, তুই পারবি, ঠিক পারবি।'—সহসা বাষ্পোচ্ছ্বাসে দুর্গাপ্রসন্নের কণ্ঠ জড়াইয়া আসিল। রাজা বিস্মিত হইয়া বাবার মুখের দিকে তাকাইল, কিন্তু কিছুই বুঝিতে পারিল না। সহসা সে উচ্চৈস্বরে তাহার স্বভাবসুলভ হি হি আরম্ভ করিয়া দিল। সেই হাসিতে খালের জল, শস্যপূর্ণ বিস্তৃত প্রান্তর, অট্টালিকা এবং আকাশ প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল।

'রাজা, আমার কাছে আয়।'

রাজা অগ্রসর হইয়া বাবার গায়ের সঙ্গে লাগিয়া দাঁড়াইল। স্বভাবতই গম্ভীর-প্রকৃতি দুর্গাপ্রসন্ন সহসা গাম্ভীর্য্য হারাইয়া ফেলিলেন। রাজার মাথাটা নিজের বুকের মধ্যে টানিয়া লইলেন, দুই চোখ দিয়া দরদর্ করিয়া অশ্রু গড়াইয়া পড়িতে লাগিল।—রাজা আর অসহায় শিশু নয়, সে আদেশ করিতে শিখিয়াছে;—ক্রুদ্ধ জনতাকে সে ব্যক্তিত্বের তরবারি দ্বারা শাসন করিতে পারে! এ গর্ব্ব দুর্গাপ্রসন্ন আজ কোথায় ধরিয়া রাখিবেন!

সহসা রৌদ্রকরোজ্জ্বল পদ্মার মহিমময় দৃশ্য তাঁর দুই মুদ্রিত চোখে ভাসিয়া উঠিল।—কত প্রাণ, কত সঙ্গীত, কত গাম্ভীর্য্য, কত গৌরব এই

রহস্যময়ী নদী অকাতরে বিলাইয়া দিতেছে। পদ্মা নিজ হাতে যাহাকে শিক্ষা দেয়, তাহার চাহিবার আর কিছুই বাকি থাকে না, শৌর্য্যে তার বুক পূর্ণ হয়, মহত্ত্বে মন হয় উদার, মর্য্যাদায় সে সকলের উর্দ্ধে ওঠে—একই সঙ্গে সে হাসে এবং শাসন করে। পদ্মার জন্য এক অপূর্ব্ব কৃতজ্ঞতাবোধে দুর্গাপ্রসন্নের চিত্ত আপ্লুত হইয়া উঠিল। মনে মনে শুধুই বলিতে লাগিলেন—এতোই যদি মা তুই দিস্, এতই যদি শক্তি ধারণ করিস্, এতই যদি তোর কৃপা, তবে, মা, কেন এমন করিয়া আমার ঘর ভাঙিয়া দিলি ?

রহস্যময়ী নদী এই প্রশ্নের কোনও জবাব দিল না। পৃথিবীর তটপ্রান্তে বারম্বার আঘাত করিয়া বলিতে লাগিল—ভাঙ্, ভাঙ্, ভাঙ্—

# পদ্মা-প্রমত্তা নদী

দ্বিতীয় খণ্ড

# এক

ইংরেজী ১৯২৯ সাল।

ল' কলেজ হস্টেলের পাঁচতলার এক ঘরে রাত্রির আহারের পর গুটিকয় যুবক আড্ডা দিতেছিল। বস্তুতঃ, ইহাকে আড্ডা না বলিয়া সঙ্গীতের আসরও বলা চলে। পূর্ণানন্দ দাস এতক্ষণ ধরিয়া বাঁশিতে অতি সুমিষ্ট ভূপালী আলাপ করিয়া সবেমাত্র থামিয়াছে। বেচারাকে বিশ্রাম দিবার জন্যই গল্পগুজবের সূত্রপাত করা হইয়াছিল; তবে মুস্কিল এই, একবার গল্প শুরু হইলে থামিবার লক্ষণ দেখা যায় না, এবং বিষয়টা যদি একবার স্বরাজ বা সমাজতন্ত্রবাদে পৌঁছায় তবে অর্দ্ধরাত্র পর্য্যন্ত তর্ক চলিতে থাকে। সিনেমা-অভিনেত্রী হইলে রাত দশটার বেশি হয় না, নৃত্যপটিয়সী সুমনা চৌধুরীর কথা আরও কিছু বেশিক্ষণ চলে, এবং ল' কলেজের অধ্যাপকদের কথা উঠিলে দশ মিনিটের মধ্যে সকলের ঘুম পাইয়া যায়।

সমর ভট্টচাজ ছাত্রসমিতির সেক্রেটারি। ছাত্র-ধর্ম্মঘট পরিচালনা করিয়া এখন সে পাকা রাজনীতিজ্ঞ হইয়া উঠিয়াছে। তার বিশ্বাস, বর্ত্তমান গতিতে প্রসিদ্ধি লাভ করিতে থাকিলে অচিরে সে ধনতান্ত্রিকতার বিরুদ্ধে দেশের সমগ্র শ্রমিকমণ্ডলীর ক্রুদ্ধ আক্রমণ পরিচালনার যোগ্যতা অর্জ্জন করিতে পারিবে। সম্মুখের টেবিলটায় এক প্রচণ্ড চাপড় দিয়া সে কহিল—'তোমরা যে-স্বরাজ চাও, সে-স্বরাজের অর্থ কি, জান? তার অর্থ, দশবিশটা মিলের মালিক, দশবিশটা ধনী মহাজন, কিছু ধুরন্ধর বেকার নেতা, কিছু স্বার্থান্বেষী বিদেশী ধনিক তাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করবার পূর্ণতর সুযোগ পাবে।—কী লাভ হবে এতে সর্ব্বসাধারণের, অগণিত মূক জনমণ্ডলীর, যারা হাল চাষ করে' শস্য উৎপাদন করে, কিন্তু খেতে পায় না, ধনীর ভোগের উপাদান সংগ্রহ করতে যারা কারখানার যন্ত্র-

দানবের উদরে নিজেদের বিসর্জ্জন দিয়ে ছিঁবড়ে হয়ে বেরিয়ে আসে? যে-স্বরাজ তোমাদের লক্ষ্য, পারবে তা এই বঞ্চিতদের বাঁচাতে? কি উপকারে লাগবে সংখ্যাতীত জনসাধারণের এই তথাকথিত আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার? তোমাদের এ-স্বরাজ কতগুলি মিল-মালিকের স্বরাজ। জনসাধারণের স্বরাজ একমাত্র সমাজতন্ত্রবাদের মধ্যে। কিন্তু তোমাদের কংগ্রেস এ-সম্বন্ধে তাদের মতামত এমন অস্পষ্ট করে রাখচে কেন?—জিজ্ঞেস করি, এই স্বরাজে বড় বড় মিল-মালিকদেরই বা এতটা আগ্রহ দেখি কেন?—'

প্রবীর বর্দ্ধন কহিল, 'মিল-মালিক হলেই কি তার স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা লোপ পেতে হবে? এ তো অদ্ভুত মতবাদ!—'

'অদ্ভুত এটা নয়, যা অদ্ভুত তা' হলো তোমার ধনিক-মনোবৃত্তি সম্বন্ধে অজ্ঞতা।'—সমর উত্তেজিতস্বরে কহিল। 'জগতের ধনিকে ধনিকে আছে পৈশাচিক সখ্য। জগৎ জুড়ে ধনতান্ত্রিকতার ষড়যন্ত্র চলচে। তাদের উদ্দেশ্য সর্ব্বসাধারণকে লুণ্ঠন, তাদের দর্শন—স্বার্থপরতা; তাদের স্বপ্ন হচ্চে, স্বর্ণ, তাদের ধর্ম্ম হচ্চে—ভোগ। স্বাধীনতার স্পিরিচুয়াল সিগ্‌নিফিকেন্স্—যা তোমাকে আমাকে, যদু মধু হরিকে মুগ্ধ করে, আত্মত্যাগে উদ্বুদ্ধ করে—জেলের মধ্যে পচিয়ে মারে—ধনিকসম্প্রদায়ের তাতে সামান্য কাণা-কড়িও এসে যায় না! স্বাধীনতার কোনও আধ্যাত্মিক মূল্যই তাদের কাছে নেই! তারা টাকার দামে মূল্য হিসাব করে।—ওদের দেবতা—ম্যামন্।'

তর্কটা হইতেছিল প্রধানত সুনন্দ গাঙ্গুলির সঙ্গে। সুনন্দের এক পিসেমশায় বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির একজন হোম্‌রা-চোম্‌রা, ব্যবসায়ে ব্যারিস্টর। সুনন্দ তাই এই হস্টেলে বহুলাংশে নিজেকে বঙ্গীয় কংগ্রেস কমিটির কার্য্যাবলীর একজন পৃষ্ঠপোষক বলিয়া বিবেচনা করে। এই একই কারণে সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী ছাত্রনেতা সমর ভট্টাচার্জের

সে বিশেষ আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু। সুনন্দের প্রতি সমরের কংগ্রেস-সমালোচনার শ্রান্তিহীন বাগ্মিতা নিক্ষিপ্ত হইয়া থাকে।

সুনন্দ কহিল, 'স্বরাজ যদি না-পাওয়া যায়, তবে সমাজতন্ত্রই বা আসবে কোথা থেকে, এই কথাটা জিজ্ঞাসা করি, সমর ভট্‌চাজ? আমরা সবাই এক মত যে, দেশের কল্যাণের জন্য বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা—যাকে বলে—ফ্রি প্রাইমারি এডুকেশান—প্রবর্ত্তন করা অত্যাবশ্যক। কিন্তু প্রবর্ত্তনটা কে করছে? ফ্রি এডুকেশান একান্ত প্রয়োজনীয় বলে, আমাদের প্রভুরা মিলিটারি বাজেট্‌টা কি একটুও কমাবেন?—তবেই বোঝ, যে-কোনও কল্যাণকর আন্দোলনের কন্‌ডিশন প্রিসিডেণ্ট হচ্চে স্বরাজ। স্বরাজ লাভের আগে অন্যদিকে দৃষ্টি দেওয়াটা হবে আত্মহত্যার নামান্তর। অর্থাৎ সেটা হবে—'

'সেটা হবে', কথা কাড়িয়া লইয়া সমর সব্যঙ্গে কহিল, 'কংগ্রেসের অর্থসাহায্যকারী মিল্‌-মালিকদের স্বার্থবিরোধী! যুদ্ধ যখন বেঁধেছে, তখন প্রথম থেকেই উদ্দেশ্যটা নির্দ্দিষ্ট করে নেওয়া উচিত। কেন আমরা যুদ্ধ করচি? কোন্ নির্দ্দিষ্ট লাভের জন্য, কোন্ নিঃসন্দেহ আদর্শের জন্য, কোন্ অভ্রান্ত কল্যাণের জন্য সংগ্রাম করচি, তা আগে থাকতেই ঠিক করে নাও। জনসাধারণের সহানুভূতি যদি লাভ করিতে চাও, তবে তোমাদের চরম উদ্দেশ্যের রূপটা তাদের দেখতে দাও। অর্থনৈতিক পরাধীনতা রাষ্ট্রিক পরাধীনতার চাইতে কম পীড়াদায়ক, কম পাশবিক নয়। যুদ্ধ যখন একবার আরম্ভ হয়েচে, তখন সমস্ত বিরুদ্ধ-শক্তির সঙ্গে পাঞ্জা কষা হয়ে যাক্— দু'বার করে যুদ্ধ করা কারুর পক্ষেই লাভের নয়। তোমাদের বড় বড় কংগ্রেস-নেতারা এ-সম্বন্ধে স্পষ্ট করে অভিমত ব্যক্ত করছেন না কেন? ইস্যুটা এমন ধোঁয়াটে করে রাখার হেতুটা কি?—'

সুনন্দ কহিল 'কেন, পণ্ডিত জওহরলাল বা সুভাষচন্দ্র তো এ-সম্বন্ধে নিজেদের অভিমত গোপন রাখেন নি? তাঁরা তো স্পষ্ট করে নিজেদের

অর্থনৈতিক পরিকল্পনার কথা জানিয়ে দিয়েছেন। তাঁরা বলেছেন—'

'তাঁরা যাই বলুন না, তাতে কংগ্রেসের কিছু এসে যায় না। এরা এক সময় কংগ্রেসের কর্ণধার হতেও পারেন, কিন্তু এখনও তার দেরি আছে। কংগ্রেস এখন কাদের মত মতন চলছে শুনবে?—তাদের নাম করবো? থাক্—কিন্তু তারা সমাজতন্ত্রের পক্ষপাতী নয়, এটা অতিশয় নিশ্চিত সত্য—'

'সমাজতন্ত্রও একটা নির্ভুল ত্রুটিহীন সমাজব্যবস্থা নয়,' সুনন্দ পিসেমশায়ের প্রতিনিধিস্বরূপ কংগ্রেসের বামপন্থীদের উদ্দেশে কহিল। 'একটা প্র্যাক্‌টিক্যাল ব্যবস্থা হিসাবে, কম্যুনিজম্ ছেড়ে দাও, সোশ্যালিজমই কতটা সচল, এখনও তা প্রমাণিত হ'তে বাকি আছে।—মানুষের চিরন্তন খর্ব্বতা এই যে, তার কল্পনা তার সামর্থ্যের অনেক উর্দ্ধে বিচরণ করে। যাকে আমরা ভাল বলে কল্পনা করতে পারি, জীবনে তার রূপ দিতে গিয়ে ভালর চাইতে যদি মন্দ বেশি করে বসি তাতে বিস্ময়ের কিছুই হবে না। রাশিয়ার নয়া ব্যবস্থা অত্যন্ত অল্পদিনের, এখন পর্য্যন্তও তা বিস্ময়কর কোনও ফল-প্রসব করে নাই। দুর্ভিক্ষ, ব্যক্তিস্বাধীনতার হ্রাস, অর্থনৈতিক গোলযোগ—আমরা তো প্রধানত এই সবই দেখতে পাচ্ছি। অন্তত, এমন কোনও বিস্ময়কর উপকার দেখি না যাতে ভারতবর্ষে তা প্রবর্ত্তনে কিছু দেরি হলে মারাত্মক ব্যাপার ঘটবে। দেশে এম্‌নি যেন বিবাদ-বিসম্বাদের অভাব।—এর ওপর আবার সোশ্যালিজম চাপিয়ে মারামারিটা বাড়ান কেন?'

সমর সোজা হইয়া উঠিয়া বসিয়াছিল, অধৈর্য্য হইয়া সে কেবলই প্রতিবাদ করিবার চেষ্টা করিতেছিল, কিন্তু সক্ষম হইতেছিল না, সুনন্দও বক্তৃতাতে এমন দক্ষ। সুনন্দও ছাত্র-নেতা, তবে তাদের প্রতিষ্ঠান সমরদের প্রতিষ্ঠান হইতে বিভিন্ন—এমন কি এদের প্রতিষ্ঠানের প্রতি বৈরীভাবাপন্ন। কাজেই উপস্থিত সবাই বুঝিল, তর্ক-যুদ্ধটা আজ রীতিমত

জমিয়া উঠিবে, এবং আশেপাশের ঘরে কাহারও নিদ্রা যাওয়া আর সম্ভবপর হইবেনা। সঙ্গীতের আসর জমিবার আ' কোনও সম্ভাবনাই রহিল না। বাঁশির স্থানে অসি—যদিও বাচনিক অসি—আসিয়া আস্ফালন করিয়া উঠিল।

'বুর্জোয়া মনোবৃত্তি!' সমর আরম্ভ করিল, 'অত্যন্ত শোচনীয় বুর্জোয়া যুক্তি, যা দিয়ে সর্বদেশের সর্বকালের ধনিকেরা নিষ্পেষিত শ্রমিকদের ন্যায্য দাবি চাপা দিতে চেয়েছে।—কিন্তু সত্যকে কেউ চাপা দিতে পারে না। কবি বলেছেন—ব্যথায় না হয় ম্লান, আঘাতে না টলে।—যদি সোশ্যালিজমের ক্রিটিসিজমের কথাই তুললে তবে আমার কাছ থেকেই তার জবাবটা শোন। স্পষ্ট করেই তবে প্রসঙ্গটা ওঠাচ্চি—'

'দেখ্ সমর, তোর লাফালাফিটা একটু থামা। আমি এখানে পূর্ণর বাঁশি শুনতে সবাইকে ডেকে এনেছি, সমাজতন্ত্রের বক্তৃতা শুনতে নয়। থাম বলছি।—পূর্ণ, তুই বাঁশি ধর। চমৎকার একটা রাগিনী চাই—যা শুনে, ক্যাপিটালিজম্ এবং সোশ্যালিজম্, দু-ই যেন—ট্রেম্বল্ অ্যাণ্ড ড্রাই।'

ইজিচেয়ারে হেলান দিয়া টেবিলের ছায়ায় একটি যুবক শুইয়াছিল, সমরকে যুদ্ধের জন্য গলা শাণাইতে দেখিয়া তাড়াতাড়ি সাবধান করিল। শুনিয়া চতুর্দ্দিক হইতে সমর্থন উঠিল—হিয়ার, হিয়ার। রাজনীতি হইতেও যে এরা সঙ্গীত বেশি পছন্দ করে, এতক্ষণে তাহা বুঝিতে পারা গেল।

সমর বক্তৃতা উদ্যত করিয়াছিল, বাধা পাইয়া রাগিয়া কহিল, 'বুর্জোয়া অব দা বুর্জোয়াস্। জমিদার—প্রজার রক্ত খাস্—সোশ্যালিজম্ ভাল লাগবে কেন? তুই যে এতটা হৃদয়হীন তা আমি জান্‌তাম না, রজত।'

রজত হাসিয়া কহিল, 'বেশি বাজে বকিস না। আর্মচেয়ার সোশ্যালিস্ট্—ঘরে বসে বসে বক্তৃতা দিচ্ছিস্, পারিস্ এখন গোলদীঘির

পাড়ে গিয়ে চেঁচাতে? সে সাহস আছে? কেন শুধু শুধু এতটুকু ঘরে এতটা বাগ্মিতা নষ্ট করে ফেলেছিস, আহাম্মুক! হয় চুপ করে বাঁশি শোন্, নইলে গোল্লায় যা—যেটা তোর ইচ্ছে। পূর্ণ, ধর তোর বাঁশি। ওর নার্ভগুলো ভয়ানক উত্তেজিত হয়ে উঠেচে; সুর ওর পক্ষে ওষুধের কাজ করবে। বরঞ্চ উচ্চশ্রেণীর সুর না বাজিয়ে তোর জন্য ক্ষেতের সুর বা কারখানাই বাগিণী বাজাবে এখন—'

'রোম যাচ্চে পুড়ে, এদিকে নেবো বাজাচ্চেন বাঁশি!' বলিয়া সমর তীব্র আপত্তির ভঙ্গিতে উঠিয়া দাঁড়াইল। 'কি নিষ্ঠুর হৃদয়হীন হয়ে উঠচিস্, রজত! দেখলে কষ্ট হয়! যদি আধ্যাত্মিক মৃত্যু এড়াতে চাস্ তবে প্রথমেই ঐশ্বর্য্যের বন্ধনগুলি দূর কর্।' বলিয়া অতিরিক্ত দৃপ্ত পদক্ষেপে সমর ঘরের বাহির হইয়া গেল।

রজত মুচ্‌কি হাসিয়া কহিল, 'নির্ঘাৎ চুরুট আনতে যাচ্চে। নইলে ওর এতটা বীরত্ব!—'

সমর কহিল, 'একশো বার যাচ্চি। স্বার্থপর ধনিক, চুরুট খাস্ যে, কম্যুনিজম্ করবো? অবিবেচক, এক-চোখো বুর্জ্জোয়া!'

'দূর হ', দাড়ি-না-কামানো কম্যুনিস্ট্!' রজত কহিল। 'তুই শুরু কর, পূর্ণানন্দ।'

পূর্ণানন্দ শুরু করিল। রজত পুনরায় চেয়ারে এলাইয়া অন্ধকারে ঢাকা পড়িয়া গেল।

রজতের মধ্যে শৈশবের রাজাকে খুঁজিয়া পাইতে দেরি হয়। কত বড়ই না সে হইয়া উঠিয়াছে। সেই এক রত্তি হাওয়ার মত চঞ্চল শিশু আজ দীর্ঘ সুঠাম বলিষ্ঠ যুবা। গায়ের রঙ উজ্জ্বলশ্যাম বর্ণ, নাকটা খড়্গের মত তীক্ষ্ণ, রাজার দুর্ব্বলতার সঙ্গে রজতের বলদৃপ্ত দেহভঙ্গির তুলনা করিলে তাহারা দুজনে একই লোক বলিয়া সহসা প্রত্যয় হইবে না।

তবে এক জায়গায় শৈশবের সঙ্গে তার একান্ত সংযোগ রহিয়াছে। তার মধ্যে যে-ব্যক্তিত্ব, যে-সহজ গৌরব ও তেজদৃপ্ততা অবিসংবাদীরূপে বন্ধুমহলে স্বীকৃত ও সম্মানিত, শৈশবেও তাহা প্রায় এমনি সুস্পষ্ট ভাবে প্রকাশ পাইয়াছিল।

তিন বৎসর হয় দুর্গাপ্রসন্নের মৃত্যু হইয়াছে। প্রিয় পুত্রের ঘর-বাঁধা তিনি আর স্বচক্ষে দেখিয়া যাইতে পারিলেন না, কিন্তু রজতের যে পরিচয় তিনি পাইয়া গিয়াছেন, তাতে তাঁর সংশয় থাকে নাই যে, বড় হইলে পুত্র যোগ্যতায় পিতাকে ছাড়াইতে পারিবে। আগেই তিনি তাঁর এক এটর্নী বন্ধুর কাছে সমস্ত সম্পত্তি বুঝাইয়া দিয়া গিয়াছিলেন, রাজা সাবালক হইলেই সমস্ত কর্তৃত্বের ভার তাহাকে অর্পণ করিতে হইবে, এই ব্যবস্থা ছিল। রাজার তত্ত্বাবধানে তাঁর সম্পত্তি এবং প্রজারা যে ক্রমশই উন্নতির পথে অগ্রসর হইবে, তাহাতে তাঁর সন্দেহমাত্র ছিল না। কোটালনগরকে তিনি অপূর্ব জনপদে পরিবর্তিত করিয়া গিয়াছেন; রাজার কাছে তাঁর একমাত্র অনুরোধ ছিল, সে যেন কোটালগরকে ত্যাগ না করে—তাঁর এত স্বপ্নের, এত কল্পনার জনপদকে সে যেন সার্থক করিয়া তোলে। রজত এ-পর্যন্ত সে-আদেশ বর্ণে বর্ণে পালন করিয়াছে। কলেজের যখন ছুটি হয়, বন্ধুবান্ধবেরা কেহ যায় পাহাড়ে, কেহ যায় সমুদ্র-তীরে, কেহ যায় সাঁওতাল-পরগণার ঢেউ-খেলান প্রান্তরে। কতজন তাহাকে আমন্ত্রণ করে সঙ্গী হইতে, কত বন্ধু অনুরোধ করে, কত প্রলোভন দেখায় পার্ব্বত্যশ্রীর। কিন্তু প্রতি ছুটিতে রাজার কোটালনগর যাওয়া চাই। সেখানে গেলে সে যেন তার পিতার সান্নিধ্য অনুভব করে—দুর্গাপ্রসন্নের কীর্ত্তিগুলি তাকে পিতৃগর্ব্বে গর্ব্বিত করে। কি গভীর বেদনায়, কি তুলনাহীন হতাশায় যে পিতা এই গ্রামপত্তন করিয়াছিলেন, কি সুগভীর আক্রোশে তিনি যে এই কোটালনগরকে সম্পদে, সৌন্দর্য্যে পরিপূর্ণ করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন, আজকাল রজত তার অনেকটাই

বুঝিতে পারে। পিতার জন্য এক সুগভীর শ্রদ্ধায় তার বুকটা পূর্ণ হইয়া ওঠে।

রজত সাবালক হইয়াছে। তাঁর পিতৃবন্ধু এটর্নী সত্যানন্দ মিত্র এক বছর হয় একপ্রকার জোর করিয়াই তাকে সম্পত্তি বুঝাইয়া দিয়াছেন। রজত কহিয়াছিল, 'এত তাড়া কেন, কাকাবাবু। সম্পত্তি কেউ খেয়ে ফেলছে না, পড়াটা আগে শেষ করে নিই।'

বৃদ্ধ সত্যানন্দ হাসিয়া জবাব দেন, 'পড়বে বৈ কি, নিশ্চয়ই পড়বে। সম্পত্তি তদারক ক'রে তুমি পড়াশুনায় ব্যাঘাত করো সে কি আমিই চাই, বাবা।—সব আমিই দেখাশুনা করব, সব হাঙ্গামা পোয়াবার ভার এই বুড়োর, কিন্তু আইন-মতে তুমি মালিক হও—তারপর তত্ত্বাবধানের ভার আমার উপর ছেড়ে দিও। দুর্গাপ্রসন্ন তোমাকে সম্পত্তি বুঝিয়ে দেবার জন্য যেন পাগল হয়ে উঠেছিলেন;—সব দিক দিয়ে যে এমন ধীর-স্থির মানুষ নাবালক ছেলের হাতে সম্পত্তির দায়িত্ব দিয়ে যাবার জন্য কি বিষম তার জেদ। সব কিছু তোমাকে বুঝিয়ে দিয়ে যেতে পারলে যেন সে হাঁপ ছেড়ে বাঁচে—তোমাকে দিয়ে যেতে পারলে সে যেন ধন্য হয়ে যায়।—তাই, বাবা, তোমার সম্পত্তি তোমাকে হাতে নিতেই হবে, দেরি হলে তাঁর আত্মা কষ্ট পাবে।'

সত্যানন্দবাবু প্রস্তাব করিয়াছিলেন, রজত বাড়ি ভাড়া করিয়া থাকুক। এত বড় ধনীর সন্তান, কলেজ-হস্টেলের অসুবিধায় কষ্ট পাইবে, ইহাই ছিল তাঁর ভয়। কিছুদিন সত্যানন্দবাবুর বাড়িতেও রজতকে থাকিতে হইয়াছে। কিন্তু রজত অত্যন্ত সঙ্গীপ্রিয়; বন্ধুবান্ধব না হইলে তার চলে না। এম্-এ এবং ল' ক্লাসে ভর্ত্তি হইয়াই সে ল' কলেজ হস্টেলে বাস করিতে আরম্ভ করিল। শীঘ্রই সেখানে তার বিবিধ সম্পত্তি লইয়া এক কম্যুনিস্ট-প্রথার প্রবর্ত্তন—তার জামা, জুতা, মাথার তেল সর্ব্বসাধারণের সম্পত্তি হইয়া গেল।

পূর্ণানন্দের বাঁশি অপূর্ব্ব হইয়া বাজিতেছে। কি বর্ণনাতীত মধুর সে সুর। নিদ্রালস মধ্যরাত্রের কোন্ এক অজ্ঞাত জায়গায় অব্যক্ত আকুলতা আত্মগোপন করিয়াছিল! দরদী যৌবন বাঁশির মন্ত্রে অত্যন্ত অকস্মাৎ তাহা আবিষ্কার করিয়া ফেলিয়াছে। এমন যোগাযোগ না হইলে এমন বাঁশি বাজেনা,—চাই নিদ্রিত রাজপুরীর স্পন্দহীন অন্ধকার, চাই স্বপ্ন-বিলাসী যৌবনের রহস্যময় অনুভূতি, চাই অব্যক্তের স্বতঃপ্রবৃত্ত সহায়তা—মানুষের চৈতন্যের সঙ্গে তার এক অপূর্ব্ব মিতালির অভিপ্রায়! তবেই না এমন করিয়া বাঁশি বাজিতে পারে। কোন্ রহস্যের আভাস পাইয়াছে পূর্ণানন্দ? কোন্ সৌন্দর্য্য, কোন্ রঙিন আশা, কোন্ বেদনা তাহাকে এ সুর জোগাইল?

এমন সময় মস্ত একটা মোটা চুরুটে ইঞ্জিনের মত ধোঁয়া ছাড়িতে ছাড়িতে সমরের পুনঃপ্রবেশ।

প্রবীরই তাহাকে প্রথমে দেখিতে পাইয়াছিল, সামান্য পরিহাসের সুরে কহিল, 'বর্ম্মা চুরুটের পশ্চাতে কার্ল মার্কস্-এর পুনঃপ্রবেশ।'

সমর চকিতে দাঁড়াইয়া পড়িল। প্রচণ্ড এক গর্জ্জনে বাঁশিকে ধিক্কৃত করিয়া কহিল—'খবরদার বলচি, আর যা কর, তা কর, কার্ল মার্কস্কে নিয়ে ঠাট্টা করো না, সেটা কিছুতেই সহ্য করবো না।' বলিয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধভাবে গভীর প্রতিবাদের সঙ্গে সে সম্মুখের চেয়ারটায় বসিয়া পড়িল

বাঁশি বলিল—পিঁউ পিঁউ পিঁউ পিঁউ।

## দুই

'শুন্‌চেন?'

লেট্-মর্ণিংয়ের ল'-ক্লাস সারিয়া রজত হস্টেলে ফিরিতেছিল। স্নান-আহারাদি করিয়া এম্-এ ক্লাসে আসিবার জন্য এক ঘণ্টা সময় থাকে, এবং কলেজের গায়েই হস্টেল বলিয়া হস্টেলবাসী ছেলেরা প্রায় কেহই স্নান বা

খাওয়া সারিয়া আসে না। আশুতোষ বিল্ডিংস্ ও দারভাঙ্গা বিল্ডিংস্-এর মধ্যে দোতলায় যে প্যাসেজ্ আছে, সেখান হইতে আহ্বান শুনিয়া তেতলার এ-প্রান্তের রেলিঙের কাছে রজত দাঁড়াইয়া পড়িল। নিচে তাকাইয়া দেখিল এম্-এ ক্লাসের সহাধ্যায়িনী মঞ্জরী বায় মুখ এবং পক্ষ্ম ঊর্দ্ধায়িত করিয়া তাকাইয়া আছে। রজতের সঙ্গে চোখাচোখি হইলে মঞ্জরী অনুচ্চস্বরে ডাকিল, 'একটু শুনুন।'

রজত নামিয়া আসিল। কহিল, 'কি ব্যাপার?'

মঞ্জরী কহিল, 'একটু সাহায্য করতে হবে। এড়াতে চেষ্টা করবেন না, আগেই বলে রাখছি।'

মৃদু হাসিয়া রজত কহিল, 'গুণ্ডা পিছু নেয় নি তো? অবশ্যই সাহায্য করব। একজন ভদ্রমহিলাকে বাঁচাব, এ আর করব না। বলুন, কোথায় সেই দুর্বৃত্ত?'

মঞ্জরী হতাশার অভিনয় করিয়া কহিল, 'কেবলই পরিহাস করবেন। সীরিয়স্ হওয়া কি আপনাদের মধ্যে আর ফ্যাশান্ নয়? গুণ্ডা আক্রমণ করলে আপনাদের সাহায্য চাইব কেন, হিল উঁচু জুতো কি অমনি পায়ে দিই?'

'আশ্বস্ত করলেন', রজত সামান্য গম্ভীর হইয়া কহিল। 'তবে দেখছি একটু দেরি হলেও চলবে। এদিকে আমার স্নানাগার কিছুই হয় নি, আপনার পক্ষে সামান্যতম দেরি করা সম্ভব হলে সে দুটো সেরে আসি। ক্লাস আরম্ভ হতে আর দেরি নেই।'

'যান্, চাই না আপনার সাহায্য। আপনি স্বচ্ছন্দে খান্ গিয়ে', বলিয়া মঞ্জরী অনাবশ্যক উগ্রতার সঙ্গে ডান কাঁধটা ভঙ্গিভরে ঘুরাইয়া লইয়া পাশ ফিরিয়া দাঁড়াইল। তার শাড়ির আঁচলের প্রত্যন্তদেশটা ওড়্নার মত ফুলিয়া উঠিয়া মঞ্জরীর অভিমানের অনুকরণ করিয়া অবশেষে ওর স্কন্ধ ও দক্ষিণ বাহুর উপর আঁটিয়া বসিল।

'না হয়, নাই খেলাম। বলুন কি করতে হবে?'

'টিকেট বিক্রি করে' দিতে হবে।' ওদিক হইতে মঞ্জরীর জবাব আসিল।

'টিকিট! কিসের?'

'আগে প্রমিস্ করুন।' মঞ্জরী এমন একটা সুরে বলিল যাহাতে সুস্পষ্ট ইঙ্গিত আছে যে, পরিপূর্ণভাবে এই শর্তে রাজি না হইলে সে মুখটা এদিকে আর না ফিরাইয়া সোজা আশুতোষ বিল্ডিংস্-এ যাইয়া প্রবেশ করিবে।

'না, তা পারি না। আমি ক্যান্‌ভাসার নই। উপযুক্ত ক্ষেত্র ছাড়া টিকিট আমি বিক্রি করি না।' রজত ঈষৎ আপত্তির সুরে কহিল। 'আপনার জন্য কাজে লাগাতে হলে ক্ষেত্রটা আপনি বলতে পারেন, বিবেচনা করে' দেখব।'

দুই চারিটি ছেলে এ-পথ দিয়া যাতায়াত করিতেছিল, তারা সকৌতুকে ওদের দিকে চাহিয়া ফিস্‌ফাস্ করিতে করিতে চলিয়া গেল।

মঞ্জরী কহিল, 'আপনি যান, আমার জন্য আপনাকে কিছুই করতে হবে না। আপনি মস্ত বড়লোক, তা আমি জানি।' বলিয়া হিল্-এর আঘাতে মেঝেতে শব্দ ও দেওয়ালে প্রতিধ্বনি তুলিয়া বন্দুকের গুলির মত সে দ্রুত আশুতোষ বিল্ডিংস্-এ ঢুকিয়া পড়িল।

রজত মনে মনে কহিল—'বাবা! একবার রাগ দেখ না। যেন আমার মাথা কিনে ফেলেছে এলাহাবাদে দিদির প্রতিবেশী ছিল বলে!' এবং এক এক বারে দুই দুই ধাপ করিয়া সিঁড়ি ভাঙিতে লাগিল।

মঞ্জরীর বাবা সত্যব্রত রায় ইণ্ডিয়ান্ অডিট্ অ্যাণ্ড একাউণ্ট সার্ভিসের বড় চাকুরে। কলিকাতায় বদ্‌লি হইয়া আসিবার আগে তিনি এলাহাবাদে ছিলেন। সেখানে রজতের দিদিদের ওঁরা প্রতিবেশী ছিলেন। সেই-খানেই তাদের পরিবারের সঙ্গে শ্রীযুক্ত রায়ের পরিবারের অন্তরঙ্গতা হয়। সেই সম্পর্কে মঞ্জরী প্রথম হইতেই রজতের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা আরম্ভ করে।

রজত বেচারি ব্যাপারটাতে খুব যে প্রীত, তা নয়, কিন্তু তা বলিয়া মধুর রসের কোনও অভাব হয় না। রজত লোকের সঙ্গে যেমন মিশিতে ভাল বাসে, তেমনি আবার খুব বেশি লিপ্ত হওয়া তার স্বভাব নয়। মঞ্জরী এটাকে অনেক সময় রজতের দেমাক্, কখনও বা ঔদাসীন্য এবং কখনও বা অপমান মনে করিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া ওঠে। কিন্তু রজতের তাতে কোনও পরিবর্ত্তনই হয় না, এদিকেও না, ওদিকেও না।

রজত উপরতলায় পৌঁছাইতেই সমর বদনমণ্ডল বিচিত্ররূপ এবং বিবিধ-অর্থদ্যোতক রেখাসমূহে ভরিয়া তুলিয়া দ্রুত কাছে উপস্থিত হইল।

'ও কি ?' রজত জিজ্ঞাসা করিল, 'ও রকম করছিস কেন ?'

'মিসিবাবা কি বল্লেন ?'

'যা ইচ্ছে বলুক, তোর কি—একটা হতভাগা হয়েছিস।' রজত ঘরের দরজা খুলিতে খুলিতে বলিল।

'হতভাগা বই কি,' সমর কহিল, 'হতভাগা না হলে অন্যকে আমিই বা জিজ্ঞাসা করব কেন। আমাকেই অন্যেরা জিজ্ঞাসা করত। শোন্—প্লেটোর কম্যুনিজ্‌মে কি রকম ব্যবস্থা ছিল, শোন্।—'রিপাব্‌লিকে' স্পষ্ট করে লেখা আছে যে, স্ত্রীলোকেরা স্টেটের—'

রজত গম্ভীরস্বরে ধমক দিয়া কহিল, 'এসব কি বাঁদরামি হচ্চে, শুনি। কম্যুনিজ্‌মের যে দিক্‌টা তোকে সবচেয়ে বেশি আকৃষ্ট করেছে, কার্ল মার্কস তা নিশ্চয়ই তোকে শেখান নি। যা, পালা এখন !' বলিয়া রজত ঘরে প্রবেশ করিল।

সমর সঙ্গে সঙ্গে প্রবেশ করিতে করিতে কহিল, 'তেল ?'

'নে না, মানা করচে কে !'

'সাবান ?'

'সাবান দিয়ে কি হবে রে, ভূত ? গায়ে মাখবি ?'

'রাম ! আজ মিটিং আছে না !' সমর সপ্রতিবাদে কহিল। 'গায়ে

সাবান দিলে বুর্জোয়ো-বুর্জোয়ো দেখাবে যে! শুধু গেঞ্জিটা কেচে নেব, ব্যস্! সুগন্ধি ভাল সাবানে ময়লা তাড়াতাড়ি কাটে!'

'তা জানতাম না।'

'কত কিছুই জানিস না; শিখে রাখ্। তবে গুরু-বিদায়টা হাতে হাতে চাই।

'যথা?'

সমর শিশি হইতে বরাবর তালুতে তেল ঢালিয়া লইতে লইতে কহিল, 'প্রক্সিটা আজ দিয়ে দিস্। স্পীচ্টা তৈরি করতে হচ্চে কিনা। ভুলিস্ নে যেন' বলিয়া কেস্-সহ গায়ে দিবার সাবানটা লইয়া সে নির্লিপ্ত-মুখে বাহির হইয়া গেল।

রঞ্জত যখন ক্লাসে গেল তখনও ঘণ্টা পড়ে নাই। প্রথামত মনোরঞ্জন দস্তরায় ওজস্বিনী ভাষায় বক্তৃতা করিতেছিল। গান্ধীটুপি মাথায়, সর্ব্বাঙ্গ খদ্দরে মণ্ডিত, নন্-কোঅপারেশন আন্দোলনের সময় জেলও নাকি খাটিয়াছিল। ক্লাসে আসিয়া রোজই কোনও না কোনও অজুহাতে রাজনীতিপ্রসঙ্গে সে বাঙালি ছাত্রসম্প্রদায়কে তিরস্কার করে; যে-ভীরুতার জন্য ছাত্রসম্প্রদায় দলে দলে আন্দোলনে যোগ দেয় না, তাহাকে সে নির্দ্দয় ব্যঙ্গে জর্জ্জরিত করিয়া তোলে। মনোরঞ্জন বলে—এদেশের যুবকদের গায়ে মাছের রক্ত, শত অন্যায়ে, সহস্র প্ররোচনায়ও তা কখনো উত্তপ্ত হয় না! যে দুর্ব্বার অনুপ্রেরণায় দেশে-দেশান্তরে স্বভূমির স্বাধীনতার জন্য তরুণেরা দীপ্ত লাল রক্ত অকাতরে ঢালিয়া দেয়, যে-প্রেরণায় কামানের শব্দে সঙ্গীত শুনিতে পায়, বিভল্ভারকে বন্ধু মনে করে—যাক্ গে, ওসব নাম আর করবো না—বলা যায় না, কার মনে কি আছে—আমাদের নৈতিক দৈন্য, আমাদের ভীরুতা, বাঙালির স্বভাবসুলভ আরামপ্রিয়তা সে-অনুপ্রেরণায় আমাদের সাড়া দিতে দেয় না। সমস্ত জাতি একটা আধ্যাত্মিক মৃত্যুর সম্মুখীন হয়েচে। স্বাধীনতা-হীনতায় কে বাঁচিতে চায় রে?—কেন, ভারতবর্ষের যুবক-সম্প্রদায়!

মনোরঞ্জনের উৎসাহ এত তীব্র এবং বাঙালি ছাত্রদের রাতারাতি বদ্‌লাইয়া তুলিবার আগ্রহ এত উগ্র এবং বক্তৃতা এত অজস্র যে, ওকে ছেলেরা এখন আর পরিহাসের বস্তু ছাড়া অন্য কিছু মনে করে না; ওর বাগ্মিতায় কৌতুকই বোধ করে। তবে দু'একজনকে সে গোপনে কি-একটা সম্প্রদায়ের কথা বলে। সামান্য দু'একজনকেই অবশ্য বলে। যাদের সে এই গোপনীয় সংবাদ জানায়, তাদের প্রত্যেকেরই কাছে পূর্ব্বাহ্নে প্রতিশ্রুতি আদায় করে যে, এ-বিষয়ে তার সহানুভূতি থাকুক আর না থাকুক, এ-সংবাদ মরিয়া গেলেও অন্য কাহাকেও জানানো চলিবে না। যাদের সে দলে টানিতে চাহিয়াছে, রজত তাহাদের মধ্যে একজন। কিন্তু রজত সম্বন্ধে সে হতাশ হইয়াছে। রজত প্রতিজ্ঞাভঙ্গ করে নাই বটে, কিন্তু মনোরঞ্জন বা তার গোপনীয় সংবাদের উপর সে কোনই শ্রদ্ধা দেখায় নাই। বরঞ্চ যারা মনোরঞ্জনকে বাতুল মনে করে, রজত তাহাদের অগ্রণী। মনোরঞ্জন এখন আর রজতকে ভজাইবার চেষ্টা করে না, তবে নির্জ্জনে দেখা হইলে তাকে সাবধান করিয়া দেয়—ভুলেও যেন সব গোপনীয় প্রকাশ খবর করো না, সর্ব্বনাশ তবে আমাদের একার হবে না।

রজত আসিয়া এক পাশের বেঞ্চে জহির আহাম্মদের পাশে বসিয়া পড়িয়া কহিল, 'এই জহির, ফেজ্ পরিস না কেন রে?'

জহির কিছুটা জায়গা ছাড়িয়া রজতকে বসিতে দিয়া খুশিভরা মুখে কহিল, 'তোমার টিকি কই? টিকি রাখোনা কেন, শুনি?'

'তাও তো বটে!' হাসিয়া রজত কহিল। 'এই বেশ ভাল নয় রে, জহির? আমিও টিকি নিয়ে বাড়াবাড়ি করব না, তুইও ফেজ্ নিয়ে বাড়াবাড়ি করবি না, হিন্দু আর মুসলমানে তফাৎ করে কার সাধ্য! আমরা সাম্প্রদায়িক মিলন ঘটিয়ে আনলুম বলে!'

জহির কহিল, 'আনবই তো, রজত। গরমিল আর কতদিন থাকবে।'

জহির ছেলেটিকে রজতের ভাল লাগে। মুসলমান যে কত ভদ্র হইতে পারে, কত মোলায়েম, কত বন্ধুপ্রিয় হইতে পারে, জহির তাহার দৃষ্টান্ত। শ্যামবর্ণ, দীর্ঘচোখ, সদাহাস্যবিকশিত বদন। বুদ্ধি এবং সৌকুমার্য্য, এবং সর্ব্বোপরি এক বিনয়নম্রতা জহিরের স্বভাবকে এমন আকর্ষণীয় করিয়াছে যে, রজত তাকে একান্ত অন্তরঙ্গ বন্ধু বলিয়া জ্ঞান করে। ফরিদপুর জেলায় জহিরের বাড়ি। ওর বাবা সরকারী উকিল ছিলেন, এখন অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। বাঙলাদেশের বহু সম্ভ্রান্ত-বংশের সহিত ওদের আত্মীয়তা এবং কুটুম্বিতা। ওরই এক দূরসম্পর্কের কাকা জাতীয়তাবাদী মুসলমানের এক বিশিষ্ট নেতা আবদুর রহমান চৌধুরী। বাঙলা লেজিসলেটিভ্ কাউন্সিলে ওর একাধিক আত্মীয় সদস্য; তাদের কারুর সঙ্গে জহিরের রাজনৈতিক মতবাদ খাপ খায়, কারুর মতবাদকে সে নিন্দা করে। জহিরের রাজনৈতিক মতবাদের প্রসারতাই রজতকে সর্ব্বপ্রথম আকৃষ্ট করিয়াছিল। এখন কিন্তু রজত বলে—তুইও বাঙাল, আমিও বাঙাল—ভাবটা এই জন্যই, বুঝলি না জহির।

দুইটা ক্লাস করিবার পর রজত কহিল, 'ক্লাস পালাবি তো চল্, জহির। ম্যাটিনিতে ছবি দেখে আসি, তারপর বিকেলবেলায় ইডেন গার্ডেন বা গঙ্গার ধারে বসে তোর ভাবী বউয়ের কথা শুনব—বলবি তো?'

লজ্জায় কর্ণমূল লাল করিয়া জহির কহিল, 'তার চেয়ে ভালো ছেলে হয়ে বরঞ্চ আমি ক্লাসই করি, রজত।'

'তাতে কি আর বেহেস্তে যেতে পারবি? কার ঘণ্টা এটা খেয়াল আছে? জাহান্নমে পাঠিয়ে দেবে।'

জহির শিহরিয়া উঠিয়া কহিল, 'ওঃ। তবে চল, পালাই। প্রফেসারের নামটা মনে ছিল না।'

দুজনেই ক্লাসের বাহির হইয়া আসিল। প্রফেসার সমাদ্দারেব ঘণ্টায় ক্লাস-পালানো ওদেব নতুন নয়। অসহিষ্ণুতা ছাড়া এব জন্য ওদেব আব বিশেষ কিছু অপবাদ দেওয়া যায় না। পার্সেণ্টেজেব ভয় না থাকিলে সমাদ্দাবকে শূন্য বেঞ্চের কাছে লেক্‌চাব দিতে হইত। শুধু মাত্র বিশ্ববিদ্যালয়েব কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বেশি বকম মাথামাখি থাকায় তাঁর উত্তবোত্তর পদবৃদ্ধি হইতেছে—পডাইবার দক্ষতাব জন্য নয়। সমবেব প্রক্সিব কথা রজতেব মনে পডিয়াছিল, কিন্তু সে ভাবিল, এটা কম্যুনিজ্‌মে অপবিহার্য—ক্ষতিগুলিও সমান ক'বে ভাগ কবে' নিতে হবে বৈ কি! আমি যখন পার্সেণ্টেজ হারাচ্ছি, ও-ও হাবাক্‌, কাউকে ওব কথা বলে গিয়ে কম্যুনিজ্‌মেব প্রিন্সিপ্‌ল্‌ থেকে ওকে আব ভ্রষ্ট কবি কেন। মনে মনে হাসিযা নিচে নামিবাব জন্য জহিবেব সঙ্গে বজত সিঁড়িব দিকে অগ্রসব হইল।

'রজতবাবু!'

রজত ফিবিযা তাকাইল। কহিল, 'দাঁডা, জহিব, আমি এক মিনিটের মধ্যে আসচি।' বলিয়া লেডিজ্‌ কমন্‌-রুমের সমুখে যেখানে মঞ্জবী দাঁড়াইয়াছিল সেদিকে অগ্রসর হইল।

'তখন ও-বকম বীবত্ব দেখাবাব মানে? গায়ে খুব জোর আছে বলে?' মঞ্জবী সাভিমান অভিযোগ কবিল।

'আমি তো আপনাব সম্বন্ধেই তা ভেবেছিলাম। যা বাগ, এবং যেমন হঠাৎ! বলুন, কি কবতে হবে? টিকিট কিনেব? চ্যাবিটি পার্ফর্মেন্সেব নয় তো?' বজত কহিল।

'তাতে দোষটা কি?'

'কিছু নয়, কিছু নয়। নাচ-টাচ কি? তবে অনন্ত আমি যে একটা কিনব, তা নিশ্চিত।'

'কিনতে নয়, বেচে দিতে বলছি।' মঞ্জরী একটু বাঁকা চোখে চাহিয়া কহিল।

রজত কহিল, 'দেখুন, আমার বন্ধুরা বলে, আর যার জন্য সাহায্য করতে বল, পকেটে পয়সা না থাকলেই সাহায্য করতে চেষ্টা করে' ব্যাপারটার প্রতি নৈতিক সহানুভূতি জানাব। কিন্তু অভিজাত-পাড়ার মেয়েরা যে দাতব্য-অভিনয় করে, তাতে সাহায্য করতে বলে আমাদের সহানুভূতির ওপর জুলুম করো না—ওটা ভারি কোমল মনোবৃত্তি—'

'কেন, অন্যায়টা কোথায় ?' মঞ্জরীর কণ্ঠ আক্রমণাত্মক।

'তা বলতে পারব না। এই জন্য বলতে পারব না যে, সেটা সর্ব্বাংশে আমার নিজের মত নয়।—দিন্ না একটা টিকিট ?'

এক মুহূর্ত্তকাল দুই চোখ স্তিমিত করিয়া মঞ্জরী ভাবিল। রজতের এই ঔদাসীন্যে রাগিয়া উঠা উচিত হইবে কিনা, ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারিল না। কহিল—'এটা শখের চ্যারিটি বা ভণ্ডামি নয়। 'নারী-উদ্ধার-আশ্রম' সাহায্য পাওয়ার উপযুক্ত আপনারা মনে করবেন কিনা জানিনা, কিন্তু অত্যাচারীদের হাত থেকে দেশের মেয়েদের বাঁচান, অন্তত আমরা মেয়েরা কর্ত্তব্য মনে করি। ভেবেছিলাম, এতে অন্যদেরও—'

'জহির, শোন্।' রজত জহিরকে হাতছানি দিয়া ডাকিল। 'জহিরের কাছে এই মুহূর্ত্তেই একটা টিকিট বেচে দিচ্ছি।'

জহিরের না আসিয়া উপায় ছিল না। লাজুক জহির এমন রাঙা হইয়া উঠিয়াছে যে, রজতের প্রায় মায়া হইল কেন সে এমন সহসা বেচারিকে এই অনালাপিতা মেয়েটির কাছে আনিয়া বিব্রতের একশেষ করিল। কহিল, 'ইনি জহির আহাম্মদ, আমার প্রিয় বন্ধু।—আর একে তো চিনিসই, জহির। টিকিট কিনবি ? চ্যারিটি পার্ফর্মেন্সের টিকিট ?—'

মঞ্জরীকে বিব্রত নমস্কার করিয়া জহির ঘাড় নাড়িয়া রজতকে জানাইল—বেশ।

'বেশ তো বললি। কিসের জন্য চ্যারিটি জানিস তো ?'

'না।'

'তবু বাজি ? এমন ক্রেতা আর পাবেন না, মিস্ রায় ! জহির সেই ধরণের মুসলমান নয়, যারা মুসলমান গুণ্ডার হাতে হিন্দু মেয়ের নিগ্রহকে দূষণীয় এবং নিন্দনীয় মনে করে না ; ও খাঁটি মুসলমান। দিন্ একটা টিকিট ওকে।'

'আর আপনি নিজে ?' মঞ্জরী শুধাইল।

'আমিও এমন কোনও পাষণ্ড নই , আমাকেও একটা।' মৃদু হাসিয়া রজত বলিল। 'এর পর আর আপনার অভিযোগ থাকতে পারে না।—সর্ব্বনাশ, আড়াইটা। পালিয়ে আয়, জহির। সিনেমায় যাচ্ছি। নমস্কার।'

ট্রামে জহির কহিল, 'মিস্ রায়ের সঙ্গে তোমার ভাবটা বিস্তর ছেলের চক্ষুশূল।'

'কেন ?'

'ঈর্ষ্যা, তা ছাড়া আর কি ?'

'ঈর্ষ্যা কেন ? আমরা কথাবার্ত্তা বলি বলে ? তবে তো তোর সম্বন্ধেও লোকে আমাকে ঈর্ষ্যা করতে পারে, জহির।' রজত গম্ভীর হইয়া কহিল।

'আমি তো মেয়ে নই, বন্ধু। মেয়েদের নিয়েই পৃথিবীতে দ্বন্দ্ব।' জহির কহিল। 'কিন্তু যোগ্যের সঙ্গেই যোগ্যের মিলন হয়, এটাই প্রাকৃতিক বিধান। তোমাকে অভিনন্দন জানাই।'

রজত কহিল, 'তুইও ওদেরই মত একটা উজবুগ। এই জন্যই বুঝি কিসের চ্যারিটি জিজ্ঞেস না করেই টিকিট কিনতে রাজি হয়ে গেলি ?'

'সত্যি বলছ', জহির প্রশ্ন করিল, 'তোমাদের মধ্যে কোনও বোঝা-পড়া হয়নি ?'

'কিছু না', রজত গম্ভীর স্বরে কহিল। 'অন্তত আমার দিক থেকে

নয়—এইটা তুইও মনে রাখিস এবং যারা কাউকে মেয়েদের সঙ্গে আলাপ করতে দেখলেই একটামাত্র সিদ্ধান্ত ছাড়া আর কিছুই করতে পারে না, তাদের বলিস।—হ্যাঁ, তুই টিকিট, এস্প্লানেডের।'

## তিন

'এসো, রজত, এসো।' সত্যানন্দ মিত্রের গৃহিণী সত্যবতী কহিলেন।

রজত অগ্রসর হইয়া কহিল, 'কই, কাকাবাবু এখনও বাড়ি ফেরেন নি? অফিস-ঘরে দেখলুম না তো।'

'চা খেয়ে সন্ধ্যার আগেই কোথায় বেরিয়েচেন, শীগ্গিরই ফিরবেন বলে গেছেন। তুমি বস।' সত্যবতী বড় কৌচটায় নিজের চওড়া দেহটাকে কোনও প্রকারে আঁটাইয়া বসিয়াছিলেন, অতি কষ্টে আড়মোড়া ভাঙিয়া সিধা হইয়া বসিয়া রজতের প্রতি অতিথি-সৎকার দেখাইলেন। কহিলেন, 'আমারও রান্না শেষ হয়ে এল বলে, বেশি রাত হবে না—ওরে গয়ারাম, বাবুর্চ্চিকে একবার জিজ্ঞেস করে আয় তো, পাঁটার মেটেতে সবটা পেঁয়াজ-বাটা দিয়েচে কিনা—কিছু যদি লক্ষ্মীছাড়াটার মনে থাকবে। পনেরো মিনিট পরেই খানা চাই—শুনলি, ওরে গয়ারাম?'—সত্যবতী বেয়ারা গয়ারামের প্রতি হাঁকিতে লাগিলেন।

গয়ারাম ইহার এক বর্ণও শুনিতে পাইল না। মেম-সাহেবের আদেশ এমনি অবিচ্ছিন্নভাবে আসিতে থাকে যে, সে-বেচারী এ-ছুতায় ও-ছুতায় তাহার সান্নিধ্য প্রতিনিয়ত এড়াইয়া চলে।

সত্যবতী কহিলেন, 'ঐঃ, লক্ষ্মীছাড়াটা সুযোগ বুঝে সরে পড়েছে, এদের জ্বালায় যদি একটু সোয়াস্তি পাবে—একটু জিরোতে দিয়েচ, কি এ-তল্লাটেও আর খুঁজে পাবে না।—ওরে ঐঃ, গয়ারাম, শুনছিস? রান্নার কত দেরি একবার দেখে আয়—শুনচিস্, হতভাগা—'

রজত কহিল, 'আমার কিছু তাড়া নেই, কাকীমা। মিছিমিছি আপনি চেঁচিয়ে মরচেন—গয়ারামের আবামে এতে একটুও ব্যাঘাত হবে না।' বলিয়া সত্যবতীর পাশেব সোফাটায় বসিয়া পড়িল। মুহূর্ত্তে সোফাব হাতলে খদ্দবেব কাপড়ে একটা অসমাপ্ত নক্সা আবিষ্কাব কবিয়া সেটাকে সকৌতূহলে উঠাইয়া কহিল, 'এটা কি, কাকীমা? টেবিল ক্লথ্।'

সত্যবতী দক্ষিণ হস্তেব দ্বাবা কপালে মৃদু আঘাত কবিয়া কহিলেন, 'টেবিল ক্লথ্! পোড়া কপাল, ওটাতে মেয়ের ব্লাউজ হবে, তুমি আছ কোথায়! একবাব কাণ্ডখানা দেখ তো—চট দিয়ে তৈরী হবে গায়ে দেবাব ব্লাউজ। কালে কালে আবও কতই দেখব—'

'কাব ব্লাউজ? মন্দ-ব?' বজত সবিস্ময়ে প্রশ্ন করিল।

'তবে আব বলচি কি, বাবা। কত বোঝালুম, এই গবমে চট পবা কি ভদ্রলোকেব সম্ভব। শীত আসুক, তখন না হয় শখ মেটাস্। কিন্তু কে শুনচে তোমাব কথা। যা নতুন ফ্যাশান হবে, তাই করা চাই, তা সে উচিতই হোক আব নাই হোক। কিন্তু চটের মধ্যে ফুল তুলিয়ে নিতে এই বুড়িকেই। বাবুর্চ্চিটাকে যে রান্না বুঝিয়ে দেব, তাব পর্য্যন্ত ফুবসৎ পেলাম না। এখন খেতে পাব, তবেই হয়। ওরে, ও গয়াবাম, শুনচিস্—'

খবরটা শুনিয়া রজত মুচকিয়া হাসিল। এই ফ্যাশানদুবস্ত বিলাসী পরিবাবে খদ্দবেব প্রথম প্রবেশটা এমনই বিস্ময়েব যে, তাব ভাবি কৌতুক বোধ হইল। সন্দেহ রহিল না যে, মেয়ে-ইস্কুলের মাট্রিক-ক্লাসের ছাত্রী শ্রী-মন্দালিকা দেবীব ইহা স্বাদেশিকতাব চাইতে অনুকবণ-প্রিয়তাবই বড় উদাহরণ। তবু স্বদেশী দ্রব্যের প্রতি দেশের লোকেব যে দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে এবং সেই অনুবাগেব ঢেউয়ের আন্দোলন যে এই ধনীর বাড়িব দেউড়ী গলাইয়া প্রবেশ কবিয়াছে, তাহা দেখিয়া তাব যুগপৎ আনন্দ এবং কৌতুক বোধ হইল। কহিল, 'মন্দ কোথায়? পড়চে?'

সত্যবতী কহিলেন, 'তাছাড়া আর কোন্ কাজটা আছে আজকালকার মেয়েদের? পড়া, পড়া আর পড়া। দিন রাত্তির বইয়ের ওপর মুখ গুঁজে পড়ে থেকে চোখ দুটো নষ্ট ক'রে তবে তৃপ্তি।' বলিয়া কণ্ঠস্বর উচ্চগ্রামে তুলিয়া ডাকিলেন—'মন্দা, ও মন্দা, শুনচিস্? তোর রজত-দা এসেচে। ওরে, ও গয়ারাম, দিদিমণিকে একবার ডেকে দে দিকিনি—গয়ারাম, বলি, আচিস্ এ-দেশে—'

দেখা গেল, গয়ারামের উপর রজত বিশেষ ভরসা রাখে না। সে নিজেই হাঁকিতে লাগিল—'মন্দ, ও মন্দ মেয়ে, পড়াশুনো বন্ধ করে একবারটি ওপর থেকে নেমে আসুন তো শ্রীমন্দালিকা দেবী—' দরজার কাছে দাঁড়াইয়া উপরতলায় যাইবার সিঁড়ি দিয়া রজত প্রচণ্ড হাঁক পাঠাইতে লাগিল। রজত এ-বাড়ির ছেলের মত, এবং আদব-কায়দা তার কোনও দিনই ধাতে সয় না। অনায়াসেই সে ফ্যাশানবিরুদ্ধ চেঁচামেচি করিতে পারে। কিন্তু তবু মন্দালিকার কোনও সাড়া পাওয়া গেল না।

সত্যবতী হতাশ হইয়া ডাকিলেন, 'ওরে গয়ারাম, গেলি কোথায়?'

'গয়ারামকে পাওয়ার চেয়ে মন্দটাকে ধরে আনাই সহজ হবে, কাকীমা।' রজত কহিল। 'আপনি আর বেচারিকে মিথ্যে ডাকাডাকি করবেন না, শ্রীমতীর চুলের মুঠি ধরে আমিই হাজির করে দিচ্ছি।' বলিয়া সে বীরের ভঙ্গিতে মন্দালিকার সন্ধানে বাহির হইল। সত্যবতী মৃদু একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া আড়মোড়া ভাঙিলেন এবং আবার অধ্যবসায়-সহকারে ডাকিলেন—'ওরে, গয়ারাম, শুনচিস্, বাবুর্চ্চিকে একবার ডাক। বাতের ব্যথাটা জোর করেচে, আর এই সুযোগে হতভাগা বাবুর্চ্চি কি দিয়ে কি বেঁধে বসে আছে, ভগবান জানেন—'

রজত হাঁকিতে হাঁকিতে উপরতলায় যাইবার সিঁড়ির কাছে অগ্রসর হইল। দারোয়ান ভজন সিং অফিস-ঘরের আলো বন্ধ করিয়া বাহিরের

বারান্দা দিয়া খড়ম পায়ে 'খটাস্ খটাস্ শব্দে দেউড়ির দিকে নিজ ঘরে যাইবার উদ্যোগ করিতেছিল, রজতের চেঁচামেচি শুনিয়া কৌতুক করিয়া কহিল—'ক্যায়া হুয়া, হুজুর? ডাকু গিড়া ক্যায়া?'

এ-বাড়ির চাকর-দাসী সকলেই রজতকে পছন্দ করে; এদের সবার সঙ্গেই রজতের আলাপ-আলোচনা, এমন কি কখনও রসিকতা পর্যন্ত চলে। এই সব অধীনস্থদের প্রতি শহরের ধনী পরিবারগুলিতে যে ঔদাসীন্য এবং অবজ্ঞা প্রদর্শিত হয়, তাহা রজতকে বড় ব্যথা দেয়। মানুষ মানুষকে এত দূর, এত অবহেলার কি করিয়া যে মনে করিতে পারে, সে ভাবিয়াই পায় না। রজত আশৈশব দেখিয়াছে, গ্রামের গৃহস্থালিতে অধীনস্থদেরও একটা বিশেষ স্থান আছে, তাহাদের সঙ্গে তাহার সম্প্রীতির কথা রজত এখনও বিস্মৃত হয় নাই। ভজন সিংকে কহিল—'ডাকু আনেসে ভি তুম্‌হারা ঘরকী লড়কী আওয়াজ নহী দেতী, ভজন সিং।·· আচ্ছা হ্যায়?'

'হুজুর।'

'আজকাল কিত্‌না কঁচ্চা দুধ পীতা হ্যায়?'

'দুধ কিধর মিলেগা, হুজুর. গরিব আদ্‌মী।'

হাসিয়া রজত অগ্রসর হইল।

'মন্দা! ও মন্দ! কোথায় গেলি, মেয়েটা। খুব তামাশা হচ্চে, না? পিঠটাকে মায়া কর তো শীগ্‌গির সাড়া দাও।'

উপরতলায় শুইবার কোণের ঘরটায় অবশেষে মন্দালিকাকে আবিষ্কার করা গেল। স-চিৎকারে পর্দা সরাইয়া ঘরে প্রবেশ করিতেই রজত আরেকটুকু হইলে মন্দালিকার উপরে হুম্‌ড়ি খাইয়া পড়িত। সাম্‌লাইয়া লইয়া কৃত্রিম ক্রোধের ভঙ্গিতে কহিল, 'ডাকচি, শুনতে পাস্ না? গলাটাকে একেবারে জখম করে ফেলেচি, আর এইখানে চুপটি করে দাঁড়িয়ে মজা দেখা হচ্ছে?'

মন্দালিকা খুকির যোগ্য স্বরে জবাব দিল—'বাঃ রে, পড়ছিলাম না বুঝি ?'

'পড়লে কি একটা জবাবও দেওয়া যা না। আমরা কি আব কখনো পড়ি ? আমাব আজ এখানে নেমন্তন গো, জানো ?'

মন্দালিকা কহিল, 'বাঃ, জানিনে বুঝি।'

'তবে আব পড়ছিলে কেন ?'

'বা রে, তাতে কি ?'

'তাতে পদ্মার সাইক্লোন, সুতরাং অনধ্যায়। কবে কবে অনধ্যায় হয়, জানিস্ ? মনুসংহিতায় লেখা আছে। তুমি যদি বসে পড়া কবো, তবে আমি কবি কি, শুনি ? আমি বুঝি শুধু খেতেই আসি ? হস্টেলে বুঝি আব আমাদের বান্না হয় না ? চমৎকাব বান্না হয়। যা স্বাদ !'

মন্দালিকা সামান্য দুষ্টুমির স্বরে কহিল, 'খুব স্বাদ ?'

'তা আব নয়, চমৎকাব সব স্বাদ ! আলু খাচ্চ, মনে হচ্চে গাজব ! সিম্ খাচ্চ, মনে হচ্চে পালং শাক ! মাছ খাচ্চ, মনে হচ্চে পাঁপর ভাজা !'

মন্দালিকা হি-হি করিয়া হাসিয়া উঠিয়া মুখে আঁচল গুঁজিয়া দিল। কহিল—'ওঃ, এমন ! তবে আব এলেন কেন ! এখানে খেতে যে বড কষ্ট হবে।'

বজত কহিল, 'উপায় কি, তোব গানেব পবীক্ষা নিতে হবে তো ! তা কি মহাবাণীকে সাবা বাড়িতে খুঁজে পাওয়া যাচ্চে। কি কি নতুন গান শিখেচিস, শোনা। তাব উপব পাস-ফেল নির্ভব কবচে !'

মন্দালিকা আপত্তিব ভঙ্গি কবিয়া কহিল, 'তা বৈ কি।...আমার গলাটা একটুও আজ ভাল নেই। যা শর্দ্দি হয়েচে—'

বজত হাসিয়া কহিল, 'একেবারেই ইস্কুলেব মেয়ে ! না সাধ্লে অবশ্য গান গাওয়া উচিত নয়, কিন্তু রোজ বোজ একই কারণ দেখালে

সাধ্‌বে কে রে, বোকা?' 'বলিয়া মন্দালিকার একটা হাত ধরিয়া টানিয়া কহিল—'আয়, বসবার ঘরে এসে একটু নাকী সুর শুনিয়ে যা—আবার দুষ্টুমি—হাঁ, নাকী সুরই আমার পছন্দ—'

মন্দালিকার প্রথম গানটা সমাপ্ত হওয়া মাত্র সত্যবতী বাতের ব্যথা উপেক্ষা করিয়া উঠিয়া পড়িলেন। কহিলেন, 'তোমরা বসে গল্পগুজব কর, আমি যাই, একবার হতভাগা বাবুর্চিটাকে দেখে আসি। বাতের ব্যথায় নড়তে পারি নে, এই সুযোগে লক্ষ্মীছাড়া আদ্ধেক জিনিষ সরিয়ে ফেলে, আর বাকি আদ্ধেকে অখাদ্য বাঁধে। কী যে করব হতভাগাদের নিয়ে। ওরে, ও গয়ারাম—' বলিয়া খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে মেদবহুল কলেবরটিকে কোন প্রকারে বহন করিয়া তিনি প্রস্থান করিলেন, এবং রসুইখানায় যাইবার দুশ্চেষ্টা না করিয়া বারান্দার অন্যপ্রান্তে এক বেতের চেয়ারে গিয়া বসিয়া পড়িলেন। অত্যধিক পরিশ্রমে হাঁপাইতে লাগিলেন।

'বড় যে খদ্দর পরবার শখ হয়েছে।'

'হয়েচেই তো।'

'ড্রেসিং টেবিলের স্নো-ক্রিম্‌গুলি কোথাকার তৈরি শুনি?'

'ওগুলি তো ওষুধ।'

'বেশ, বেশ।—অন্তত, স্বদেশী গান তো গাওয়া উচিত।' রজত কহিল, 'তাতে বোঝা যায়, মনটা স্বদেশী কিনা।'

'বাঃ রে, বিদেশী গান গাইলাম বুঝি?' মন্দালিকা সপ্রতিবাদে কহিল।

'একটা শুনে তা কথনও বিচার করা চলে?' রজত কৃত্রিম গাম্ভীর্যের সঙ্গে কহিল। 'আরও দু'পাঁচটা শুনি, তবেই যদি এ-সম্বন্ধে কোনও সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারি। নাও, আরেকটা ধরো—'

মুচ্‌কিয়া হাসিয়া মন্দালিকা কহিল—'যত সব আপনার চালাকি—সব

বুঝতে পারি। আরেকটা করেই কিন্তু আমি 'পালাব, বলে রাখছি।'

রজত চোখ উঠাইয়া কহিল, 'কেন ঠাকরুণ, কি কাজটা আপনার ?'

'বাঃ রে, কাজ আছে না ? কত কাজ।' বলিয়া মন্দালিকা অর্গ্যানের তলদেশে পদাঘাত করিয়া সুর উঠাইল—গ্যাঃ গ্যাং গ্যাং এবং অচিরে গানটা সমাপ্ত করিয়া এক ছুটে বাহির হইয়া গেল, অতিথির অনুমতির অপেক্ষামাত্র করিল না।

রজত চিৎকার করিয়া কহিল—'দাঁড়া, তোর দুষ্টুমিটা বার করছি।'

রজত জানে না, মন্দালিকা ওকে লজ্জা করিতে আরম্ভ করিয়াছে। এটা অত্যন্ত অল্প দিনের ব্যাপার। রজতের কাছে মন্দালিকার কোনও লজ্জাই ছিল না। বোনের মত সহজ স্বাধীনতায় রজতের সঙ্গে সে কখনও কৌতুক, কখনও দৌরাত্ম্য এবং কখনও বা অভিমান করিত। এমন সময় সহসা তার দৃষ্টিভঙ্গি বিস্ময়কর-রূপে বদ্‌লাইয়া গেল। মন্দালিকা শুনিতে পাইল, ওর মা ওর বাবাকে বলিতেছেন—'রজতকে একবার বলেই দেখ না, মন্দার সঙ্গে তো কত হাসি খেলা করে, অপছন্দ হবে কেন ?' গম্ভীরস্বরে সত্যানন্দ কি বলিলেন, সে কি অনুমোদন, না তার বিপরীত, তাহা মন্দালিকা ঠিক শুনিতে পায় নাই ; কিন্তু তখন হইতেই এক বিস্ময়কর পরিবর্ত্তন তাহার মধ্যে দেখা দিল, এবং তার ফল এই হইল যে, রজতকে আজকাল সে লজ্জা করিতে আরম্ভ করিয়াছে।

রাতের আহারের পর সত্যানন্দ রজতকে অফিস-ঘরে লইয়া গেলেন এবং এস্টেট-সংক্রান্ত কতগুলি বিষয়ে তার সঙ্গে পরামর্শ করিয়া কোটাল-নগরে ম্যানেজারবাবুর কাছে পাঠাইবার জন্য কিছু আদেশ-পত্রের খস্‌ড়া তৈরি করিলেন। বিশেষ করিয়া এই কাজের জন্যই রজতকে আজ তিনি নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। এস্টেটের পরিচালনায় তার পরামর্শ গ্রহণের প্রয়োজন হইলেই রাত্রে

রজতের এ-বাড়িতে নিমন্ত্রণ থাকে, একমাত্র রাত্রেই সত্যানন্দের সময় হয়। তারপর চিঠিপত্র প্রস্তুত করিয়া তিনি তাঁর ক্লার্কের হাতে সেগুলি সই করাইবার জন্য রজতের নিকট হস্টেলে পাঠাইয়া দেন। রজত এই বৃদ্ধের মহানুভবতায় মুগ্ধ হইয়া যাইত। রজত কহিত—'কাকাবাবু, আপনি যা ভাল বোঝেন, তার চাইতে কি আমি কিছু বেশি বুঝব? আমার পরামর্শ এমন করে নেওয়ার কি প্রয়োজন?' বৃদ্ধ সত্যানন্দ মৃদু হাসিয়া কহিতেন—'শিখতে হয়, সবই শিখতে হয়, বাবা। না শিখলে চলবে কেন!'

রজত যখন হস্টেলে ফিরিল, তখন রাত দশটা বাজিয়া গেছে। পাঁচতলার খোলা চত্বরটায় তখন রীতিমত এক বিতর্ক-সভা বসিয়া গেছে এবং প্রথামত তার সর্ব্বপ্রধান ও সর্ব্বাধিক বাঙ্ময় বক্তা সমর ভট্টাচার্য বক্তৃতা দিতেছিল:—'হ্যাঁ, আমি বিশ্বাস করি, আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করি যে, পোলিটিক্যাল স্টেট্ একটা ধাপ্পাবাজী। সমাজে যারা প্রকৃত শ্রমিক, ধন যারা সত্যি সত্যি নিজ হাতে উৎপাদন করে, শুধু তারাই সমাজ নিয়ন্ত্রণের অধিকারী। যাতে তাদের মঙ্গল হয়, সমাজ-ব্যবস্থা শুধু তেমনি হওয়া উচিত। তোমাদের স্টেটের আসল রূপটি জান?—ওটা হচ্ছে বুর্জ্জোয়া-সম্প্রদায়ের একটা আখ্ড়া, তাদের অত্যাচারের কলকাঠি। তাই আমি শুধুমাত্র সোশ্যালিজম্-এ সন্তুষ্ট নই, আমি অন্ততপক্ষে সিণ্ডিক্যালিজম্ চাই। আমি বলি—'

সুনন্দ বাধা দিয়া কহিল, 'স্বাধীতায় যদি সত্যিকারের আস্থাবান হও, তবে অন্তত সিণ্ডিক্যালিজমের এক-চোখোমিটা ভুলে যেয়োনা। সিণ্ডিক্যালিজম্ তো সর্ব্বসাধারণের ওপর শ্রমিক এবং ট্রেড্-য়ুনিয়নের অত্যাচার! গোঁড়ামিটা তোমার একটু কম তীব্র হলে অন্তত গিল্ড্

সোশ্যালিজম্ পছন্দ করতে—কেননা, তাতে পোলিটিক্যাল স্টেট্ এবং গিল্ড্ দুই-ই নিজ নিজ ক্ষেত্রে স্বপ্রধান।'

'আমরা কারুর পরাধীনতা চাই না' উত্তেজিত হইয়া সমর সচিৎকারে কহিতে লাগিল। 'আমরা পরিপূর্ণ স্বাধীনতায় বিশ্বাসী। লেনিন্ পর্যন্ত বিশ্বাস করতেন যে, প্রলিটারিয়েটদের ডিক্টেটরশিপ্-এর প্রয়োজনটা মিটে গেলেই স্টেট্-প্রথাকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করে ফেলা হবে। ইতিহাসে এতাবৎ-কাল গবর্ণমেণ্টের প্রধান কাজ কি হয়েছে, জান? মানুষের পরস্পরের উপর অন্যায় অব্যাহত রাখতে স্টেট্ চিরকাল—'

'পূর্ণানন্দ কোথায়?' রজত অকস্মাৎ পিছন হইতে বক্তৃতায় বাধা দিয়া কহিল। 'বায়ুমণ্ডলে প্রমত্ত ঝঞ্ঝার সূচনা—বাঁশি না হলে এ-ঝড় থামায় কার সাধ্য! ওরে সমর, তোর ওরেটরি একটু থামাবি?'

'আমাদের আদর্শ হচ্ছে—এনার্কিজ্ম্!' সমর ভট্চাজ না-দমিয়া কহিতে লাগিল। 'মানুষ পরস্পরের সঙ্গে, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে শুধু সৌহৃদ্যের আনন্দে, অনাবিল আত্মীয়তাবোধে মিলিত হবে—মানুষের আত্মার স্বাধীনতাকে কোনও গবর্ণমেণ্টের জবরদস্তি, কোনও আইনের বন্ধন, কোনও কৃত্রিম নিষেধ খর্ব করতে পারবে না; মানুষ সম্পূর্ণভাবে বিকশিত হবার সুযোগ পাবে। প্রিন্স্ ক্রপট্কিন্ বলেছেন—'

'শুনচিস, সমর,' রজত মুচকিয়া হাসিয়া কহিল, 'এত হাঙ্গামা করে নেমন্তন্ন থেকে বাঁচিয়ে খাবারগুলি তবে কি আমি শুধুশুধুই নিয়ে এলাম? তোরা দেখি সবাই নির্লোভ পুরুষ হয়ে উঠেছিস।' বলিয়া যে-পুঁটলিটাতে জমিদারি-সংক্রান্ত কতকগুলি কাগজপত্র বাঁধিয়া বগলে চাপিয়া লইয়া আসিয়াছিল, তাহাই ইঙ্গিতপূর্ণভাবে নাড়িয়া দেখাইল। 'আসবি যদি, তবে তাড়াতাড়ি আয়, বড় ঘুম পেয়েছে, এক্ষুণি গিয়ে শুয়ে পড়ব।' বলিয়া বাণ্ডিলটা আবার নাড়িয়া দেখাইয়া রজত দ্রুত প্রস্থান করিল।

সময় লুব্ধভাবে তাকাইয়া দেখিতেছিল। কহিল—'দাঁড়া, এই এইটুকু সেরেই আসচি। গবর্ণমেণ্ট লোককে কতটা অধঃপাতিত করতে পারে, জানিস্? প্রিন্স্ ক্রপট্‌কিন্ বলেছেন—দিস্ অব্ দ্যাট্ ডেস্‌পিকেবল্ মিনিস্টার মাইট্ হ্যাভ্ বিন্ অ্যান্ একসেলেণ্ট ম্যান্ ইফ্ পাওয়ার হ্যাড্ নট্ বিন্ গিভেন্ টু হিম্—রঞ্জত দাঁড়া, এই এলাম, বন্ধ করিস্ না—কিন্তু তোমাদের কংগ্রেসের কার্য্যাবলী আমি কিছুতেই অনুমোদন করতে পারি না, কিছুতেই নয়। রঞ্জত—'

ইহার কয়দিন পরে রঞ্জত আবার সত্যানন্দের বাড়ি যাইবার জন্য বাস্-এ চাপিয়াছে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই অত্যন্ত মৃদুস্বরে পিছনের আসন হইতে ডাক আসিল, 'রঞ্জতবাবু?'

ঘাড় ফিরাইয়া দেখিয়া রঞ্জত কহিল—'ওঃ, আপনি। দেখতে পাইনি তো আগে। বাড়ি ফিরছেন?'

উত্তরে মঞ্জরী সম্মতি জানাইয়া রঞ্জতকে তার আসনের অপরার্দ্ধে আসিয়া বসিতে আহ্বান করিল। রঞ্জত এ-আমন্ত্রণকে মোটেই কোনও সৌভাগ্য মনে করে না, কিন্তু মঞ্জরীকে হতাশ করিতেও তার দ্বিধা হইল। চলমান বাস্‌টার গতিতে টলিয়া টলিয়া মঞ্জরীর পাশে যাইয়া বসিয়া পড়িয়া কহিল, 'আমার বাড়ি যদি কলেজ থেকে দূরে হতো, তবে এমনি একরাশ বই নিয়ে বাস্-এর ঝাঁকুনি খেতে খেতে রোজ মজা করে কলেজে আসতে যেতে পারতুম। কলেজের গায়েই বাস করি, কলেজ যাত্রাটাকে কিছু গৌরবজনকই মনে হয় না।'

'ব্যঙ্গ করা হচ্ছে?' মঞ্জরী চোখ বাঁকা করিয়া কহিল।

'মোটেই নয়।' রঞ্জত প্রতিবাদ করিল। 'কোনও কথাই কি অকপটে বলতে পারব না? সত্যিই বলচি, জগতের সমুখ দিয়ে বই বগলে কলেজে

আসাটা আমি অত্যন্ত গৌরবজনক মনে করি। আমি ছাত্র, আমি জ্ঞানের সন্ধানী, এই কথাটা বিশ্বকে জানান কি কম শ্লাঘার?'

'কোথায় যাচ্চেন?'

'যদি বলি কালীঘাটের মা কালীকে দেখতে, বিশ্বাস করবেন?'

'কিছুমাত্র না।'

'নাই করলেন।' রজত হাসিয়া কহিল। 'শেষ-গন্তব্য টালিগঞ্জ।'

'টালিগঞ্জ। কেন?' কৌতূহল দমন করিতে না পারিয়া মঞ্জরী প্রশ্ন করিল।

'যদি বলি, দূর দেশ ভ্রমণ করতে, তবে কি বিশ্বাস করতে পারবেন? কিন্তু কথাটা সত্য। একই রকম পিচ-বাঁধান রাস্তা, রেলিং-ঘেরা পার্ক আর ইঁটের স্তূপ দেখতে দেখতে আমি হাঁপিয়ে উঠি। একটু দম-সংগ্রহ করে আনবার জন্য আমাকে মাঝে মাঝেই পাড়াগাঁয়ে যেতে হয়। দমদমা, দক্ষিণেশ্বর বা টালিগঞ্জে পল্লী খুঁজে নেওয়া সহজ, এবং পথও দুর্গম নয়।—অমন অবাক্ হ'য়ে কি দেখচেন, যে গ্রাম্য ছিলাম সে গ্রাম্যই রয়ে গিয়েচি, কিছুই আর উন্নতি হলো না।'

বাস্‌টা এতক্ষণে ধর্মতলার মোড়ে আসিয়াছে। স্থানটা আবিষ্কার করিয়া মঞ্জরী সহসা কহিল—'বড় তেষ্টা পেয়েছে। যদি কেউ একটু সরবং খাওয়াতো উপকৃত হতাম।'

'বেশ তো।' বিব্রতভাবে রজত কহিল।

মঞ্জরী অবিলম্বে উঠিয়া দাঁড়াইল। চলমান বাসটাকে হাঁকডাক করিয়া থামাইল। কহিল, 'তবে আসুন।'

অনেকটা পর্যন্ত রজত বিরক্ত বোধ করে নাই, বা মঞ্জরীর ব্যবহার তার কাছে বাড়াবাড়ি বা ক্লেশকর মনে হয় নাই। কিন্তু সাহেবী হোটেলে লিমন্'স্কোয়াস্ পান শেষ করিয়া বাহিরে আসিয়া মঞ্জরী যখন ফরমাস করিল, 'চলুন না, নিউ-মার্কেটটা ঘুরে আসি। বিস্তর জিনিষ কেনবার

আছে।'—তখন রজত সত্যই কিছুটা অসন্তুষ্ট হইয়া উঠিল। ভাবিল, আচ্ছা মেয়ে তো! উনি যাবেন রাজ্যের লেস, জর্জ্জেট, অর্গেণ্ডি কিনতে, আমাকে ওঁর সঙ্গে গাধা-বোটের মতো খাম্‌খা ঘুরে মরতে হবে। এ কি আব্দার!

কিন্তু যাইতে হইল এবং সম্পূর্ণ দেড় ঘণ্টাকাল মঞ্জরীর নির্ব্বাক সাথী হিসাবে দোকান হইতে দোকানান্তরে ওর পছন্দের যুদ্ধ দেখিয়া বেড়াইতে হইল। অবশেষে কেনা সমাপ্ত করিয়া মঞ্জরী দুষ্ট হাসিয়া কটাক্ষ হানিয়া কহিল, 'খুব রেগে উঠেচেন তো? একটু দেরি হয়ে গেল, কি করব। কিনতে এলে এমন একটু হয়ই। কিন্তু বিনা পারিশ্রমিকে খাটাই না। বাড়ি চলুন, ভাল চা খাওয়াব। মা তো কতদিন আপনার কথা বলেন—একদিনও তো গেলেন না—'

রজত গম্ভীর হইয়া কহিল, 'আজকে নয়।'

'তবে কবে বলুন?'

'অন্য একদিন। আপনার কেনা সব শেষ হয়েচে তো? নমস্কার।'

মঞ্জরী মৃদু একটা নিঃশ্বাস চাপিয়া ট্রামে চড়িল।

## চার

ইহার কয়মাস পরেই ভারতবর্ষের রাজনৈতিক আকাশে বিষম দুর্য্যোগের সূত্রপাত হইল।

মহাত্মা গান্ধী সঙ্গে পঞ্চাশজন অহিংস স্বেচ্ছাসৈনিক লইয়া তাঁহার ইতিহাস-বিখ্যাত ডাণ্ডী যাত্রা করিলেন, ভারতবর্ষে আইন অমান্য আন্দোলন আরম্ভ হইল। ভাইস্‌রয় লর্ড আরউইন্‌ ব্যাপারটাকে সামান্য মনে করিয়াছিলেন। তাঁর নীতি দেখিয়া মনে হইল, এ-আন্দোলন অতি সহজে থামিয়া যাইবে বলিয়াই তাঁর বিশ্বাস। কিন্তু দেখিতে দেখিতে

দাবানলের মতন এই স্বাধীনতা-আন্দোলন কুমারিকা হইতে হিন্দুকুশ, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ হইতে বর্মা পর্য্যন্ত ছড়াইয়া পড়িল। আসমুদ্র হিমাচল 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনিতে মুখর হইল। উত্তেজনার, উন্মাদনার, আত্মত্যাগের সুমহান্ আড়ম্বরের অবধি রহিল না। সমগ্র জগৎ ভারতবর্ষের এই অভিনব যুদ্ধের দিকে বিস্মিত সম্ভ্রম-দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল।

আইন-বিরোধিতার তীব্রতা প্রকাশ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই কিন্তু ইংরেজের গভর্ণমেণ্ট সজাগ হইয়া উঠিল। আন্দোলন দাবাইয়া দিবার চেষ্টার ত্রুটি রহিল না। ব্যক্তি-স্বাধীনতা সঙ্কীর্ণতম হইয়া উঠিল, সংবাদ-পত্রের স্বাধীনতার বিশেষ কিছু বজায় রহিল না, আন্দোলনের সঙ্গে লড়িবার জন্য অর্ডিনান্সের পর অর্ডিনান্স প্রবর্ত্তিত হইল। কংগ্রেসের নতুন কার্য্যাবলী, গভর্ণমেণ্টের নতুন দমনাস্ত্র, নতুন উত্তেজনার এবং নতুন সংগ্রামের বিবরণ সমস্ত দেশকে সচকিত করিয়া রাখিল।

ছাত্র-সমাজে উত্তেজনার অন্ত নাই। খবরের কাগজে প্রতিদিন নতুন নতুন রোমাঞ্চকর বিবরণ বাহির হইতেছে। কংগ্রেসের প্রতি যাদের বিশেষ কোনও আনুগত্য ছিল না, এমন বহু ছাত্র বিক্ষোভের সৃষ্টি হওয়ার পর কংগ্রেসের সভ্য হইল—সমস্ত ভারতবর্ষ জুড়িয়া এক বিরাট মন্থন শুরু হইয়া গেল।

এই মন্থনের প্রতিধ্বনিটা কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা তীব্র হইয়া বাজিতে লাগিল কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিক্স্‌থ্ ইয়ারের ছাত্র মনোরঞ্জন দত্তরায়ের কণ্ঠে। তার সচরাচরের জ্বালাময়ী বক্তৃতা বিষ উদ্গীরণ করিতে লাগিল। একমাত্র কণ্ঠ দিয়াই সে যেন সমগ্র তন্দ্রাচ্ছন্ন ছাত্রসমাজকে জাগাইয়া তুলিয়া তবে ছাড়িবে। যেন হাত ধরিয়া সজোরে টানিয়া লইয়া ভীরু এবং অনিচ্ছুকদের জেলের দরজার নিকট আগাইয়া দিবে, তবে ক্ষান্ত হইবে। 'স্বাধীনতা, স্বাধীনতা', সে সচিৎকারে বারম্বার উচ্চারণ করিতে

থাকে, 'সবার উর্দ্ধে স্বাধীনতা! এড়ুকেশান্ ক্যান্ ওয়েট, স্বরাজ ক্যান্ নট।' ইতিমধ্যে রজতকে নিরালায় পাইয়া সে তাদের সেই সমিতির কথাটা পুনরায় উল্লেখ করিয়াছিল। কিন্তু রজত এবারেও কোনও উৎসাহ দেখায় নাই। ক্রুদ্ধ হইয়া মনোরঞ্জন বলিয়াছে—'চারদিকে এই অবর্ণনীয় অত্যাচার, এই অমানুষিক জবরদস্তি, এই কুৎসিত বিভৎসতা, তবু তোমার বিবেক জাগল না—ধিক্!'

স্বাধীনতা-আন্দোলনের প্রতি একদল মুসলমানের ঔদাসীন্য এবং বিরুদ্ধাচার রজতকে বড় পীড়া দিতেছিল। স্বাধীনতা তো সকলেরই সমান কাম্য, ইহাতে সাম্প্রদায়িকতার প্রশ্ন ওঠে কেন। স্বাধীনতার জন্য যখন সমগ্র দেশ ব্যাপিয়া এমন একটা তীব্র আন্দোলনের সৃষ্টি হইয়াছে, তখন তাকে সাহায্য করা জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে সকল ভারতবাসীরই কর্ত্তব্য নয় কি? অথচ শক্তিশালী একদল মুসলমান নেতা যে ইহার বিরুদ্ধাচরণ করিতেছে এবং মুসলমান-সম্প্রদায়ের যে একটা অনগণ্য অংশ স্বাধীনতা-আন্দোলনকে হিন্দুর ব্যাপার মনে করিয়া ঔদাসীন্য প্রদর্শন করিতেছে, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। রজত মুসলমান-সম্প্রদায়কে ভালবাসে; তাই তার আদর্শবাদ বড় আঘাত পাইল। কাজেই রবিবার দুপুরে জহির আসিয়া যখন তার ঘরে প্রবেশ করিল তখন রজত তার স্বভাবের ব্যতিক্রম করিয়া জহিরের সঙ্গে তর্কে প্রবৃত্ত হইল।

'মুসলমান-সম্প্রদায় এমন ঔদাসীন্য দেখাচ্ছে কেন, বলতে পারিস, জহির? দেশটা কি হিন্দুদের একলার?'

স্বাধীনতা-আন্দোলনে যারা বাধা দেয় এবং স্বাধীনতা বিষয়ে যারা উদাসীন, তাহাদের উভয় দলেরই প্রতি জহিরের বিরাগও প্রচুর, তার নিজ সম্প্রদায়ের এক বড় অংশের এই ব্যবহারে সে মর্ম্মাহত ও তার হিন্দু বন্ধুদের কাছে নিজেকেই প্রায় অপরাধী বোধ করিত। তবু সে কহিল—

'মুসলমান-সম্প্রদায় হয়তো সন্দেহ করে যে, এই আন্দোলন মুসলমানদের স্বার্থের অনুকূল নয়, কংগ্রেসের প্রকৃত উদ্দেশ্য হিন্দুর স্বার্থ-বৃদ্ধি, এতে মুসলমানের লাভ কিছুই নেই।'

'বেশ, তাই যদি হয়, তবে মুসলমানেরা দলে দলে এসে কংগ্রেসে যোগ দিক না কেন! কংগ্রেস তো ক্লোজ্‌ড্‌ অ্যাসোসিয়েশান্‌ নয়, সভ্য হওয়ার পক্ষে কারুরই বাধা নেই। মুসলমান-সম্প্রদায় যদি মনে করে, কংগ্রেস হিন্দুস্বার্থে চালিত হচ্চে, তবে দলে দলে এসে কংগ্রেসের রূপ তারা বদ্‌লে দিক, কংগ্রেসের নীতিকে তারা প্রভাবান্বিত করুক। ধর্ম্মের সঙ্গে পলিটিক্‌স এমন করে জড়িয়ে স্বাধীনতা-আন্দোলনের বিরোধিতা করা কি উচিত হচ্চে, জহির?'

'হচ্চে না,' জহির বালিশটায় কনুইয়ের ভর রাখিয়া বলিল। 'কিন্তু সন্দেহের অবকাশ কি হিন্দুরাই সৃষ্টি করে নি, বন্ধু। তুমি রাগ করো না, স্পষ্ট করে মনের কথা আমাকে বলতে দাও। এতকাল ধরে বাংলা-দেশে মুসলমানেরা কোন্‌ স্থান অধিকার করে ছিল, একবার ভেবে দেখো? সব চেয়ে নিচু স্থান ছিল তাদের জন্য বাঁধা। তারা শিক্ষা পায় নি, সুযোগ পায় নি, বড় এবং বিকশিত হবার অবকাশ তাদের মধ্যে অল্পজনই পেয়েচে। অথচ শিক্ষা-দীক্ষায়, আভিজাত্য এবং সংস্কৃতিতে, ধনে-দৌলতে সহস্রগুণ অধিক উন্নত হিন্দুসম্প্রদায় তাদের উন্নতির জন্য কতটুকু সাহায্য করেচে? একটা সমগ্র সম্প্রদায়কে তোমরা ভুলে ছিলে, এতকাল ধরে তোমরা তাদের শুধু অবহেলাই করে এসেচ। চাষা আর বাবুর্চ্চি, লাঠিয়াল আর চাপরাশি, এই তো ছিল তাদের বিকশিত হওয়ার ক্ষেত্র। তাই আজ যখন সমগ্র সম্প্রদায়টার মধ্যে জাগরণের সাড়া পড়েছে, তখন তোমাদের প্রতি শুধু সন্দেহ নয়, আক্রোশও যদি তীব্র হয়ে উঠে, তবে মুসলমানদের এই আত্মঘাতী ব্যবহারে দুঃখিত হ'তে পারি, কিন্তু বিস্মিত হ'তে পারি না।

যেমন ইংরেজের উপর তোমাদের বর্ত্তমান আক্রোশটা একটা স্বাভাবিক বাড়াবাড়ি, হিন্দুদের ওপর মুসলমানদের আক্রোশটাও অনেকটা সে রকম...'

রজত কতক্ষণ চুপ করিয়া ভাবিল। তারপর কহিল—'অন্ত্যজদের প্রতি উচ্চবর্ণ হিন্দুদের এই ঔদাসীন্যই বল আর অত্যাচারই বল, অত্যন্ত নীচ এবং আত্মঘাতী, এতে সন্দেহ নেই। কিন্তু শুধুমাত্র মুসলমান-সম্প্রদায়ের প্রতি প্রয়োগ করবার জন্যই তার সৃষ্টি হয় নি, হিন্দুসমাজে অনুন্নতদের উপর তা সমান নির্ম্মমতার সঙ্গে প্রযুক্ত হয়েছে। মুসলমান-সম্প্রদায় যদি এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে একটা সামাজিক বিক্ষোভ জাগিয়ে তুলত, আমি সর্ব্বান্তঃকরণে তাদের পক্ষে যোগ দিতাম। কিন্তু যা নিজেদের মধ্যেই মিটিয়ে ফেলা যায়, তার জন্য মুসলমানেরা এ কি আরম্ভ করেছে বল তো? একটা রাজনৈতিক বিভেদ সৃষ্টি করে তারা যে সমস্ত দেশের স্বার্থই জলাঞ্জলি দিতে বসেচে। ঘরোয়া-বিবাদ করে সারা ঘর পুড়িয়ে দেওয়া কি বুদ্ধিমানের কাজ? আসল লড়াইয়ের কথা বিস্মৃত হয়ে যদি আমরা পরস্পরের সঙ্গে লড়তে শুরু করি, তবে তুইও ঠকবি, আমিও ঠক্‌বো, আমাদের দুজনেরই হার হবে।'

'তা আমি জানি, বন্ধু। জানি বলেই এমন দুঃখ পাই। কিন্তু আমাদের সম্প্রদায় এখনও বড় অশিক্ষিত। অশিক্ষিত বলেই আমাদের সাম্প্রদায়িকতাবাদী নেতারা সাম্প্রদায়িক স্বার্থপরতার নিকট আবেদন করে' এতটা সুবিধা করতে পারছেন। নিজস্ব স্বার্থের জন্য মহান্ ইস্‌লামীয় সম্প্রদায়কে তাঁরা ভুল বোঝাচ্ছেন, হিন্দু-বিদ্বেষ খুঁচিয়ে জাগাচ্ছেন—মানুষের যতগুলি অসভ্য বৃত্তি, মুসলমান-সাধারণের মধ্যে তা প্রচার করে বেড়াচ্ছেন। মুসলমান সমাজের প্রকৃত মঙ্গল কিসে তা বেমালুম চাপা দিয়ে একমাত্র নিজেদের প্রাধান্য বজায় রাখারই চেষ্টা করচেন। অশিক্ষিত না হলে আমার সম্প্রদায়ের ইতর-সাধারণ এ-কথাটা বুঝত না মনে কর? দেখো না,

তর্কে এঁটে উঠতে না পারলে, অমনি আমাদের সাম্প্রদায়িক ধুরন্ধরেরা ইস্লামের দোহাই পেড়ে বসেন। যেন ইস্লাম কোনও দিন পরাধীনতা অনুমোদন করেছে! নিজেদের দুর্ব্বলতা চাপতে গিয়ে তাঁরা বলেন, 'ইস্লাম বিপন্ন।' যেন ইস্লাম এতই দুর্ব্বল। আমার সম্প্রদায় যদি কোনও দিন অধিকতর শিক্ষিত হয়ে ওঠে, তবে তুমি ভাবতে পার, এসব নেতাদের কখনও তারা মানবে? একবার ইতিহাসের পাতাগুলি মনে মনে উল্টে দেখ, ধর্ম্মের গোঁড়ামি করে' গেছে কারা? তাই তো আমি বলি, যদি মুসলমানদের বন্ধুত্ব তোমরা চাও, যদি তাদের ভবিষ্যৎ ভারতবর্ষের উপযুক্ত সিটিজেন্ করে গড়ে তুলতে চাও, তবে তাদের মধ্যে শিক্ষার প্রচলন করে বেড়াও, তাদের মধ্যে জ্ঞানের আলো জ্বালিয়ে দাও। তাতে রাজনৈতিক প্রচারের দশগুণ কাজ হবে ..' বলিয়া জহির উত্তেজনায় একেবারে হাঁপাইতে লাগিল।

রজত সসম্ভ্রমে এই তরুণ মুসলমানের দিকে চাহিয়া রহিল। এমন সব যুবক যখন মুসলমান-সম্প্রদায়ের মধ্যে আবির্ভূত হইতে আরম্ভ করিয়াছে, তখন হতাশার কিছুমাত্র কারণ নাই, অদূর ভবিষ্যতেই ইস্লামীয় সম্প্রদায় ভারতবর্ষে নতুনতর গৌরবের আসনে উন্নীত হইবে। প্রায় কৃতজ্ঞতার কণ্ঠে রজত কহিল—'আজ তুই সত্যি আমার চোখ খুলে দিলি, জহির।'

চারটার সময় চা আসিল, খাবার আসিল, এবং দুই বন্ধু আহারে প্রবৃত্ত হইল।

চায়ের পর জহির কহিল, 'এখন কিন্তু আমার সঙ্গে সিনেমায় যেতে হবে, রজত। আমি নিমন্ত্রণ করতে এসেছিলাম, এসে রাজনীতিতে জড়িয়ে গেলাম। বড় সর্ব্বনাশা জিনিষ রাজনীতি।'

'নিঃসন্দেহে।' রজত হাসিয়া কহিল। 'কিন্তু হঠাৎ সিনেমা কেন?'

'হঠাৎ নয়, আমাদের ঠিকই ছিল।'

'আমাদের আবার কে রে ?'

'হাসিনাও আসছে।' সলজ্জ হাসিয়া জহির জানাইল। 'সাড়ে পাঁচটায় সে সিনেমার সামনে পৌঁছবে, তার আগে আমাদের যাওয়া চাই।'

রজত খুশি হইয়া কহিল—'তবে নিশ্চয়ই যাব। তোর কাছে গল্প শুনে শুনে কতদিন মিস্ জেহান্‌কে আমার দেখতে ইচ্ছে হয়েছে। শিক্ষিতা মুসলমান মহিলা কেমন হয়, দেখতে আমার বড়ই ইচ্ছে।'

হাসিনা জেহান্ জহিরের দূরসম্পর্কের এক মাসির মেয়ে। ওদের বাক্‌দানের কথাটা রজত অনেক দিন হয় জানে। হাসিনা বিটন কলেজে তৃতীয় বার্ষিকে পড়ে। ওরা পর্দা মানে না, প্রয়োজন হইলে অপরিচিত পুরুষের সঙ্গেও কথা কয়; জহিরের এম, এ পরীক্ষা হইয়া গেলেই ওদের বিয়ে হইবে ঠিক আছে—এ সমস্ত খবরই রজতের জানা।

চৌরঙ্গি অঞ্চলের এক সিনেমার বাড়ির লাউঞ্জে হাল্‌কা-নীল খদ্দরের শাড়ি পরা এক তরুণীর সঙ্গে জহির যখন আলাপ করাইয়া দিল, তখন রজত প্রায় চমকিত বোধ করিল। আভিজাত্যপূর্ণ প্রসন্ন মুখ, স্নিগ্ধ উজ্জ্বলশ্যাম বর্ণ, অতি দীর্ঘ এক জোড়া চোখ, কানে কর্ণভূষণটা জ্বলিতেছে। এমন সুন্দর করিয়া ফিকা নীলবর্ণের শাড়িটা মেয়েটির সপ্রতিভ সছন্দ দেহটি বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে যে, প্রথম মুহূর্ত্ত হইতেই মেয়েটির প্রতি একটা মধুর ধারণা গড়িয়া ওঠে। সঙ্গে বুড়া এক কাকাকে রাশিয়ার বল-শেভিক বিদ্রোহের সময়কার এক চিত্র দেখাইতে লইয়া আসিয়াছে, তবে প্রকৃত উদ্দেশ্যটা যে চাচাজানের কাছে গোপন থাকে নাই, তা বৃদ্ধের দুষ্টুমি-ভরা দৃষ্টি দেখিয়াই বোঝা গেল।

হাসিনা সহাস্যে রজতকে কহিল, 'আপনার সমস্ত কথাই আমি জানি। আপনি মোটেই অপরিচিত নন্। বরঞ্চ মনে হয় যেন কতদিনের চেনা।'

রজত মৃদু হাসিয়া জবাব দিল, 'জহির, তোর বুঝি এই গুপ্তচরবৃত্তি? এ-পক্ষের কথা ও-পক্ষে জানান, আর ও-পক্ষের কথা এ-পক্ষকে?'

সহাস্যে ওরা অডিটোরিয়মে প্রবেশ করিল।

হাসিনা কহিল, 'আপনি নাকি মুসলমানদের খুব ভালবাসেন, রজতবাবু?'

'কে বল্‌লে আপনাকে?' রজত কহিল।

'কেন, জহিরদা বলেছেন।'

'যদি তাই হয়, তবেই বা বিস্ময়টা কোথায়?'

'এমন তো অনেক হিন্দু আছেন', একটু ক্ষুণ্ণ কণ্ঠে হাসিনা কহিল, 'যাঁরা মুসলমানদের ঘৃণা করেন। আমি নিজেও অনেক জানি, কতবার যে আঘাত পেয়েছি, তা বলবার নয়।'

রজত কহিল, 'আছে বৈকি, সব সম্প্রদায়ের মধ্যেই বর্ব্বরতার বহু উদাহরণ আছে, কিন্তু তাই বলে সবাই কিছু এমন নয়। তাছাড়া, দেখুন, আমাদের সম্প্রদায়ের মধ্যে খাওয়া-ছোঁয়ার গোঁড়ামি বড় বেশি। সেজন্য কিছু, হয়তো বা সাম্প্রদায়িক স্বার্থের ঠোকাঠুকির জন্য কিছু, এমনটা হয়। তবে আমার কি মনে হয়, জানেন? রাজনীতি-ক্ষেত্রে হিন্দুদের বিপক্ষাচরণটাই মুসলমানদের প্রতি হিন্দুদের মন বিরুদ্ধভাবাপন্ন করে তুলেছে। কিন্তু আমি তো জানি, প্রকৃত মুসলমান কি রকম হয়।' বলিয়া জহিরের দিকে চাহিতেই জহির চোখ নিচু করিয়া কহিল, 'তুমি বড় বাড়াবাড়ি কর, রজত।'

হস্টেলে ফিরিয়া রজত দেখিল, চত্বরে বিরাট জটলা বসিয়া গেছে। সন্ধ্যাকালীন খবরের কাগজে আন্দোলন সম্বন্ধে নতুন নতুন সংবাদ বাহির হইয়াছে। উত্তেজনার আর অন্ত নাই। সুনন্দ এবং অন্যান্যেরা উত্তেজিত-

কণ্ঠে নানা বাক্য বর্ষণ করিতেছে, কিন্তু দেখিয়া রজত বিস্মিত হইল, বাগ্মিতা প্রকাশ করিবার এমন উপযুক্ত ক্ষেত্রে সমর উপস্থিত নাই।

নতুন সংবাদগুলি জানিয়া লইয়া এবং আরও কিছুক্ষণ তর্ক এবং উত্তেজিত উক্তি সকল শুনিবার পর সে কহিল—'সমর কোথায় গেল আজ?'

সুনন্দ অত্যন্ত তাচ্ছিল্যের সুর লাগাইয়া কহিল—'দেশের দুর্দ্দিনে কি ওদের সন্ধান পাবে? সোশ্যালিস্ট্ না ব্যাঙ। যখন দায়িত্ব বইবার সময় হয়, তখন বড় বড় বুলি ছেড়ে আসল কর্ত্তব্যটা এড়িয়ে যায়। সমর ভটচাজ্‌কে আমি চিরকালই জানি—ওর সাম্য আর সমাজতন্ত্র হচ্চে অন্যের তেল আর সাবানের শ্রাদ্ধ করা।'

সুনন্দের বক্তৃতা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সমর আসিয়া উপস্থিত হইল। একবার চোখ উঠাইয়া জনতা লক্ষ্য করিল, কিন্তু বক্তৃতা দিবার এতবড় একটা সুযোগ উপেক্ষা করিয়া পকেট হইতে চাবি তুলিয়া তাহা নাড়িতে নাড়িতে নিজের ঘরের দিকে অগ্রসর হইয়া গেল।

প্রবীর বর্দ্ধন হাঁকিয়া কহিল, 'খবরটা কি, সমর ভট্‌চাজ?'

সমর ওখান হইতেই কহিল, 'আচ্ছা করে শুনিয়ে দিয়ে এলাম জে, এম, সেনগুপ্তকে?'

রজত বিস্মিত হইয়া কহিল—'কি শুনিয়ে এলি রে?'

'বল্লুম, মশায়, আপনাদের কংগ্রেসের সঙ্গে আমাদের মোটেই বনিবনা নেই। কিন্তু যখন যুদ্ধটা আরম্ভ করে দিয়েচেন, তখন ঝগড়াটা আর করব না, নামটা লিখে নিন্। আগে স্বরাজটা হোক, তখন কংগ্রেসের রাইট্ উইং-এর সঙ্গে, মশায়, আমাদের বিবাদটা একদিন বাঁধবেই, বলে রাখলুম।' বলিয়া আর বাক্যব্যয় না করিয়া সমর নিজের ঘরের দিকে আগাইয়া গেল।

চত্বরের মিটিঙে আর বাগ্মিতা অবশিষ্ট রহিল না।

# পাঁচ

সন্ধ্যার পরই হস্টেলে সংবাদ পাওয়া গেল। শ্রদ্ধানন্দ পার্কে অন্যান্যের সঙ্গে সমর ভট্টাচার্য্য গ্রেপ্তার হইয়াছে। পরদিন প্রভাতের খবরের কাগজে শ্রদ্ধানন্দ পার্কে আইন-অমান্যকারীদের সভা ও পুলিশের লাঠি-চার্জ্জের সমগ্র বিবরণ বাহির হইল।

আইন-অমান্য আন্দোলনের তীব্রতা ও পুলিশের দমনকার্য্য তাল ফেলিয়া বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। কিন্তু এই ঘোর উত্তেজনার মধ্যেও কংগ্রেসের প্রায় সকল স্বেচ্ছাসেবকই অহিংস রহিল। মহাত্মা গান্ধী মানবাত্মার নৈতিক প্রতিবাদ জ্ঞাপনের যে আদর্শ প্রচার করিয়াছেন, তাহা হইতে এই বিরাট এবং সংগ্রামে অনভ্যস্ত স্বেচ্ছাসৈনিকেরা ভ্রষ্ট হইল না। কিন্তু কর্ত্তৃপক্ষকে তারা সর্ব্বপ্রকারে উত্যক্ত করিয়া তুলিল, আইন যত ভাবে ভাঙা যায়, যত ভাবে কর্ত্তৃপক্ষকে অবজ্ঞা এবং অবহেলা প্রদর্শন করা চলে, যত প্রকার রাজদ্রোহিতামূলক ধ্বনি করা সম্ভব, তাহার অনুশীলন চলিতে লাগিল। টিটকারি, বিদ্রূপ এবং কারণে-অকারণে পুলিশকে হয়রাণের একশেষ হইতে হইল। কোথাও কোথাও ঢিলটা আশটা আসিয়া পড়িল, পুলিশের কর্ত্তৃপক্ষ রাগিয়া আগুন হইল। শ্বেতাঙ্গ পুলিশ-সার্জ্জেণ্টেরা রাগের মাথায় এমন সব কাজ করিয়া বেড়াইল যাহা মোটেই আইনসম্মত নয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে ঢুকিয়া একদিন ইহারা কয়জন ছেলেকে পিটাইয়া গেল। এই ব্যাপারে ছাত্রমহলে বিক্ষোভের আর অবধি রহিল না।

দেশের রাষ্ট্রনৈতিক অবস্থা একটা দুষ্ট-চক্রের গতিতে আবর্ত্তিত হইতে লাগিল। আইন-অমান্য আন্দোলন যতই তীব্র হইতে লাগিল, পুলিশের দণ্ডনীতিও তত কঠোর এবং ব্যাপক হইয়া উঠিল, এবং যেহেতু এই

আন্দোলনের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্যের সঙ্গে দেশের অধিকাংশেরই সহানুভূতি ছিল, সেইজন্য পুলিশের দমন-কার্য্য নিত্যনূতন বিক্ষোভের সৃষ্টি করিল।

অধিকাংশ ছাত্রের মতন, কংগ্রেসের উদ্দেশ্যের প্রতি রজতও গভীর শ্রদ্ধান্বিত। কিন্তু কি যে সে করিতে পারে, সে সম্বন্ধে কোনও বিচারেই সে উপনীত হইতে পারিতেছিল না। এমন সময় সমরের গ্রেপ্তারের সংবাদ তাহাকে অত্যন্ত ব্যথিত করিয়া সজাগ করিয়া তুলিল। সমরের নিত্যনৈমিত্তিক বাচালতা দেখিয়া কার সাধ্য বলিতে পারিত, এমন অনাড়ম্বরে, এমন সহজ অবহেলার সঙ্গে সে কংগ্রেসের কার্য্যে ঝাঁপ দিয়া পড়িবে, হাসিয়া কারাবরণ করিয়া লইবে। কি অদ্ভুত মনের জোর এই তর্কবাগীশ অভিনয়প্রিয় যুবকটির। রজতের কেবলই মনে পড়িতে লাগিল সমরের সেই কথাটা—'আচ্ছা করে শুনিয়ে এলাম জে, এন, সেনগুপ্তকে।' সমরের জন্য একটা সুগভীর শ্রদ্ধায় রজতের বুক ভরিয়া উঠিল। তার বাচালতা, তার আহার-লোলুপতা, তার ছ্যাবলামি ছদ্মবেশ মাত্র। ছদ্মবেশ খসাইয়া সমর এইবার নিজেকে প্রকাশ করিয়াছে।

ব্যক্তিগতভাবে সাহায্য করিতে না পারিয়া দেশের অন্যান্য অধিকাংশ লোকের মত রজত বিদেশী জিনিষ বর্জ্জন করিল, নাম-গোপন করিয়া কংগ্রেসের ভাণ্ডারে পাঠাইয়া দিল অর্থ। তবু কিন্তু রজতের অস্বস্তি দূর হইল না। কেমন একটা নামগোত্রহীন লজ্জা, কেমন একটা অপরাধ-বোধ, এক অজানা ভীরুতার জন্য কেমন একটা সঙ্কোচ, কি জানি একটা বিবেকের দংশন তার চৈতন্যের মধ্যে বারম্বার আঘাত করিয়া বেড়াইতে লাগিল, রজতের মনের শান্তি লোপ পাইবার উপক্রম হইল। নিজেকে রজত কত বুঝাইল, নিজের নিরাপদ এবং সুখকর অবস্থার কথা নিজেকে জানাইয়া স্বার্থপরতাটাকে জাগ্রত করিতে চাহিল, তবু একটা আত্মগ্লানি, অসহায় অপমানের একটা বিষাক্ত হুল কেবলই তাকে খোঁচা মারিয়া বেড়াইতে লাগিল।

সন্ধ্যার কিছু আগে পূর্ণানন্দ চুপে চুপে আসিয়া কহিল—'রজত, তোমাকে একবার যেতেই হবে।'

রজত একটু চুপ থাকিয়া কহিল, 'আমি এর যোগ্য নই, পূর্ণানন্দ, আমি হতাশ করব।'

'একবার তোমাকে যেতেই হবে।' পূর্ণানন্দ আবেগের সঙ্গে কহিল। 'আমি তাঁদের বলে এসেছি, তাঁরা আশা করে বসে আছেন।'

'আমি স্বয়ং গিয়ে তাঁদের হতাশ করে এলে সেটা কি কিছু বেশি মধুর হবে?'

'তাঁরা ব্যর্থকাম হন কি সফল হন, সে ভার আমার নয়, রজত। আমার উপর আদেশ তোমাকে একবার নিয়ে যাওয়ার।'

'তোদের পন্থা আমি অনুমোদন করি না।'

'তা আমি শুনেছি। ওঁদেরও জানিয়েছি।'

'তবু তাঁরা একবার চেষ্টা করে দেখতে চান, এই তো?'

'হ্যাঁ, এই।'

'যদি আমি রাজি না হই?'

'না হলে।'

'যদি পুলিসকে এসে সব জানিয়ে দিই!'

'সে লোক তুমি নও।'

কুমারটুলি পার হইয়া বাগবাজারের কাছাকাছি পূর্ণানন্দ রজতকে লইয়া ট্রাম হইতে নামিল এবং এ-গলি হইতে ও-গলি, এবং তারপর অন্য গলির একটা অখণ্ড গোলকধাঁধার মধ্য দিয়া রজতকে হাঁটাইয়া লইয়া চলিল। কোথা দিয়া, কোনখানে এবং কোন দিকে যাইতেছে, এতদিন কলিকাতায় বাস করিবার পরও রজত তাহা ঠাহর করিয়া উঠিতে পারিল না; পূর্ণানন্দের নির্দ্দেশমত দুই দিকের দুই সারি কোঠাবাড়ীর মধ্যবর্ত্তী সঙ্কীর্ণ গলির পথে, গ্যাসের স্তিমিত আলোয় পথ দেখিয়া কেবলই চলিতে

লাগিল। ক্রমে সুরকির কল, চুণের আড়ত, গরুব গাড়ী মেরামতের কারখানা—এই সব রজত লক্ষ্য করিল। এই রহস্যজনক অঞ্চলের কোন্ গভীর এবং দুর্গম প্রদেশে তাহাদের যাত্রা শেষ হইবে, বজত ভাবিয়া পাইল না, কিন্তু তাহাদের উদ্দেশ্যটা মনে করিয়া বজত কোন প্রশ্নই করিল না।

অবশেষে পূর্ণানন্দ একটা অতি-জীর্ণ আধ-ভাঙা দালানের সমুখে আসিয়া দাঁড়াইল, এবং সমুখের কীটদষ্ট ভগ্নপ্রায় কাঠের দরজাটায় আঙুল দিয়া তিনবার টোকা দিল। এই ভগ্ন স্তূপে যে মানুষ বাস করিতে পারে, পূর্ণানন্দের উদ্দেশ্যটা না জানিলে বজত তাহা বিশ্বাস করিতে পারিত না। একটা অতি পুরাতন অব্যবহার্য্য দালানকে ভাঙিতে আরম্ভ করিয়া যখন কাজ অর্দ্ধ-সমাপ্ত হয়, চুণে, ধূলায়, ভাঙা আস্তর-খসা ইঁটে যখন একটা পাহাড়-স্তূপের সৃষ্টি হয়, এ বাড়ির অবস্থা সেইরূপ।

পূর্ণানন্দ দরজায় আবার টোকা মারিল। কিন্তু বহুক্ষণ যাবৎ কোনও সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না। আরও কয়েক মিনিটকাল অপেক্ষা করিয়া পূর্ণানন্দ যখন পুনরায় সঙ্কেত করিবার উদ্যোগ করিতেছিল, তখন ভিতর হইতে অতি ক্ষীণ একটা সাড়া পাওয়া গেল—যেন ইঁট এবং সুরকির স্তূপের মধ্য দিয়া কে একজন অতি কষ্টে অগ্রসর হইতেছে। শুনিয়া পূর্ণানন্দ উৎকর্ণ হইয়া উঠিল। অতঃপর সামান্য কাল চুপ করিয়া থাকিয়া ভিতরের সেই রহস্যময় শব্দের উদ্দেশে কহিল—'আত্মানং বিদ্ধি।'

ক্র্যাচ্। ক্র্যাং। জীর্ণ কাঠ এবং শিথিল কব্জার বিকৃত একটা শব্দ হইল, দরজা খুলিয়া গেল। ইঙ্গিতে রজতকে সামান্য অপেক্ষা করিতে বলিয়া পূর্ণানন্দ ভিতরে প্রবেশ করিল এবং একটু পরেই বাহির হইয়া আসিয়া কহিল—'এসো, রজত।' দরজা পুনরায় বন্ধ হইল, এবং ইলেক-ট্রিক টর্চ্চে পূর্ণানন্দ আলো জ্বালাইলে রজত শিহরিয়া উঠিয়া দেখিল—চতুর্দ্দিকে কেবল সুরকি, কেবল ভাঙা শ্যাওলাধরা ইঁটের স্তূপ ও চূণ। স্থান-টাকে একটা কবরের অভ্যন্তর বলিয়া রজতের মনে হইতে লাগিল। হাসিয়া

পূর্ণানন্দ কহিল—'হেড্ কোয়ার্টার্স কিনা! একটু সাবধান হতে হয়, ভাই।'

'তা তো দেখতেই পাচ্ছি।' রজত কহিল। 'একেবারে গোড়ের তলায় এসে ডেরা বেঁধেচিস্। আমি ভাবতেও পারিনি, এর ভেতর প্রবেশ করা যাবে—ও কি, এই সিঁড়ি নিচের দিকে কোথায় যাচ্ছে?'

'মাটির নিচে ঘর আছে।'

'নিচে!' সবিস্ময়ে রজত কহিল।

'ওপরে থাকতে না দিলেই', পূর্ণানন্দ রহস্যের সুর লাগাইয়া কহিল, 'নিচে আসতে হয়।—একটু সাবধান, এবার দুটো সিঁড়ি ভাঙা। মাটির কিনা, সহজেই ধ্বসে যায়—'

রাত দশটার সময় রজত একা ফিরিয়া আসিল। মনটা অত্যন্ত খারাপ হইয়া গিয়াছে। লাভ কিছু হইল না, অনর্থক বাদানুবাদ হইল, ফলহীন উচ্ছ্বাসের সৃষ্টি এবং কয়েকজনকে ভগ্নমনোরথ করিয়া আসা ছাড়া আর কিছুই হইল না। পূর্ণানন্দের উপরও সে বিরক্ত হইল; সে তো রজতের সমস্ত মতামত জানিতই, তবে কেন তাহার দলের কাছে এমন করিয়া লইয়া গেল? এতে কার কি লাভ হইল? দেশের দ্রুত স্বাধীনতা লাভ হউক, ইহা রজত খুবই চায়, কিন্তু পূর্ণানন্দদের সমিতির পন্থায় নয়, কংগ্রেসের পন্থায়ই সে আস্থাবান। স্পষ্ট করিয়াই রজত নিজের মত-স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়াছে, রহস্যের প্ররোচনায় নিজের মত এবং স্বধর্ম্ম বিসর্জ্জন দেয় নাই। পূর্ণানন্দদের দল হয়তো খুবই আশা করিয়াছিল যুক্তি-প্রয়োগে তাকে স্বদলভুক্ত করিতে পারিবে, হতাশ হইয়া কেহ কেহ যে বিরক্ত হইয়াছে রজত ইহাও লক্ষ্য করিয়াছে। তর্কটা দুএকবার কটু হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু এই অপ্রীতিকরতার কোনও প্রয়োজনই ছিল না, পূর্ণানন্দের উচিত ছিল এ সম্বন্ধে ওদের আগেই স্পষ্ট করিয়া জানান।

রজত ববঞ্চ কংগ্রেসের স্বেচ্ছাসৈনিক হইতে পাবে, পুলিশ-বাহিনীর সম্মুখীন হইতে পারে, কিন্তু ইহা সে পারিবে না। ইহাতে যেন যুদ্ধেব গৌববই বোধ করা যায় না। তাছাডা দুইটা পট্‌কা ছুটাইয়া কি ব্রিটিশ-সাম্রাজ্য জয় কবা সম্ভব? অবশ্যম্ভাবী ব্যর্থতাব পথে ছুটিয়া লাভ কি?

মির্জ্জাপুরেব মোডে নামিয়াও কিন্তু বজত হস্টেলে গেল না। মাথাটা অত্যধিক উত্তপ্ত হইয়া উঠিযাছে। কলেজ স্কোযাবেব ভিতব ঢুকিয়া নির্জ্জন কোণায় একটা বেঞ্চ দেখিয়া সে বসিয়া পডিল।

জাত হিসাবে ইংবেজব উপর বজতেব কোনও আক্রোশ নাই। ইংবেজ জাতকে ববঞ্চ সে শ্রদ্ধা কবে। সাহিত্যে, সংস্কৃতিতে, বিজ্ঞানে, বাজ-নীতিতে কী অপূর্ব দান এই ক্ষুদ্র দ্বীপবাসী জাতিব! যে-জাতি আধুনিক ইতিহাসেব সর্ব্বপ্রথম ডেমোক্রেসিব অগ্রদূত, হাউস্ অব্ কমন্স যে-জাতি সৃষ্টি কবিয়াছে, গণ-স্বাধীনতাব জন্য যে-জাতি বাজাব মুণ্ড কাটিতে পাবে, সে জাতিব মাহাত্ম্যেব তুলনা নাই। বৈজ্ঞানিক আবিষ্কাবেব কী বিস্ময়কব বেকর্ড এই ইংবেজ জাতিব! প্রথম স্টিম্ এঞ্জিন, প্রথম স্টিমাব, প্রথম বাষ্পেব তাঁত উদ্ভাবিত হইয়াছিল এই ইংলণ্ডে। ইংলণ্ডেব ইণ্ডাস্ট্রিয়াল্-রিভোলিউশান্ সমস্ত জগতকে সভ্যতাব পথ-প্রদর্শন কবিয়াছে। আইনেব চোখে প্রত্যেকে সমান—যাকে ওবা ব'লে 'রুল্ অব্ ল'—এই ইংবেজেব সৃষ্টি। ব্যক্তি-স্বাধীনতা, বক্তৃতাব স্বাধীনতা, সংবাদপত্রেব স্বাধীনতা, রাজনৈতিক চিন্তার অপূর্ব্ব প্রসাব, এই ইংবেজ জাতিব গৌববজনক পবিচয়। এই ইংবেজ জাতই কি লর্ড ক্লাইভকে ধিক্কার দেয় নাই? এই ইংরেজ জাতই কি ভারতবর্ষে অনাচাবেব অপবাধে ওয়ারেন হেস্টিংসকে 'ইম্পিচ্' কবে নাই? কিন্তু—বজত দীর্ঘনিশ্বাসেব সঙ্গে স্মবণ কবিল—সাম্রাজ্যলিপ্সার দরুণ ইংরেজ তার সংস্কৃতি এবং স্বধর্ম্মবিরোধী কম কীর্ত্তিও কবে নাই। জগৎ-ক্ষেত্রে ইংলণ্ডের বহু আচবণ এমন বিসদৃশ হইয়াছে যে, প্রকৃত ইংলণ্ডের আত্মাকে তাহা ব্যথা দিয়াছে, অপমান করিয়াছে।

লোভ, স্বার্থপরতা—এরা বড় বিশ্রী জিনিষ—রঞ্জত নিজ মনে বলিতে লাগিল। আত্মার দাবির সঙ্গে দেহের দাবির এই দ্বন্দ্ব চিরকালের। মানুষ যেমন বহুস্থানে, বহুকর্ম্মে বহুবার দেহের এবং স্বার্থের তাড়নায় আত্মাকে নিপীড়িত করে, তেমনি একটা সমগ্র জাতির স্বার্থপরতাও তার আত্মাকে আচ্ছন্ন করিতে পারে।

এই জন্যই তো রঞ্জত মহাত্মা গান্ধীর সত্যাগ্রহকে এত শ্রদ্ধা করে। গান্ধীজি বলেন—ওরে, ইংরেজের গায়ে হাত তুলিস না, শুধু নির্ভীক ভাবে নিজ দাবি জানা, ভয় না পেয়ে, রাগ না করে, ওদের কাছে গিয়ে বল্—'আমাদের যা, তা আমাদের দাও। তোমরা তা অন্যায় ভাবে অধিকার করে থাকবে কেন?' গান্ধীজি বলেন—ওরা চটে উঠবে, স্বার্থে আঘাত পেয়ে ওরা রেগে যাবে, তেড়ে এসে মারবে তোদের। তোরা কিন্তু মেরে জবাব দিস্ না। ওরা যদি মারে তো মারুক না, দেখবি ওরা নিজেরাই একদিন চম্‌কে জেগে উঠবে, লজ্জায় আর নিজেদের কাছেই মুখ দেখাতে পারবে না।—প্রকৃত ইংলণ্ড কি কারুর পরাধীনতা সইতে পারে? এ ইংলণ্ডের স্বধর্ম্ম নয়।—আমার প্রিয় স্বেচ্ছাসেবকেরা, লক্ষ্য হানো ইংরেজের মনের ওপর, তার দেহের ওপর নয়।

'কে, রঞ্জত না?'

রঞ্জত চম্‌কাইয়া উঠিয়া চাহিয়া দেখিল, মনোরঞ্জন। মনোরঞ্জন অগ্রসর হইয়া আসিল। কহিল—'এতো রাত্তিরে এখানে? করছ কি?'

'মাথাটাতে হাওয়া লাগাচ্ছি।' রঞ্জত কহিল।

'বেশ, বেশ। রাতের খাওয়ার পর রোজ আমাকে হাঁটতে হয়। ডিস্‌পেপ্‌সিয়ার ধাত কি না, তাই ব্যবস্থা হচ্চে, কি বলে তোমার, আফ্‌টার ডিনার ওয়াক্ এ মাইল।...সন্ধ্যাবেলা দেখলুম, পূর্ণানন্দ দাসের সঙ্গে কোথায় যাচ্ছ। তা কখন ফিরলে?' বলিয়া মনোরঞ্জন আসনের অপরার্দ্ধে বসিয়া পড়িল।

রজত বিস্মিত হইয়া কহিল, ‘তুমি কি করে’ দেখলে ?’

মনোরঞ্জন কহিল, ‘আমি হ্যারিসন্ রোডের মোড়ে দাঁড়িয়েছিলুম। দেখলুম, দুই বন্ধুতে হাইকোর্টের ট্রামে চেপে বসলে। বেশ ছেলে পূর্ণানন্দ।’ বলিয়া সহসা কণ্ঠস্বর অত্যন্ত হ্রস্ব করিয়া মুখটা রজতের কানের কাছে আনিয়া কহিল—‘ওদের সমিতিতে ভজাবার চেষ্টা করচে না তো ? সত্যি বটে, উদ্দেশ্য আমাদের একই, তবু ওদের সম্বন্ধে খুব ভাল সার্টিফিকেট আমি তোমাকে দিতে পারব না।—কেবল চেপে-যাওয়া, কেবল কংগ্রেসের পায়ে-পায়ে চলা ওদের বদ্‌দোষের মধ্যে দাঁড়িয়ে গেছে। আগুন নিয়ে যদি খেলবি, তবে এত ভীরুর মত চলা কেন রে—’

‘ওসব থাক্, মনোরঞ্জন। আমার মাথাটা একেই খুব গরম হয়ে আছে, আজ আর তর্ক সইতে পারব না—’

‘থাকবে কি হে, চৌধুরি ! তোমার উপর আমাদের সমিতির ক্লেইমই যে বেশি। অনেকদিন আগে থাকতেই কি আমি তোমাকে বলে রাখিনি ? আচ্ছা, বল, তুমিই বল, স্বাধীনতা কি একটা কম বড় যজ্ঞ ? কত তরুণের রক্তে—আচ্ছা, যাক্, আজ আর ওসব কথা ওঠাব না …’

‘উঠিও না। কিন্তু আমি উঠলুম।—এখনও খাইনি।’ বলিয়া রজত দাঁড়াইয়া পড়িল।

মনোরঞ্জনও দাঁড়াইয়া পড়িল। কহিল—‘ওদেরই ওখানে নিয়ে গিয়েছিল তো ? আমাদের সমিতিকে খুব গাল দিলে, না ?—কিন্তু যখন আত্মত্যাগের সময় আসবে, বুকের রক্ত কারা বেশি দেয়, তা তুমি দেখো। চল, তোমাকে এগিয়ে দিয়ে আসি। কি বল্লে টল্লে ওরা ?—’

রজত নিঃশব্দে অগ্রসর হইল। যাহাকে সে চিরদিন বাতুল বলিয়া বিবেচনা করিয়া আসিয়াছে, আজ সহসা সে তাহার উপর সন্দিহান হইয়া উঠিল। মনোরঞ্জন কে ? ওর প্রকৃত উদ্দেশ্যটা কি ? কি সংবাদ, ও

কেন, সে রজতের কাছ হইতে বাহির করিয়া লইতে চায়? রজত শিহরিয়া উঠিল।

সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিতে উঠিতে রজত শুনিল, পূর্ণানন্দ বাঁশি বাজাইতেছে। ইতিমধ্যেই কখন সে ফিরিয়া আসিয়াছে। নিজ ঘরের দিকে একান্ত ক্লান্তভাবে অগ্রসর হইতে হইতে রজত ভাবিতে লাগিল—এতটা আগুন অন্তরে পুষিয়া পূর্ণানন্দ এমন সুমিষ্ট বাঁশি বাজায় কি প্রকারে? বাঁশির সুরে যে-স্বপ্ন, যে-আশাকে সে রূপ দেয়, তার জন্য হাতে সে বজ্র ধরে কেন? রজত বারম্বার নিজ মনে বলিতে লাগিল—না, না, এ পূর্ণানন্দের পথ নয়—অসহিষ্ণুতায় কোনও লাভ হয় না—ওতে শুধু ক্ষতি হয়—

## ছয়

পরদিন বেলা দশটায় পুলিশের ইণ্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চ আসিয়া হানা দিল। পূর্ণানন্দের ঘর তন্নতন্ন করিয়া খানাতল্লাসী হইল, কিন্তু কিছু পাওয়া গেল না। তা সত্ত্বেও পুলিশ যাইবার সময় তাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া গেল। পূর্ণানন্দ আর হস্টেলে ফিরিয়া আসিল না।

মনোরঞ্জন দত্তরায় সম্বন্ধে যে-সন্দেহটা রজতের মনে কাল রাত্রি হইতে চাপিয়া বসিয়াছিল, সে সম্বন্ধে আর কোনও সংশয় রহিল না। ব্যথায়, বিরক্তিতে এবং অস্বাচ্ছন্দ্যে রজতের মন পূর্ণ হইয়া গেল।

ইহার পর হইতে রজতের কেবলই মনে হইতে লাগিল, কংগ্রেস-আন্দোলনে যোগ না দিয়া তার পক্ষে আর উপায় নাই, সমগ্র দেশ জুড়িয়া এই যে বিক্ষোভ চলিয়াছে, ইহার মধ্যে সে-ই কি কেবল স্থবির হইয়া বসিয়া থাকিবে? সর্ব্বক্ষণ নিজেকে তার অপরাধীর মত

মনে হইতে লাগিল—কেমন যেন ভীরু বলিয়া বোধ হইল। পূর্ণানন্দদের সমিতির প্রেসিডেন্টের মুখের উপর সে জোর গলায় বলিয়া আসিয়াছিল—'এ আমার ভীরুতা নয়। আমি যে-আদর্শকে বিশ্বাস করি, শুধু তার জন্যই যুদ্ধ করতে পারি, আত্মোৎসর্গ করতে পারি—মিথ্যে আমাকে উত্তেজিত করবার চেষ্টা করচেন।' কিন্তু কোন্ দিকে কতটুকু আত্মত্যাগ সে দেখাইয়াছে? আদর্শ কি তার কিছু আছে? দেশব্যাপী এই মন্থনের মধ্যে সে উদাসীন দর্শক ছাড়া আর কি? তার যৌবন কি আরামপ্রিয় খাঁচার পাখি?—দুর্গম পথে চলিতে সে কি ভয় পায়?

কী সার্থকতা সুখে থাকিবার? ঐশ্বর্য্য-বিলাসে, সঙ্গীত-ব্যসনে জীবনটা কাটাইয়া দেওয়ার অসহ্য গতানুগতিকতায় তার মন কি তৃপ্ত হইতে পারিবে? কি যেন তার মন একান্ত ভাবে চাহিতেছে, কি একটা দুর্ব্বার ক্ষুধা তার অন্তরের দুর্গম প্রান্তে বারম্বার নাড়া দিয়া উঠিতেছে, কিন্তু তাহাকে পরিপূর্ণভাবে জানিতে না পারার অস্বস্তিতে সে শান্তি পাইতেছে না। এ কিসের অভাব-বোধ? প্রেম? মৃত্যু? আত্মোৎসর্গ? সংহারোন্মাদনা? রঞ্জতের মনে একটু শান্তিও অবশিষ্ট রহিল না।

আশুতোষ বিল্ডিংসের প্রবেশ-মুখে দোতলার প্যাসেজে মনোরঞ্জনের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল। মনোরঞ্জন মুখে গভীর দুঃখ এবং সমবেদনা মাখিয়া জিহ্বাতে খেদোক্তিসূচক শব্দ করিতে করিতে নিকটবর্ত্তী হইল। কহিল, 'দেখলে কাণ্ডটা? শেষে এমন করে' ধরা পড়ে গেল! নিজের দোষে নিজেকে নষ্ট করলে বৈ তো নয়। আগুন নিয়ে খেলছিস্, একটু ঢেকে ঢুকে খেলতে হয়—না তো সব তাতেই গোয়ার্ত্তুমি! ওদের সমিতির দোষই ঐ!'—বলিয়া কণ্ঠস্বর অসম্ভব প্রকার নিচু করিয়া কহিল—'এক মিনিটের পরিচয়ে যার তার কাছে সব গোপন কথা ফাঁস করে দেবে—

হয়তো পিস্তলই একটা রাখতে দিলে। বল তো, এ কি বিবেচনার কাজ! তোমাকেও একটা গছিয়ে দিতে চাইলে না?'

রঞ্জতের ইচ্ছা হইতেছিল একটা ঘুষিতে মনোরঞ্জনের বাঁকা নাকটাকে মুখের সঙ্গে সমতল করিয়া দেয়, চেষ্টা করিয়া নিজেকে সে নিবৃত্ত করিল। কহিল, 'মনোরঞ্জন, ভবিষ্যতে যদি তুমি আমার কাছে কখনো আস, তোমার সঙ্গে আমি যে-ব্যবহারটা করবো, সেটা কোন মতেই অহিংস অসহযোগ হবে না। সেই কারণে আমার কাছ থেকে দূরে থাকা তোমার পক্ষে দূরদর্শিতা হবে। কথাটা মনে রাখতে চেষ্টা করো।'

'এর মানে কি?' মনোরঞ্জন বিস্ময়ের স্বরে কহিল।

'মানে তুমিও জান, আমিও জানি। কিন্তু তোমার সঙ্গে কথা কইতে আমি ঘৃণা বোধ করি।'

'না না, রঞ্জত, তুমি কোনও ভ্রম-ধারণার বশবর্ত্তী হয়ে বন্ধুর উপর অবিচার করছ। আমি বলছিলাম যে, ওদের সমিতির উচিত নয় নতুন যে কোনও 'রক্রুট্'কে একটা পিস্তল গছিয়ে দেওয়া। প্রথমে তাকে বেশ করে—'

'মনোরঞ্জন!'

'বল।'

'স্পাই কাকে বলে জান?'

'স্পাই। সে কি? এই প্রসঙ্গে তার কথা ওঠে কি করে? স্পাই!' এক নিমেষে মনোরঞ্জনের মুখ ও চোখের চেহারা বদলাইয়া গেল। তোত্‌লাইয়া কহিল—'স্পাই! হ্যাঁ, তা জানি বৈকি। আমাদের সব সময়ে সাবধান থাকতে হয়, যাতে—'

'প্রকৃত পরিচয় প্রকাশ না পায়!' তীব্র ব্যঙ্গের স্বরে রঞ্জত কহিল। 'স্পাইয়ের ব্যবসাকে লোকে ঘৃণা মনে করে। তবু সে ব্যবসারও কিছু সাফাই আছে। কিন্তু স্পাইয়ের চেয়ে শতগুণ জঘন্য যার কাজ, মানুষের

এবং ভগবানের কাছে যাব একটু মাত্রও কৈফিয়ৎ নেই, যে মানুষনামধারী নীতিজ্ঞানহীন একটা বন্য পশুমাত্র, তাকে কি বলে জান?'

'কি?' মনোরঞ্জন যন্ত্রচালিতের মত কহিল।

'এজেণ্ট প্রভোকেটর।'

রজত উত্তেজিতভাবে আসিয়া আশুতোষ বিল্ডিংস্-এর ব্যাল্‌কনিতে দাঁড়াইল। কলেজ স্ট্রীট্ দিয়া মেয়েদের এক প্রোসেসান্ কংগ্রেস-পতাকা উড়াইয়া, 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনি করিয়া উত্তর দিকে অগ্রসর হইতেছে। আশেপাশে চতুর্দ্দিকে পুলিশ, কিন্তু এই মেয়ে-বাহিনীর তাতে একটু ভ্রূক্ষেপমাত্র নাই। যেন তারা যুদ্ধযাত্রা করিয়াছে, গোলাগুলির ভয়ে বিচলিত হইবার নয়।

রজত দেখিল, দশ বারো বৎসরের মেয়ে হইতে কুড়ি বাইশ ও তদোধিক বয়সের কত তরুণী খদ্দরের শাড়ির আঁচল কোমরে জড়াইয়া, মাথা উঁচু করিয়া অকুতোভয়ে অগ্রসর হইয়াছে। কণ্ঠে তাহাদের স্বাজাতিকতার সঙ্গীত, হাতে ত্রি-বর্ণ রঞ্জিত পতাকা।

সহসা একটা লজ্জার তরঙ্গ রজতের প্রতি শিরায় এবং প্রতি রক্তবিন্দুতে ছুটিয়া গেল, মজ্জার মধ্যে পর্য্যন্ত তাহা প্রবাহিত হইয়া চলিল। ছি, ছি, রজত না পুরুষ! সে না শক্তিমান বলিয়া গর্ব্ব বোধ করে! অথচ এই মেয়েরা আজ তাহাকে স্পষ্টই ব্যঙ্গ করিয়া আগাইয়া গেল, ধিক্কার দিয়া গেল। ওরা দুর্ব্বল, ওরা কোমল, ওরাও আজ মাতিয়া উঠিয়াছে, ওরাও আত্মত্যাগের জন্য অগ্রসর হইয়াছে, আর পুরুষ হইয়া রজতই শুধু দাঁড়াইয়া রহিবে! এই বিক্ষুব্ধ সমুদ্রের বেলাভূমিতে দাঁড়াইয়া সে শুধু ঢেউ গণিতেছে! এই কি তার পৌরুষ! এই কি তার আদর্শবাদ! এই কি জীবনে পদ্মার আশীর্ব্বাদের পরিণতি!

সহসা রজতের চোখের সমুখের রাস্তা, জনতা, অট্টালিকাশ্রেণী সমস্তই

বিলুপ্ত হইয়া গেল, মানুষ এবং যানবাহনের শব্দকোলাহল শ্রবণ হইতে বিদূরিত হইল। দেখিল, চতুর্দ্দিকে জল, শুধু জল। জলের ফণা বিস্তার করিয়া, ফেনিল আবর্ত্ত রচিয়া, বুদ্বুদ উড়াইয়া, হিংস্র তরঙ্গভঙ্গে পদ্মা আসিয়া শ্যামল মাটিতে ভীম পরাক্রমে আঘাত করিতেছে। দিগন্তব্যাপী চিৎকার করিয়া কহিতেছে—ভাঙ্! ভাঙ্! ভাঙ্! পদ্মার জলোচ্ছ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে রঞ্জত থরথর করিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছে।

নিচ হইতে বহুজনের মিলিত চিৎকারে রঞ্জত চমকিয়া সম্বিৎ পাইল। দেখিল, এক যুবকবাহিনী কংগ্রেসের পতাকা লইয়া সুউচ্চ নির্ঘোষে নগরীকে আহ্বান করিতে করিতে অগ্রসর হইতেছে। 'জয়, ভারত-মাতার জয়। বন্দেমাতরম্!'

তাহাদের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলাইয়া রঞ্জতও চিৎকার করিয়া উঠিল—'জয়, ভারত-মাতার জয়। বন্দে মাতরম্।' এবং উন্মত্তের মত ছুটিতে ছুটিতে করিডর্ এবং সিঁড়ির সারি অতিক্রম করিয়া স্বেচ্ছাসেবকদের দলে যাইয়া মিশিল।

ইতিমধ্যেই বিরাট জনতায় দেশবন্ধু পার্কের বিস্তৃত মাঠ অর্দ্ধেক ভরিয়া গিয়াছে। দলে দলে নতুন স্বেচ্ছাসেবকবাহিনী ও নতুন জনমণ্ডলী আসিয়া সমুদ্রে নদী-স্রোতের মতন মিলাইতেই লাগিল। সভা-সমিতি বে-আইনী বলিয়া ঘোষিত হইয়াছে; কিন্তু আইন-ভাঙাই যাদের উদ্দেশ্য, তারা এই নিষেধ মানিবে কেন। দেখিতে দেখিতে শ্যামল প্রান্তর জনসমুদ্রে রূপান্তরিত হইল। কোলাহল, উত্তেজনা ও উন্মাদনার অবধি নাই, অথচ প্রতিক্ষণে ইহাদের প্রকোপ বর্দ্ধিত হইতেছে।

রঞ্জতদের বাহিনী যখন এই ভিড়ের মধ্যে আসিয়া মিলাইল, তখন সভার কার্য্যারম্ভের উপক্রম হইয়াছে। এই অগণিত জনমণ্ডলীর প্রান্তভাগে

দাঁড়াইয়া রজত সভার প্রায় কিছুই দেখিতে পাইল না। কে বক্তা, কি বক্তৃতা, কি ব্যবস্থা, সবই তার দৃষ্টির অগোচরে রহিল। রজতের কাছে তাহাদের কোনই প্রয়োজনীয়তা ছিল না। দশের ভাগ্যের সঙ্গে নিজ ভাগ্য সে গ্রথিত করিয়াছে, দেশের স্বাধীনতার জন্য আত্মত্যাগ করিতে প্রস্তুত হইয়া দাঁড়াইয়াছে, ভীরুতার বেদীতে আদর্শবাদকে সে বিসর্জ্জন দেয় নাই—এই অনুভূতিগুলিই তার পক্ষে যথেষ্ট। কোনও অনুশোচনা, কোনও মানসিক অশান্তি, কোনও অক্ষমতাবোধ, কোনও প্রকাশহীন লজ্জার অশ্রান্ত পীড়ন আর অবশিষ্ট নাই। সে যেন মুক্তি পাইয়াছে, নিজের কাছে আর নিজেকে অপরাধী মনে হইতেছে না। এক গভীর স্বস্তিতে রজতের দেহ-মন হাল্কা এবং তাজা হইয়া উঠিল।

এমন সময় রজতের কর্ণে যন্ত্র-বর্দ্ধিত এক উচ্চ নির্ঘোষ প্রবেশ করিল। কিন্তু পরক্ষণেই হঠাৎ তাহা থামিয়া গেল। এক মিনিটকাল কোনও সাড়াশব্দই শোনা গেল না, এই অসংখ্য জনমণ্ডলী একেবারে মূক রহিল,—যেন কি একটা ব্যাপার যবনিকার অন্তরালে সংঘটিত হইতেছে, তাহা দেখা যাইতেছে না সত্য, কিন্তু তাহার তাৎপর্য্য এবং গুরুত্ব অতিশয় গভীর। রজত ব্যাপারটায় মনোযোগ দিবার পূর্ব্বেই এই বিরাট জনতায় সহসা বিষম বিশৃঙ্খলা দেখা দিল। একটা হৈ-চৈ, একটা অস্বাভাবিক আলোড়নের সৃষ্টি হইল, এবং অত্যল্পকালের মধ্যে শ্রোতারা শৃঙ্খলাহীন জনতায় পরিবর্ত্তিত হইয়া হিজিবিজি মেঘের মতন সমস্ত দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। স্বেচ্ছাসেবকদের অভয়দান-বাণী শোনা গেল, শোনা গেল তাহাদের স্বাদেশিকতাসূচক ধ্বনি, কিন্তু একই সঙ্গে উত্থিত হইল ভয়-বিকৃত কণ্ঠের শব্দ, চোখে পড়িল পলায়নপর জনতার ভীত ত্রস্ত মূর্ত্তি—সব কিছু এক মুহূর্ত্তে লণ্ডভণ্ড হইয়া গেল। প্রথমে রজত ইহার তাৎপর্য্যই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিল না—এমনই হতভম্ব হইয়া গিয়াছিল। তারপরই বুঝিল, পুলিশ সভা এবং জনতাকে বে-আইনী

ঘোষণা করিয়া জনতা ছত্রভঙ্গ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। ভীত অসহায় জনতা পালাইবার জন্য ব্যগ্র, অথচ জনতাই জনতাকে বাধা দিতেছে, হুলস্থূল বাধিয়া গেছে।

পুলিশ-বাহিনী জনতা বিতাড়ন করিতে করিতে অগ্রসর হইয়া আসিতেছিল। কিন্তু রঞ্জতের সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নাই, তাকাইয়া তাকাইয়া সে শুধুই দেখিতে লাগিল, কি অসম সাহসে নিরস্ত্র অহিংসা-পন্থী কৃশকায় কংগ্রেস-স্বেচ্ছাসেবকেরা স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া আছে।

রঞ্জত স্বেচ্ছাসেবক নয়। মাথায় ওর গান্ধীটুপি নাই, হাতে ওর ত্রিবর্ণ পতাকা নাই—কংগ্রেসের তালিকাভুক্ত সদস্য রঞ্জত নয়। কিন্তু নাই বা হইল। কংগ্রেসের আদর্শের সঙ্গে রঞ্জতের আদর্শের তো কোনও পার্থক্য নাই। ভারতবর্ষের চিরন্তন আত্মিক শক্তির দ্বারা দেশের স্বাধীনতা অর্জনে সে বিশ্বাসী। সে দেশকে ভালবাসে, সে দেশের স্বাধীনতা চায়, দেশবাসীর কল্যাণ সে নিয়ত কামনা করে। এই কথাটাই স্পষ্ট করিয়া, দীপ্তকণ্ঠে জানাইবার জন্য সে আসিয়াছে এইখানে। স্বাধীনতা-আন্দোলনের সঙ্গে তার প্রত্যক্ষ সহানুভূতি জানাইতে না পারিয়া তার আদর্শবাদী মন অস্বস্তির বেদনায় ছটফট করিতেছিল—তাই সে আসিয়াছে, নিজের ব্যথা-জর্জরিত আত্মার ইঙ্গিতে, পদ্মার আহ্বানে। যাহা মহৎ, যাহা বৃহৎ, তাহাকে শ্রদ্ধা নিবেদন করিতে না পারিলে রঞ্জত শান্তি পায় না। তাই স্বেচ্ছাসেবকের নিষ্ঠার সঙ্গে স্বস্থানে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া সে কহিতে লাগিল—'ভারত-মাতার জয়! বন্দে মাতরম্!'

'হটো, হট্ যাও।'—পিছন হইতে হুকুমের কণ্ঠ ক্রমশ নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল। রঞ্জত নড়িল না, তাকাইয়া দেখিল না। মনে মনে

কহিল—স্বেচ্ছাসেবকদেব যা ভাগ্য, আমারও তাই হোক্। পালাইয়া গেলে আমার মন আমাকে ক্ষমা কবিবে না, আমার আত্মা আমাকে ক্ষমা কবিবে না, বাঁচা আমাব পক্ষে আব সম্ভব হইবে না।—আমাকে এই-খানে আমার জীবনধারণেব জন্যই দাঁড়াইয়া থাকিতে হইবে, একটুও নড়া আমাব পক্ষে আত্মহত্যার সমান হইবে।

সহসা অনতিদূবে অশ্বখুবেব শব্দ হইল। বজত তাকাইয়া দেখিল, বেটন-কবধৃত এক পুলিশেব সার্জেন্ট তাহাকে লক্ষ্য কবিয়া ঘোড়া ছুটাইয়াছে। মুখে তাব আইনেব মর্য্যাদা বক্ষা কবাব দৃঢ় প্রতিজ্ঞা, অস্ত্রবল অমোঘ। সেদিক হইতে দৃষ্টি ফিবাইয়া লইয়া বজত মনে মনে কহিল—'এসো, বন্ধু, এসো। আমাব বাঁচবাব জন্য যে তোমাকে দরকাব।'

এক, দুই, তিন। ঘোড়াব মুখটা শবীবের বাছ হইতে আব দূবে নাই। পিঠেব উপব বজত তাব ছায়াটাকেও যেন টেব পাইল। অশ্বেব উত্তেজনাচঞ্চল নিঃশ্বাস ঘাড় স্পর্শ কবিল। এইবাব, এইবাব—

'স্টপ্।'.

'লেট্ গো।'

'ইউ কাণ্ট্, ইউ কাণ্ট্। অ্যাবেস্ট্ হিম্ ইফ্ ইউ উড্, বাট্ ইউ কাণ্ট্ স্ট্রাইক্ হিম্—'

'ওঃ, কাম্ অন্, মিস্—'

'ইউ কাণ্ট, ইউ কাণ্ট্! ল' ডাস্‌ন্ট্ এলাউ ইউ দ্যাট্।'

চকিতে বজত ফিবিয়া তাকাইল। দেখিল, অগ্নিশিখাব মত একটি তরুণী বাঙালি মেয়ে ঘোড়াব মুখের লোহাব কড়াটা দক্ষিণ হস্তে প্রাণপণে আঁকড়াইয়া ধবিয়া কহিতেছে—'ইউ কাণ্ট, ইউ কাণ্ট।' চক্ষে তার বিদ্যুৎলেখা, মুখে তার অগ্নির দীপ্তি, কণ্ঠে আদেশ। যেন মাটি ফুঁড়িয়া কম্পমান এক শবীরী অগ্নিশিখা সহসা আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, মর্ত্ত্যেব

মাটিতে যেন অদৃশ্যলোক হইতে এক জ্যোতির্ময়ী মমতা উদিত হইয়াছে। কমলাবঙের খদ্দরের শাড়ি পরা, আঁচলটা দেশসেবিকার ভঙ্গিতে কোমরে জড়ান, অবিন্যস্ত কেশজাল বাতাসে বিক্ষিপ্ত, সুগৌর মুখমণ্ডলে সূর্য্যালোক গভীর দীপ্তি লইয়া প্রতিফলিত হইয়াছে। সেই মুহূর্ত্তে রঞ্জত যে সমগ্রভাব দৃশ্য দেখিল, তাহা মানবী নয়, তেজোদীপ্তি।

নারীর নিকট বাধা পাইয়াই হোক্, বা নিজের কাজের অন্যায্যতা হৃদয়ঙ্গম করিয়াই হোক্, সার্জ্জেণ্ট ঘোড়ার মুখ ফিরাইয়া অন্যদিকে ধাবমান হইল।

'এমন করে এখানে দাঁড়িয়ে থাকলে মার খেতে হয়, তা কি জানেন না।' মেয়েটি বিস্ময়ের সুর কণ্ঠে মিশাইয়া রঞ্জতকে সম্বোধন করিল।

'তা জানি।' রঞ্জত কহিল।

'তবু দাঁড়িয়েছিলেন! আপনি তো স্বেচ্ছাসেবক নন্।'

'স্বেচ্ছাসেবকের নিদর্শন যদি গান্ধীটুপি হয়, তবে নই। নইলে স্বেচ্ছাসেবক নয় কেন?'

মেয়েটি বিস্মিত দৃষ্টিতে চাহিয়া কহিল—'কই, আপনাকে তো কখনও দেখিনি।'

'আপনি কি সব স্বেচ্ছাসেবককেই চেনেন?' রঞ্জত কহিল।

মেয়েটি ঈষৎ অপ্রতিভ হইয়া কহিল, 'না, তা নয়, তা ঠিক নয়, তবু, মানে—যদি আপনি—আমি আর দাঁড়াতে পারছি না—' এবং আশঙ্কাত্রস্ত দৃষ্টিতে তাকাইয়া সচিৎকারে কহিয়া উঠিল—'সুলোচনা, সুলোচনা, মন্দিরা—বাঁ দিকে চেয়ে দেখ্। ছুটে যা, জোরে ছোট্—পিঠ পেতে গিয়ে দাঁড়া—'

'তুমিও এসো, সুমিত্রা-দি।' একটি মেয়ে চেঁচাইয়া কহিল।

'কেন আপনারা আমাদের এমন করে আড়াল করে দাঁড়াচ্ছেন?' রঞ্জত সহসা প্রশ্ন করিয়া বসিল। 'এতে আমাদের অপমান হচ্ছে না?'

মেয়েটি প্রস্থানোদ্যত হইয়াছিল। ফিরিয়া দাঁড়াইয়া কহিল—'অপমান কেন?'

'আপনি আমার অপরিচিতা,' রজত কহিল, 'কিন্তু যুদ্ধের উন্মাদনা এবং ব্রতসাধনের দীপ্তিতে আপনি এমন অদ্ভুতরূপে প্রকাশ পেয়েছেন যে, অপরিচয়ের কুণ্ঠা আপনার কাছে না করলেও চলে। দেখুন, মেয়েরা আমাদের লাঞ্ছনার হাত থেকে বাঁচালে আমাদের পৌরুষ তাতে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে না, এবং যাদের কাছ থেকে আপনারা আমাদের আড়াল করছেন, তাদের কাছে এ-জন্য আমাদের সম্মানও বর্দ্ধিত হয় না।'

'আইনের নামে যারা অবৈধতার আশ্রয় নিচ্ছে, তারা কোন্ গৌরবের কাজটা করছে?'

'তা দেখবার ভার তাদের, আমাদের নয়।'

'কিন্তু আমরাও শাস্ত্র আওড়াচ্ছি না, আমরা অহিংস যুদ্ধ করছি।' মেয়েটি দৃঢ়স্বরে কহিল।

'আমাদের যুদ্ধ, যুদ্ধ নয়। তা সত্যাগ্রহ।'

'বেশ, তবে আপনি দাঁড়িয়ে মার খান' মেয়েটি কহিল, 'যারা মার খাওয়া পছন্দ করে না, আমি তাদের সাহায্যে যাই।' বলিয়া আর বাক্যব্যয় না করিয়া দাবাগ্নি শিখার মত সত্যাগ্রহীদের ভিড়ের দিকে ছুটিয়া গেল, এবং পলকে অদৃশ্য হইল।

রজত সসম্ভ্রম বিস্ময়ে হতভম্ব হইয়া সেইখানেই দাঁড়াইয়া রহিল—নড়িল না, অগ্রসর হইয়া একবার এই রহস্যময়ী তরুণীর অদ্ভুত কার্য্যাবলী প্রত্যক্ষ করিতে চেষ্টা করিল না। সমস্ত ঘটনাটা একটা অলীক স্বপ্ন বলিয়া তাহার নিকট প্রতীয়মান হইতে লাগিল। মনে হইল, হয়তো এমন একটা ঘটনা কোনও দিন মনে মনে রচনা করিয়াছিল, কোন্ অসতর্ক মুহূর্ত্তে বাস্তব এবং কল্পনার সীমারেখা অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে, সে টের পায় নাই। মিছিল-

কাবীদের দ'ল যোগ দেওয়া, দেশাত্মবোধক উচ্চধ্বনি করিতে করিতে কলেজ স্ট্রীট হইতে দেশবন্ধু পার্ক পর্য্যন্ত নিজের প্রায় অজ্ঞাতসারে চলিয়া আসা, পুলিশ সার্জ্জেণ্টের আক্রমণ, ঘোড়ার নাকের নিঃশ্বাস—সবই যেন বজতের কাছে সহসা অবাস্তব বলিয়া বোধ হইতে লাগিল।

সুমিত্রা! সুমিত্রা! স্বপ্নের মধ্যে স্বপ্ন! কোন উপন্যাসে পড়িয়াছি এই নাম? এই চরিত্রটি কে সৃষ্টি করিয়াছে? কেমন করিয়া বজত আসিয়া উপস্থিত হইল দেশবন্ধু পার্কের এই শ্যামল ঘাসের উপর? এইখানে দাঁড়াইয়া এই অদ্ভুত স্বপ্ন কখন দেখিতে আরম্ভ করিল?

হস্টেলের প্রায় কাছাকাছি আসিয়া তবে বজত টের পাইল সে বাস্-এ বসিয়া আছে। সে সজাগ হইয়া সচেতন হইয়া উঠিল। কিন্তু তারপর সহসা সম্মুখের বেঞ্চটাতে দৃষ্টি পড়িতেই সে চম্‌কাইয়া উঠিল—মনে হইল, আবার বুঝি স্বপ্ন দেখা শুরু হইবে।

দেখিল, একদল তরুণী মেয়ের মাঝখানে সহাস্যবদনে বসিয়া আছে সুমিত্রা—কৌতুক-গল্পে মশগুল হইয়া আছে। মূর্ত্তি তার বদ্‌লাইয়া গিয়াছে, অসমসাহসিকা, তেজোদৃপ্তা, স্ফূর্তিচঞ্চলা, অগ্নিশিখার মত মেয়ে আর নয়, এ তার অন্যরূপ। রৌদ্রের বদলে সুমিত্রার মুখমণ্ডলে উঠিয়াছে জ্যোৎস্না, কাঠিন্যহীন উদ্বেগহীন লাবণ্যময়ী তরুণীমূর্ত্তিতে সে প্রকাশিত হইয়াছে। অতি অল্প সময়ের ব্যবধানে এই পরিবর্ত্তন যেমন বিস্ময়কর, তেমনি অদ্ভুত। কল্পনাকে যেমন ইচ্ছামত অদল-বদল করিয়া লওয়া যায়, ইহার রূপও তেমনি নমনীয়। স্মিতহাস্যময়ী, বুদ্ধিপ্রদীপ্ত-নয়না, কৌতুকপরায়ণা এই মেয়েটি আবার বজতকে চম্‌ক লাগাইয়া দিল।

একবার মাত্র বজতের বিস্ময়াপন্ন দৃষ্টির সঙ্গে মেয়েটির দৃষ্টিপাত হইয়া-

ছিল; কোনও অস্বাভাবিক অনাবশ্যক দ্রুততার সঙ্গে সে দৃষ্টি অপসারিত করিয়া লয় নাই। পরিচয়ের কোনও চিহ্ন তাহাতে ছিল না, অপরিচয়েরও নয়—এ যেন চৈত্র-জ্যোৎস্নার অপক্ষপাত চাহনি। রজত জীবনে এই প্রথম নিজেকে বিব্রত বোধ করিল। সুমিত্রার সঙ্গিনীরা উপস্থিত না থাকিলে রজত তার ক্ষণিক পূর্ব্বের রূঢ়তার জন্য এই অদ্ভুত মেয়েটির কাছে যাইয়া অনায়াসে ক্ষমা চাহিতে পারিত।

বাস্ কলুটোলার মোড়ে আসিয়াছে। স্বপ্নগ্রস্তের মত টলিতে টলিতে রজত নামিয়া পড়িল।

সারাটা রাত রজত ঘুমাইতে পারিল না। সুমিত্রা! সুমিত্রা! কোথা হইতে উদিত হইলে সুমিত্রা এমন অকস্মাৎ, এমন রহস্যমধুর রূপে? চৈতন্যের মধ্যে এ কী বিচিত্র স্বপ্নের সূত্রপাত হইল! কোন্ মহাকাব্যের ছন্দোবদ্ধ সুরঝঙ্কৃত রহস্যলোক হইতে ছিট্‌কাইয়া আসিয়া পড়িল এমন মধুর নাম! সুমিত্রা! সুমিত্রা! মনের মধ্যে এ কী অবর্ণনীয় অনু-ভূতির স্পন্দন শুরু হইল! এ কি মায়া? এ কি স্বপ্ন? এ কি মতি-ভ্রম?—উত্তর-চরিতের ভাষায় রজত মনের কাছে শুধুই গুঞ্জন করিয়া প্রশ্ন করিতে লাগিল। চৈত্রজ্যোৎস্না রাতে রাজার চিত্রশালায় যার দেখা পাওয়ার কথা ছিল, আজ কি জনসমুদ্রের বিক্ষুব্ধ আলোড়নের মধ্য হইতে, ক্ষোভ-তিক্ত লগ্নে, সংগ্রাম-রূঢ় পট-ভূমিকায় তার আবির্ভাব হইল? নিশ্চয়, নিশ্চয়, এতে আর সন্দেহ করিয়া ফল নাই। প্রতি জন্মে, প্রতি জন্মান্তরে চৈতন্যের মধ্যে সে অস্পষ্ট ছায়ার মত আত্মগোপন করিতে চাহিয়াছে, প্রতিবার সে ধরা পড়িয়াছে চঞ্চল পবনে, রজনীগন্ধার গন্ধে, চন্দ্রালোকের জাদুমন্ত্রে তার যবনিকা উড়িয়া গিয়াছে।

সুমিত্রা! সুমিত্রা! কোথায় পাইয়াছে সে অমন নাম, কোথায়

পাইয়াছে অমন দুটি চোখ, অমন পরিবর্ত্তনশীল অপূর্ব্ব মুখমণ্ডল, অমন অগ্নিশিখার মত তেজোদৃপ্ত, ভঙ্গিশীল দেহবল্লরী।

মেয়েদের সঙ্গে মিশিবার বহু সুযোগ রজতের হইয়াছে। কত মেয়ে তার সঙ্গে অন্তরঙ্গতা বাড়াইবার জন্য কত আগ্রহ দেখাইয়াছে। কিন্তু রজতের মনে কোনও দিনই কোনও দাগ পড়ে নাই। এক এক সময় তার মনে হইত, হয়ত জীবনে কোনও দিনই তার নারীসাহচর্য্যের প্রয়োজন হইবে না। এমন কি কখনও কখনও মেয়েদের প্রতি সে গভীর বিতৃষ্ণা বোধ করিত। নারীর চাইতে পুরুষ বন্ধু তার কাছে চিরকালই বেশি প্রিয, পুরুষদের মধ্যে কোনও অস্পষ্টতা নাই—পুরুষদের সে বিশ্বাস করে, ভালবাসে।

কিন্তু তার 'এমোশানের' রাজ্যে আজ এ কী অন্তর্বিপ্লবের সাড়া পড়িয়াছে। অজ্ঞাতকুলশীলা, অপরিচিতা, অজানা এই মেয়েটি কী অসম্ভাব্য জোর লইয়া মনের মধ্যে একেবারে হুড়মুড় করিয়া আসিয়া পড়িল। যেন পদ্মার জোয়ার, অকস্মাৎ দুর্নিবার আবেগে অজানা হইতে ছুটিয়া আসিয়া তটের উপর আছ্ড়াইয়া পড়িল—ভঙ্গুর মাটির তাহাকে আট্‌কাইয়া রাখিবার ক্ষমতা নাই। এই অদ্ভুত হৃদয়াবেগের নিকট রজত নিজেকে একান্ত ভঙ্গুর বলিয়া বোধ করিল। সুমিত্রা! সুমিত্রা! কোথা হইতে এমন অকস্মাৎ উদিত হইলে তুমি!

একটা অখণ্ড স্বপ্নের মধ্যে কয়টা দিন কাটিয়া গেল, অবিশ্রান্ত সুর এবং অবর্ণনীয় রঙের ঝলমলানিতে রজত বহির্জগৎ বিস্মৃত হইল।

এই পাগ্‌লামি দমন করিতে রজতের বেশ কয়দিন লাগিল। হঠাৎ-প্রেমে পড়া কলেজ-জীবনের একটা অপরিহার্য্য অঙ্গস্বরূপ। ইহার হাস্যকরতায় রজত চিরকালই কৌতুক বোধ করিয়াছে। দলবল লইয়া

এই দুর্বলতার উপর ব্যাপকভাবে হাস্য এবং ব্যঙ্গ কত যে বর্ষণ করিয়াছে, তার ইয়ত্তা নাই। তাই এই অবিশ্বাস্য রঙিন দিনগুলি ব্যাপিয়া মনে মনে যতই সে ইন্দ্রধনু রচনা করিয়া থাকুক, বর্ণনাহীন, গন্তব্যহীন, অস্তিত্বহীন পথে যতই না অভিসারে চলুক, সামান্য চাপল্যও সে দেখায় নাই। সুমিত্রার সন্ধানে মিটিং-এ যাওয়াটাকে সে অপরাধ মনে করিয়াছে, প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্বন্ধে নিজের মনে সংশয় উপস্থিত হওয়ায় ইচ্ছাসত্ত্বেও একাধিক রাজনৈতিক সভায় যোগ দিতে পারে নাই।

অবশেষে একটু আত্মস্থতা লাভ করিবার পর সে মনে মনে খুব একচোট হাসিয়া লইল। আচ্ছা, সত্য সত্যই সে যদি প্রেমে পড়ে তবে কি করিবে? কবিতা লিখিবে? সনেট! প্রেমে পড়িয়া যুগ-যুগান্তরে বহুলোক এই চতুর্দ্দশপদী কবিতা লিখিয়াছে। তবে যারা হৃদয়াবেগ এত অল্প পরিসরের মধ্যে আঁটাইতে পারে না, তাদের কথা স্বতন্ত্র। প্রেমের স্তুতি যে অল্প পরিসরের মধ্যে ইতি করিতে হইবে, কবিগুরুরা তেমন কোনও নির্দ্দেশ দেন নাই। সেরেনেড্! প্রেয়সীর জানালার তলায় কাঁটাগোলাপের বনে দাঁড়াইয়া দ্বিপ্রহর রাত্রে ভাব-বিহ্বল প্রেমিকের স্তুতি গান! তা সম্ভব নয়, পদ মিলাইবে রঞ্জত কেমন করিয়া! তবে, প্রেম নাকি অসাধ্যসাধন করাইতে পারে! অন্তত, গদ্য-কবিতা লেখা চলিতে পারে! এক পাতা গদ্য লিখিয়া লাইনগুলি ইচ্ছামত অসমানভাবে সাজাইয়া দিলেই হইল। আর কি কি পাগলামি করে লোকে? সেও কি সে-সকল আরম্ভ করিবে? প্রেম একটা অদ্ভুত ব্যাধি বটে, মানুষকে আচ্ছা বাঁদর-নাচ নাচাইয়া লয়।

তবে এটা নিশ্চিত, রঞ্জত অপরিচিতার খোঁজে ঘুরিয়া বেড়াইবে না। যে অপরিচয়ের মধ্যে সুমিত্রা গোপন ছিল, সেইখানেই সে থাকিবে। রঞ্জতের মনের এক অজ্ঞাত কোণায় এক অদ্ভুত আবেগের ক্ষীণ একটু

স্মৃতি অবশিষ্ট থাকিয়া তার অহঙ্কারকে চিরকাল নমিত করিয়া রাখিবে। জীবনের কত মুহূর্ত বিদ্যুতের মত ক্ষণস্থায়ী কত অদ্ভুত আবেগ, কত অপূর্ব অনুভূতি, অনাস্বাদিতপূর্ব পুলকানন্দ বহন করিয়া আনে, যার চিরস্থায়িত্ব আশা করাই বাতুলতা, কিন্তু যাহা মিথ্যা বলিয়া অভি-হিত করিতেও মন সায় দেয় না। মহাকালের অন্তহীন পথে মানুষের যাত্রা, সে-পথের চিরনূতন পরিবেশ এবং নিত্য নব আবিষ্কার ও আনন্দের মধ্য এক পরিবর্তমান তীর্থযাত্রা চলিয়াছে। সুমিত্রার জন্য মন যদি একটুখানি স্বপ্ন রচনা করিয়া থাকে, কেন সে লজ্জিত হইবে? পথ-চলার ইতিহাসে এ তো স্বাভাবিক ঘটনা। কিন্তু স্বপ্নকে স্বপ্নের চাইতে বেশি মূল্য সে যেন না দেয়—হাস্যকর ও সমারোহের মধ্যে যে ক্ষীণ অস্পষ্ট ব্যঞ্জাটি বর্তমান সেটা যেন সে কখনও লঙ্ঘন না করে, তবেই হইল—রজত মনে মনে ভাবিল।

## সাত

সাত দিন পরে রজত গেল সত্যানন্দবাবুর বাড়িতে দুপুরের আহারের নিমন্ত্রণে। স্পষ্ট দেখিতে পাইল, তার খদ্দরের সাজ দেখিয়া মন্দালিকা মুখ টিপিয়া হাসিতেছে। কপট শাসন করিয়া রজত কহিল, 'অমন করে হাসিগুলি গিলে ফেলা হচ্চে কেন? প্রকাশ্যভাবে হাসতে কেউ মানা করছে না। কিন্তু কারণটা কি শুনি?'

মন্দালিকা কোনও বাচনিক জবাব দিল না; তার হাসিটা বরঞ্চ আরও উদ্ধত হইয়া উঠিল।

রজত কহিল, 'খদ্দর পরাটা কারুর একচেটিয়া নয়, সেটা যার নাম ভালো আর যার নাম মন্দ, সবারই মনে রাখা উচিত।'

মন্দালিকা প্রতিবাদস্বরূপ কহিল, 'বাঃ রে, তাই বুঝি বল্লুম?'

'নিশ্চয়ই বল্লে। আকার এবং ইঙ্গিত ভাষারই অন্তর্গত—সিডিশ্যানের সেক্শানে স্পষ্ট করেই তা লেখা আছে।' রজত ঈষৎ কৌতুকের সুরে কহিল। 'দেখ্‌তো, মন্দ, কি চমৎকার হয়েছে এই পাঞ্জাবিটা! কেবল আমার ধোপা ছাড়া আর সবাই এর প্রশংসা করে। তুইও করবি, যদি না তোকে ওপরের ছেঁড়া বোতামটা শেলাই করে দিতে বলি। কিন্তু আমি বলব।'

মন্দালিকা মুখ টিপিয়া হাসিয়া কহিল, 'দাঁড়ান, আমার সবগুলিই কাপড় শেলাই করবার সূচ। আগে একটা চটের সূচ আনিয়ে নিই—'

'থাম্, আর চালাকি করতে হবে না।' রজত কহিল। 'সূচ দিয়ে মাকড়শার জাল ফুঁড়তে আমিও পারি। এ-পাঞ্জাবি ফুঁড়তে ঢের বেশি কৃতিত্বের দরকার।' বলিয়া হাসিয়া পাঞ্জাবির দুই প্রান্তভাগ ঈষৎ টানিয়া ছাড়িয়া দিয়া পাঞ্জাবির জন্য কৃত্রিম গর্ব্ব প্রকাশপূর্ব্বক সে সত্যবতীর সন্ধানে প্রস্থান করিল।

সত্যবতী কহিলেন, 'কী অসহ্য গরম পড়েচে, এ আর সওয়া যায় না। আঃ—এই পাখাটা যেন চলেও না ছাই। ওরে, ও গয়ারাম—'

রজত আগাইয়া আসিয়া কহিল, 'পাখার রেগুলেটারটা আমিই টেনে দিচ্চি।'

'তা দাও, তুমিই দাও, বাবা। এ-গরম কখনও মানুষের দেহে সয়! আর এরি মধ্যে তোমরা শুরু করেচ কি, শুনি? দিব্যি খুসিমুখে চট পরতে শুরু করলে! অবাক্ কাণ্ড! এ-কাপড় একদণ্ডও সও কি করে? ঐ যাঃ, মাছের চপ্‌গুলি এবার ভাজতে বলতে হবে যে। ওরে, ও গয়ারাম!—শখ করে এক আধ দিন পর তো পর, বেশি কিনে যেন পয়সা জলে ফেলো না। এমন মোটা কাপড় কি ভদ্রলোকের চামড়ায় চলে! ও হলো গিয়ে তোমার—স্বদেশী জিনিষ কেনা ভাল, কিন্তু নিজেকে বাঁচিয়ে তবে সব কিছু। আদরে যত্নে বড় হয়ে এ কি কারো পোষায়! ঈস্,

পাঞ্জাবিটার দিকে চোখ পড়চে আর গা কাঁটা দিয়ে উঠচে। ওরে, ও গয়ারাম, বাইরে বসে বসে—'

রজত মুচকিয়া হাসিয়া কহিল, 'আপনার জন্মদিন না করে কাকীমা? এই মাসেই, আমার মনে আছে।'

খুসি হইয়া সত্যবতী কহিলেন, 'দেখো একবার ছেলের কাণ্ড! মাসটাও মনে করে' বসে আছে! আজ হলো গিয়ে মাসের এগারো দিন, তেইশে হবে আর কদ্দিন হ'ল? হ্যাঁ, তেইশে। খুকি—ও মন্দা, কোথায় গেলি, শুনচিস্—'

মন্দালিকা বেশ পরিবর্ত্তন করিতে গিয়াছিল, ঘরে আসিয়া ঢুকিল। নীল রঙের চমৎকার একটা খদ্দরের শাড়ি পরা, গায়ে ঐ রঙের খদ্দরের ব্লাউস্। এই সামান্য সাজে তাকে এমন সুন্দর দেখা গেল যে, রজত এবং সত্যবতী একই সময়ে তার দিকে সবিস্ময়ে তাকাইল।

রজত সহাস্যে কহিল, 'অনুকরণ কাকে বলে রে, মন্দা? তুই যা করেচিস তাকেই তো?'

মিটিমিটি হাসিয়া মন্দালিকা কহিল, 'আর নিজে?'

সত্যবতী কহিলেন, 'বলি, আরম্ভ করলি কি তোরা! কাণ্ডটা কি শুনি? যা দিয়ে দরজার পর্দা হতে পারে, অনায়াসে তাকে গায়ে তুলচিস! সূর্য্যিঠাকুর কি তোদের কাছে হার মান্‌ল!'

মন্দালিকা কৌতুক করিয়া কহিল, 'হ্যাঁ, মানলই তো। খদ্দর ভেদ করে রোদ ঢুকতেই পারবে না!'

সত্যবতী শঙ্কিত হইয়া কহিলেন, 'মেয়ের কথার ছিরি দেখলে তো, রজত! এর পর তো জেলেও যেতে চাইবি।'

মন্দালিকা না-দমিয়া কহিল, 'তবে তো রজতদাও চাইবেন।'

'হ্যাঁ, চাইবেন, তোকে বলেচে! রজত-দার কি অভাবটা পড়েচে

শুনি যে, জেলে না গেলে চলচে না। জেলে যাবে! যত অলক্ষুণে কথা! রজতদার আব কাজ নেই—'

রজত শুধু কহিল, 'ভাবচি আপনাব জন্মদিনে এইবার খুব হালফ্যাশানেব একটা উপহাব দেব, কাকীমা। খুব হালফ্যাশানেব…'

সত্যবতী কহিলেন, 'খবরদাব বজত, এবাব যদি তুমি বেশি টাকা নষ্ট করবে তবে কিছুতেই আমি উপহাব নেব না। আগেব বাবেব সেই—'

'এবার বড জোর দু'তিন টাকা নষ্ট কববো—তাব এক কাণাকডিও বেশি নয়।' রজত ভালোমানুষেব মত কহিল।

শুনিয়া সত্যবতী আশ্বস্ত এবং খুশি হইলেন। ঈষৎ কৌতুক কবিয়া প্রশ্ন কবিলেন, 'কিন্তু দু'তিন টাকায় কোন্ হাল ফ্যাশানেব জিনিষ পাচ্ছ?'

রজত কহিল, 'কেন, খদ্দবেব শাড়ি।'

শুনিয়া সত্যবতী প্রায় চিৎকাব কবিয়া উঠিলেন। মর্ম্মান্তিক ভীতিব সঙ্গে কহিলেন, 'ওবে সর্ব্বনাশ! অ্যাঁ, বলচ কি তুমি? কথা শোনো, এমন শত্রুতাটি আমাব সঙ্গে ক'বো না, বজত—বুড়িকে আব এ-শাস্তি দিও না, বাবা।—ওরে গয়াবাম, শুনচিস্—ঐ যাঃ, চপ্‌গুলি এখন না ভাজলে—কদ্দিন্ পবে তবে তো লোকে সতবঞ্চিও পবতে আবম্ভ কববে—' বলিয়া বাতকে উপেক্ষা কবিযা সভয়ে তিনি বোধ কবি বা চপেব উদ্দেশেই দ্রুত প্রস্থান করিলেন।

ইতিমধ্যে সোফাটায় উপুড হইয়া পডিয়া মন্দালিকা অদম্য হাসিতে লুটোপুটি খাইতে আরম্ভ কবিয়া দিয়াছে। খদ্দবেব ভয়ে মায়েব মুখমণ্ডলের যে চেহাবা হইয়াছিল তাহা যতই তাব মনে পডিতে লাগিল, হাসিব তোড়ে ততই সে ফাটিয়া পডিবাব উপক্রম হইল। সেই হাসিব বেগ দমন কবিয়া যখন সে সোজা হইয়া দাঁডাইল, তখন তাব দুই চোখ দিয়া কান্না গড়াইয়া পডিতেছে—এমন তীব্র তাব হাসি।

সারাটা দুপুর রজত মন্দালিকার সঙ্গে ক্যারম্ খেলিয়া কাটাইল। বেচারি মন্দালিকা যতই হারে, ততই সে পালাইতে চায়। কিন্তু রজতও নাছোড়বান্দা। অবশেষে মন্দালিকা কে অসম্ভব ভাবে অসংখ্যবার হারাইয়া দিয়া সে কহিল—'যাঃ, এইবার পালা। এই রকম ভাবে জগতের সমস্ত মেয়ে পুরুষের কাছে হেরে যায়!'

মন্দালিকা কহিল, 'ঈস্, তাই না, আরও কিছু।'

'হ্যাঁ, তাই,' রজত কহিল। 'একশো বার তাই। তোমরা কি পার, জানো?'

'কি শুনি?'

'ঘরকন্না করতে, চা বানাতে। অতএব যাও, চায়ের জোগাড় করো। শুধু মাত্র—কি বলে চায়ের বিজ্ঞাপনে—এই পারিবারিক পানীয় পান করে এবার আমি পালাব।'

'আর চা যদি না করি?'

'পিঠে তাল পড়বে।'

'তবু যদি সয়ে থাকি?'

'তবে বুঝব, তুমি প্রকৃতই বঙ্গললনা—কিল খেয়ে নীরবে হজম করতে পার।'

সত্যবতীর ইচ্ছা ছিল, চায়ের সময় সাড়ম্বরে উপস্থিত থাকিয়া খদ্দরের অপকারিতা সম্বন্ধে এক নিবন্ধ আওড়াইবেন। কিন্তু বিকাল হইবার পূর্ব্বেই রজত চুপে চুপে মন্দালিকাকে দিয়া চা প্রস্তুত করাইয়া খাইয়া চম্পট দিল।

দুপুরের প্রশস্ত নিদ্রার পর নিচে নামিয়া কাণ্ড দেখিয়া তো সত্যবতী মেয়ের উপর খড়্গহস্ত। কিন্তু মন্দাও দমিবার মেয়ে নয়। কহিল, 'বাঃ রে, আমি কি করব? আমাকে বল্লেন চা করতে, আমি বলব—না,

আমি করবো না? চা না খেয়ে তো যায় নি; তবে আমি শুধু শুধু গাল খেয়ে মরচি কেন?'

'গাল খেয়ে মরচি কেন!' সত্যবতী রাগতস্বরে কহিলেন। 'ওর না আছে মা, না আছে বাপ। একটু আদর-যত্ন পেতে চায়, তা কি পাবার জো আছে! নাঃ, ঘাট হয়েচে, জন্মের শিক্ষা হয়েচে। এই বংশের ইতিহাসে কেউ যা করেনি, আমি তাই করতে গেলুম; মেয়েকে ইস্কুলে পড়িয়ে এখন তার উপযুক্ত ফল ভোগ করচি—'

মন্দা রুষ্ট ভঙ্গিতে দাঁড়াইয়া কহিল, 'কেবলই চেঁচাচ্চ। কেন, হয়েচে কি? কোন্ মহাভারতটা অশুদ্ধ হয়েচে?'

সত্যবতী নেপথ্যবাসী সমস্ত অশরীরী জীবদের সাক্ষ্য মানিয়া সশব্দে আক্ষেপ জানাইয়া কহিলেন—'শোন, একবার মেয়ের কথাটা সবাই শোন। বল্লে, কোন্ মহাভারত অশুদ্ধ হয়েচে। ওরে হাবা মেয়ে, চা কি একটা খাবার? এই যে আমি রাতের শরীর নিয়ে উনানের আঁচে পুড়ে দুপুর পর্য্যন্ত সব ভাজলুম, গজা বানালুম পান্তুয়া করলুম, এ সব কার জন্যে? বলে কিনা, চা করে' দিয়েচি। চা দিয়ে হয় কি? খাবার গেলার সাহায্য করে বৈ তো—ওরে, ও গয়ারাম, শুনচিস্ মুখপোড়া—এই যে সমস্ত খাবার ফেলা গেল—'

'হ্যাঁ, ফেলা গেল, না আরও কিছু। সব আমি একলাই শেষ করতে পারি!' বলিয়া মন্দালিকা সকৌতুকে সত্যবতীর এত পরিশ্রমের মিষ্টি-গুলির দিকে অগ্রসর হইল।

সত্যকথা বলিতে কি, মন্দালিকা নিজেও বড় হতাশ বোধ করিতে-ছিল। এই হতাশা জটিল মনস্তত্ত্বের অন্তর্গত, কেননা তার ব্যাখ্যা সহজ নয়। ঘটনাটা এই প্রকার:—চা খাইতে খাইতে বঙ্কিত কহিয়া-ছিল—'এই মন্দা, এখন গান গাইবি তো?' মন্দা জবাব দেয়—'ঈস, কিছুতেই না।' বঙ্কিত একটু ভাবিয়া কহিয়াছিল, 'আচ্ছা, আজ

থাক, আজ একটু বেরুবো।' আর পীড়াপীড়ি না করিয়াই রজত উঠিয়া গিয়াছিল।

পুনরায় অনুরুদ্ধ হইলেও হয়তো মন্দা গাহিত না, কিন্তু যে অনুরোধ আসিল না, তার জন্য এক গভীর আক্ষেপে এই কিশোরী অদ্ভুত মনোবেদনা বোধ করিতে লাগিল। রজতদার এমন কি তাড়া যে, গান শুনিবার জন্য একটুও জবরদস্তি করিবে না! এমন রাগ ধরিতেছে রজতদার উপর! ইস্, কত না কাজ!—

মিষ্টি এবং মায়ের বকুনি একসঙ্গে শেষ করিয়া মন্দালিকা উপরে উঠিয়া আসিল। দোতলার ছোট ব্যাল্‌কনিতে দাঁড়াইয়া খামখা সুদূর পথের দিকে চাহিয়া রহিল। বড় ক্লান্ত বোধ হইল, ঠিক করিল, চুল আজ আর বাঁধিবে না।

মা বিশেষ করিয়া তারই জন্য খাবার তৈরি করিয়া রাখিয়াছেন, এই কথা রজতদাকে জানাইলে সে সম্ভবত অপেক্ষা করিত। কিন্তু মায়ের এই মহৎ প্রচেষ্টার কথা মন্দারও সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিল, এমন কি, জিনিষগুলি না দেখিয়া কেবলমাত্র বর্ণনা শুনিলে ইহার প্রাচুর্য্য প্রত্যয় করা মুস্কিল হইত। 'বাঃ রে, আমার দোষ কি। আমি বুঝি কিছু জানতাম। না খেয়েছে, বয়ে গেছে।'—মন্দালিকা মনে মনে বারম্বার বলিল। কিন্তু তবু স্বস্তি পাইল না।

নিজের উপর রাগিয়া মন্দালিকা পড়ার ঘরে প্রবেশ করিল। দিন-পঞ্জিকার অঙ্কগুলির উপর শুভ্র সরু তর্জ্জনী স্থাপন করিয়া আগামীকল্য সোমবার হইতে পরবর্ত্তী রবিবার পর্য্যন্ত সংখ্যাগুলি গণিয়া দেখিল। অতঃপর চেয়ারটায় যাইয়া বসিয়া পড়িয়া টেবিলে ঝুঁকিয়া সশব্দে শুরু করিল—'অস্তি কস্মিংশ্চিৎ বনোদ্দেশে দীর্ঘরাবো নাম—'

# আট

সত্যানন্দবাবুর বাড়ি হইতে বাহির হইয়া রজত দক্ষিণ দিকে হাঁটিতে আরম্ভ করিল। বিশেষ কোনও উদ্দেশ্য ছিল না, কিন্তু সত্যানন্দের বাড়ির সমস্ত বিলাস-উপকরণ এবং আরাম-আয়োজনপূর্ণ কক্ষের মধ্যে অকস্মাৎ রজতের অস্বস্তি বোধ হইতে আরম্ভ করিল। চতুর্দ্দিকের ঐশ্বর্য্যের আড়ম্বরগুলি, কৌচ, চেয়ার, ছবি, আলোর ঝাড়, বিচিত্র রঙিন-পর্দ্দার গুণ্ঠন সহসা যেন নিঃশ্বাসের পথে আসিয়া দাঁড়াইল—যেন ভগবানের দেওয়া বাতাসের প্রবাহ আটকাইবার জন্য উহারা ষড়যন্ত্র করিয়াছে। ইহার প্রতিক্রিয়া স্বরূপ পৃথিবীর উদার বিস্তৃতির মধ্যে পালাইয়া মুক্তি পাইবার জন্য একটা দুর্দ্দমনীয় আকাঙ্ক্ষা রজতকে পাইয়া বসিল। ইচ্ছা হইল, একটা ছুট দিয়া এই ধূলিধূমসমাকীর্ণ, ইষ্টক-স্তূপ-কণ্টকিত নগরীর খণ্ডিত আকাশের অভিশাপ হইতে পালাইয়া যাইয়া শস্যসুগন্ধি উন্মুক্তির মধ্য হইতে প্রাণপূর্ণ একটি নিঃশ্বাস লইয়া আসে; পদ্মার রূপালী জলরাশির মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া দুগ্ধস্নিগ্ধ সলিল আলোড়িত করিয়া তোলে। প্রকৃতির মধ্যে ছুটিয়া যাইবার এই প্রবৃত্তি রজতকে কখনও কখনও এমনি হঠাৎ নাচাইয়া তোলে, পূর্ব্বমুহূর্ত্তেও একটু নোটিশ দেয় না।

সত্যানন্দবাবুর বাড়ি হইতে বাহির হইয়া সত্যই পদ্মায় পৌঁছান গেল না, কিন্তু বাহিরের খোলা আকাশের তলায় আসিয়া বঙ্গোপসাগর হইতে উড়িয়া-আসা দক্ষিণ-বাতাসের সংস্পর্শে রজতের নিঃশ্বাস বন্ধ-হওয়া ভাবটা দূর হইল। স্থির করিল, ট্রাম রাস্তায় পৌঁছিয়া যে-কোনও একদিকের গাড়িতে চাপিয়া বসিবে, এবং টার্‌মিনাস্ হইতে হাঁটিতে হাঁটিতে যে-কোনও একদিকের গ্রামের দিকে যাত্রা করিবে। অপরিচিত রাজ্যে উদ্দেশ্যহীনভাবে চলিবার এক অদ্ভুত মাদকতা চিরকালই রজতকে মাতাইয়া তুলিয়াছে। কতদিন এমনি অজানা পথে চলিতে চলিতে সে ভাবিয়াছে—একদিন পথ

ভুল করি না কেন, অপরিচিত জনপদে, অরণ্যসঙ্কুল প্রান্তরে, অন্তহীন ধানক্ষেতের মধ্যে শুধুমাত্র তারার আলোয় পথ চলিতে চলিতে অবশেষে হয়তো এক কৃষকের মৃদু-আলো-জ্বালা কুটিরদ্বারে যাইয়া আঘাত করিব। নয়তো উন্মুক্ত প্রান্তরের এক রাঙা পলাশগাছের তলায় ক্লান্ত হইয়া শুইয়া পড়িব—জোনাকি জ্বলিবে, নিভিবে, বিবিধ পতঙ্গ বিচিত্রসুরে সারারাত ধরিয়া অতি কাছাকাছি গুঞ্জন করিতে থাকিবে, প্রহরে প্রহরে কালপুরুষ স্থান বদলাইয়া চলিবে। কাঁচাধানের গন্ধ লইয়া আসিবে বাতাস, সুদূর লোকালয় হইতে কুকুরের ক্ষীণ ডাক শোনা যাইবে—কী অপূর্ব্ব হয় সত্যসত্যই যদি একদিন এমন ঘটনা ঘটে। সেই—'বিজন ভুঁয়ে ছিলেম শুয়ে মেঠো-ফুলের পাশাপাশি।' শুধু কবিতায় নয়, এমন অভিজ্ঞতা শৈশবে তাহার বহুবার হইয়াছে, তখন প্রকৃতির সাথে তার সংযোগ সুগভীর ছিল—ধরণীর নিজ হস্তের তত্ত্বাবধানেই সে বড় হইয়া উঠিয়াছে।

কে এই মেয়েটি। এদিকে ম্যাডক্স্-স্কোয়ারের কোণা, একটা কৃষ্ণচূড়া গাছ, তারপরই রাস্তার উপর আগাইয়া-আসা বারান্দার উপর অলস বৈকালের ধূসর আলোয় দূরত্ব-অস্পষ্ট একটি তরুণী-মূর্ত্তি দাঁড়াইয়া। দেখিয়া সচকিত রজত রাস্তার মধ্যখানেই দাঁড়াইয়া পড়িল। নিজের প্রায় অগোচরে একটা কথা মুদ্রিত ওষ্ঠ ঠেলিয়া বাহির হইয়া আসিল—সুমিত্রা! কিন্তু এও কি সম্ভব? কেমন করিয়া আসিবে সুমিত্রা। স্বপ্ন হইতে কেমন করিয়া এখানে আসিয়া সে উদিত হইবে? মনের মধ্যে এ কী অবিশ্বাস্য মাতলামি শুরু হইল। জগতে সুমিত্রা বলিয়া তবে কি সত্যই একজন আছে!

স্বপ্নগ্রস্তের মত রজত অগ্রসর হইয়া বাড়িটার নিকটবর্ত্তী হইল। সন্দেহের আর অবকাশ নাই। রেলিঙের উপর বাঁ হাতের কনুই ভর

করিয়া হাতের পাতায় গাল হেলাইয়া সত্যসত্যই সুমিত্রা পার্কের ক্রীড়ারত শিশুদের দিকে চাহিয়া আছে। এলোখোপাটা পড়িয়াছে হেলিয়া, শুভ্র লম্বা আঙুলের ডগাগুলি কেশজালের মধ্যে গোঁজা, দীর্ঘ আঁখিপল্লব এবং ঈষৎ কুঞ্চিত ভ্রূ-যুগলের তলায় প্রত্যূষের রৌদ্রহীন আলোর মতো উজ্জ্বল চোখ দুটি যেন পার্কের শিশুদের ছাড়াইয়া বহুযোজন দূরে চলিয়া গিয়াছে।

এত সুন্দর। এমন অপূর্ব্ব সুন্দর, এমন তুলনাহীন সুন্দর সুমিত্রা! মুগ্ধ হইয়া রজত ভাবিতে লাগিল—এ তো রূপকথার অতিকোমল রাজকন্যা নয়, এ নারী স্বমহিমাতে প্রদীপ্ত, মননশক্তিদ্বারা আত্মস্থ, স্বকীয়তায় অনন্যা। পূর্ব্বজন্মের কোন্ প্রদীপালোকিত অন্ধকারে ইহার সঙ্গে দেখা হইয়াছিল আমার?

'দেখুন, শুনচেন, আমি একটু কথা বলতে চাই।' রজত উপর দিকে মুখ তুলিয়া ঈষৎ উচ্চস্বরে ডাকিয়া কহিল।

রজত ছাড়া অন্য কেউ অপরিচিতা কোনও মহিলাকে এমন ভাবে আহ্বান করিতে পারিত কিনা সন্দেহ। রজতের দ্বারা কিছুই অসম্ভব নয়, যাহা সে অন্যায় বলিয়া মনে না করে, অনায়াসেই তাহা সে করিতে পারে—ভদ্রসমাজে সেটা সচল কি অচল তাহা তার বিচার না করিলেও চলে। রজত কহিত—এ-অভ্যাস পদ্মার কাছে পেয়েছি, পদ্মা আদব-কায়দার ধার ধারে না। কিন্তু রাস্তা হইতে এমন করিয়া একজন অপরিচিতাকে ডাকিতে পদ্মাও হয়তো সঙ্কোচ বোধ করিত।

'আমি একটু কথা বলতে চাই, শুনচেন।' রজত আবার হাঁকিয়া কহিল।

এইবার সুমিত্রা বিস্মিত হইয়া নিচের দিকে তাকাইল এবং রজতকে দেখিতে পাইল। অর্দ্ধসেকেণ্ডকাল একটা বিব্রত অবিশ্বাস তার সুগৌর

মুখমণ্ডলের উপর হাল্কা মেঘছায়ার মতো অচঞ্চল হইয়া রহিল, দীর্ঘ আঁখিপল্লব দুটি হইল অধিকতর উর্দ্ধায়িত, দুই চোখ সতর্ক প্রহরীর মতো এক মুহূর্ত্তেই জিজ্ঞাসু হইয়া উঠিল, ঠোঁটের রেখা কঠিনতর হইল—তারপর সহসা স্মিত প্রসন্নতায় সুমিত্রার সারাটা মুখ প্লাবিত হইয়া গেল।

স্যাণ্ডেলের দ্রুত আঘাতে সচকিত গুঞ্জরণ উঠিল সিঁড়িতে। চুড়িবালার নিক্কণ দেওয়ালের গায়ে প্রতিধ্বনিত হইল, অবিন্যস্ত চুল এলোমেলো হইয়া বাতাসে গন্ধের স্পর্শ বিতরণ করিয়া ত্রস্ত আঙুলের লীলায়িত তৎপরতায় খোঁপায় বাঁধা পড়িল। সম্মুখের দরজার এক পাট্ খুলিয়া দাঁড়াইয়া সুমিত্রা কহিল, 'আসুন। ভেতরে আসুন।'

'আপনাকে খুবই বিস্মিত করচি, কেমন?' রঞ্জত কৈফিয়ৎ হিসাবে কহিল। 'ভদ্র-সমাজের আইন অনুসারে আমার আচরণ নিরতিশয় গর্হিত, এতে আপনার মতো আমারও সন্দেহ নেই।—কিন্তু আমাকে কি আপনি চিনতে পারচেন?'

সুমিত্রা মৃদুস্বরে কহিল, 'হ্যাঁ।'

'বাঁচালেন,' রঞ্জত একটুখানি হাসিয়া কহিল। 'নইলে অভদ্রতাটা আমার অধিকতর বিসদৃশ দেখাত। কিন্তু দেখুন, পদ্মার পাড়ে আমার বাড়ি, আমার কাছ থেকে ড্রয়িং-রুমের আদব-কায়দা আশা না করলেই আমার উপর সুবিচার করা হবে।'

সুমিত্রা বিব্রত হইয়া কহিল, 'ওঃ, আপনার বাড়ি পদ্মার পাড়ে বুঝি?'

'পদ্মার বুকে বললেও হয়,' রঞ্জত কহিল। 'আমাদের আদিম বাড়ি পদ্মার জঠরে।—কিন্তু বংশ-পরিচয় দিতে আসি নি। আপনার কাছে সেদিন কিঞ্চিৎ অপরাধ করেছিলাম, এবং তার জন্য কিছু দুঃখ-প্রকাশ করার ইচ্ছাও হয়েছিল, কিন্তু অবকাশ হয়নি। পথ-চলতে

হঠাৎ আপনার দেখা পেলাম আজ; তাই সেদিনের অপরাধটা স্বীকার করে অন্যায়ের লাঘব করতে চাই। কিন্তু কেবলই সন্দেহ হচ্ছে, একটা দোষ স্খালন করতে এসে অন্যদিকে দোষের মাত্রা বাড়িয়ে ফেললাম না তো?'

সুমিত্রা বিস্মিত হইয়া কহিল, 'কোন্ অপরাধের কথা বলচেন? আর অন্য কোন্ দিকেই বা তার মাত্রা বাড়িয়ে ফেলবেন? বসুন এই চেয়ারটাতে।'

না-বসিয়াই রজত কহিল, 'অপরাধ অকৃতজ্ঞতা—যার বড় দোষ আর নেই। নিজেকে বিপন্ন করে আপনি যখন আমাকে মার খাওয়ার হাত থেকে সেদিন বাঁচালেন, কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন না করে আমি পৌরুষ প্রদর্শন করলাম। বল্লাম—মার খাওয়া থেকে বাঁচিয়ে আপনি আমাদের অপমান করেছেন। সেদিনের সেই রূঢ়তার জন্য আমি লজ্জিত। অকৃতজ্ঞতা পুরুষের আদিম স্বভাব, জানেন তো?' বলিয়া রজত হাসিয়া ফেলিল।

সুমিত্রাও ঈষৎ হাসিয়া কহিল, 'না, জানিনে তো।'

'তবেই তো মুস্কিলে ফেললেন—কৈফিয়ৎটা ঠিক টিকলো না দেখছি। কিন্তু অপরাধ স্বীকার করতে আসায় অপরাধের মাত্রা বাড়েনি তো?—'

'নিশ্চয়ই বেড়েচে। পদ্মার পাড়ে বাড়ি বলে আদব-কায়দা মানেন না—কথাটা এমন গর্ব্বিতভাবে বলেছিলেন যে, আমি প্রথমটায় সত্যি বলে বিশ্বাস করেছিলাম। কিন্তু এই ক্ষমা-চাওয়ার বাড়াবাড়িটা তো পদ্মার মত শোনাচ্চে না।—চেয়ারটায় বসুন, কিন্তু ক্ষমা-টমার কথা থাকুক। পদ্মার সঙ্গে এসব খাপ খায় না।'

'সত্যিই নয়', বলিয়া ঈষৎ লজ্জিত হইয়া রজত কাছের চেয়ারটায় বসিয়া পড়িল। কহিল, 'সত্যি, ক্ষমা-টমা চাওয়া আমার ধাতে পোষায়

না। তবে ইচ্ছার ওপর অত্যাচার করাই নাকি সভ্যতা—আর আমাকে অসভ্য বল্লে কিছুতেই তা আমি সহ্য করবো না।'

সুমিত্রা স্মিত হাসিয়া কহিল, 'না, সে ভয় নেই। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, রজতবাবু, তা আমি বলব না।' বলিয়া সে নিজেও হলুদ-রঙের খদ্দরে মোড়া ছোট কৌচটায় বসিয়া পড়িল।

রজতবাবু! বিস্ময়ে প্রথমটায় রজতের মুখ দিয়া কথাই বাহির হইল না। রজতবাবু! স্পষ্ট করিয়া সুমিত্রা রজতবাবু উচ্চারণ করিল। কিন্তু এ-ও কি সম্ভব! নিউটনের মাধ্যাকর্ষণ আবিষ্কারও বুঝি এত বিস্ময়কর নহে। রজত প্রায় আকাশ হইতে পড়িয়া সবিস্ময়ে প্রশ্ন করিয়া বসিল, 'আশ্চর্য! আমার নামটা জানলেন কি করে?'

ইহার সরাসরি কোনও জবাব না দিয়া সুমিত্রাও প্রশ্ন করিল, 'আপনি আমার নাম জানেন?'

'জানি।'

'জান্‌লেন কি করে?'

'ডাকতে শুনেছি।'

'আমিও ঠিক তেমনি করেই জানি।'

রজতের বিস্ময় তাহাতে কিছুমাত্র কমিল না। সে অবাক হইয়া ভাবিতে লাগিল, সুমিত্রার সন্নিধানে কে কবে তার নাম ধরিয়া ডাকিয়াছে? সেদিনের পূর্ব্বে কি সুমিত্রা কখনও তাকে দেখিয়াছে? কেমন করিয়া সে শুনিল রজতের নাম?

'আপনাকে অনেকেই চেনে, শুধু আমিই চিনতাম না।' সুমিত্রা কহিল। 'মাঠের মাঝখানে দাঁড়িয়ে সেদিন যখন আপনি মার খাওয়ার জন্য দৃঢপ্রতিজ্ঞ হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন'—এইখানে সুমিত্রা সামান্য কৌতুকের হাসি হাসিল—'তখন আমাদের স্বেচ্ছাসেবকদলের একাধিক ছেলে আপনাকে সেখানে দেখে বিস্ময় বোধ করেছিল। আপনি নাকি মস্ত বড়লোক, মস্ত জমিদার!

এসব সদ্‌গুণের জন্য ওদের স্থিরবিশ্বাস ছিল যে, আপনি যে-কোনও সৎ-কার্যের একান্ত অযোগ্য—'

'চমৎকার ধারণা তো!' রজত সকৌতুকে কহিল।

'হ্যাঁ, খুব উচ্চ ধারণা,' মৃদু হাসিয়া সুমিত্রা কহিল। 'তাই মারের প্রতি আপনার সেই লোলুপতা দেখে এক নিমেষে ওদের দৃষ্টি-ভঙ্গি গেল বদ্‌লে। এমন মন্তব্য ওরা করতে লাগল যা আপনাকে যদি বলি, আমার মুখেও চাটুবাদের মতো শোনাবে। কিন্তু প্রশংসার কথা আমি আর ব্যাখ্যা ক'রে শোনাতে পারব না।··আমাদের নিজেদের বাড়িতেও আপনার একজন অ্যাড্‌মায়ারার আছে—আমার সন্তু-দা। সন্তু-দা আমার পিস্‌তুত ভাই, য়ুনিভার্সিটিতে পড়ে, আপনার এক ক্লাস নিচে। আপনার সঙ্গে ওর পরিচয় নেই—কিন্তু তাতে ওর আট্‌কায় না। সন্তু-দাও সেদিন সঙ্গে ছিল।'

'উনি বাড়ি আছেন? দেখলে হয়তো আমি চিনতে পারি।' রজত শুধাইল।

'বাড়ি নেই, তবে এক্ষুণি আসবে। আপনি একটু বসুন না।'

সন্তু-দা আসিবার আগেই রজত অনেক খবর জানিতে পারিল। সুমিত্রার বাবা স্ট্রেইট্ সেটেল্‌মেণ্টে সরকারী চাকুরি করিতেন। তিন বৎসর পূর্ব্বে তাঁর মৃত্যু হইলে সুমিত্রা ও তার মা কলিকাতায় আসে। পুরুষের মধ্যে বাড়িতে এক সুমিত্রার পিস্‌তুত ভাই সন্তোষ। সুমিত্রার মা দিবারাত্রির অধিকাংশ সময় সন্ধ্যাহ্নিক লইয়া থাকেন—যে-জগতে তার আশা করিবার আর কিছু নাই, সে-জগৎ হইতে দৃষ্টি অপসারিত করিয়া তিনি এক অজানা জগতের জন্য পথ-হাত্‌ড়াইয়া মরিতে'ছন। 'সন্ধ্যা-পুজোয় বিশ্বাস আমার বড়ই ক্ষীণ,' সুমিত্রা কহিল, 'কিন্তু মায়ের সঙ্গে সব সময়েই আমি সায় দিই, সন্তু-দার মতো তর্ক করি নে। এই অদ্ভুত খেলা নিয়ে মা যদি

একটু আনন্দ পান, তবে থাক্ না।' তারপর কহিল—'সন্তু-দা পড়ে ফিলজফি, আর বড় বড় তর্ক করে। কোনও সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারে না, এবং ওর গুরুদের মতোই সহজকে ঘোলাটে করে' তোলে, এবং যুক্তি-জাল যখন আর কোনও স্থির-সিদ্ধান্তে পৌঁছে দিতে পারে না, তখন মিস্‌টিসিজ্‌ম্‌-এর মধ্যে আশ্রয় নিয়ে আত্মপ্রসাদ লাভ করে।—আর আমি? কলেজেই পড়তাম, ছেড়ে দিয়েচি। আমার ধৈর্য্য বড় কম। কিছু গণ্ডগোল হলে পড়ায় আর মন বসাতে পারি নে—তা সে-গণ্ডগোল যে-প্রকারেরই হোক।—ঐ বুঝি সন্তু-দা এল।—শুনচো, সন্তু-দা, দেখে যাও, কে এসেচেন। তুমি কল্পনাই করতে পারবে না—'

সন্তোষ ভিতরে প্রবেশ করিয়া সবিস্ময়ে চেঁচাইয়া উঠিল—'রজতবাবু!'

সুমিত্রা কৌতুক করিয়া কহিল, 'চরকাকে অবজ্ঞা করতে না? একবার চরকার ক্ষমতাটা দেখলে। আলাদীনের আশ্চর্য্য-প্রদীপ।'

'চরকা! বিস্ময়ের সঙ্গে সন্তোষ কহিল। 'চরকা কি করল?'

'কেন, রজতবাবুকে এনে হাজির করল!' এবং পাঁচ মিনিটের মধ্যে রজত টের পাইল দর্শন এবং রাজনীতি এ-বাড়িকে সংগ্রাম-ক্ষেত্র বলিয়া বাছিয়া লইয়াছে। সন্তু-দার দর্শন এবং সুমিত্রার রাজনীতি পরস্পরকে ক্ষমা করে না—সুগভীর ব্যঙ্গ করিয়া পরস্পরকে বাতিল করিতে চেষ্টা করে।

এমন সময় সিঁড়ির কাছ হইতে অনুচ্চ আহ্বান আসিল—'সুমিত্রা, কোথা গেলি, মা। আমার ঘিয়ের বাতিগুলি এবার জ্বেলে দে। দেশ-লাইটা কোথায় রাখলাম খুঁজে পাচ্চি নে।—'

'যাচ্চি মা,' সাড়া দিয়া সুমিত্রা তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইল। 'একটু বসুন,' রজতের দিকে ফিরিয়া কহিল, 'আমি এখুনি আসচি। মার এখন আরতি হবে কিনা, পঞ্চপ্রদীপটা জ্বালিয়ে দিয়ে আসি।' বলিয়া একটু স্মিত হাসিয়া দরজা দিয়া বাহির হইয়া গেল।

কিন্তু পরক্ষণেই ফিরিয়া আসিল, সঙ্গে তপঃকৃশা এক বৃদ্ধা

ক্ষীণদৃষ্টিশক্তিকে প্রাণপণে সংহত করিয়া ধীরে অগ্রসর হইয়া আসিলেন। ইনি কে, রজতের বুঝিতে এক মুহূর্ত্তও বিলম্ব হইল না, সকল জপ ও আরাধনার জ্যোতি যেন এই বৃদ্ধার মুখমণ্ডল ঘিরিয়া প্রদীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। এমন প্রশান্ত সমাহিত সেই মুখ যে, দেখিলে সন্দেহ থাকে না, মনের মধ্যে অসীম বিত্ত তিনি লাভ করিয়াছেন। সুমিত্রার ব্যক্তিত্বের উদ্ভব কোথা হইতে হইয়াছে, এবার রজত তাহা সহজেই আবিষ্কার করিল।

সুমিত্রা মায়ের পিঠ হাত দিয়া আলগোছে বেষ্টন করিয়া অগ্রসর হইয়া আসিল। কহিল, 'রজতবাবু, আমার মা।—মা, এর কথা তোমাকে দেশবন্ধু পার্কের মিটিং থেকে ফিরে এসে বলেছিলাম না?—মার-খাওয়া থেকে বাঁচিয়েছিলাম বলে কি রাগ!—আচ্ছা করে ধম্‌কে দিয়েছিলেন। বলেছিলেন—মার খেতে আমার খুব ভাল লাগে। বলেছিলেন না, রজত-বাবু?—এইখানে একটু বসো মা—এক্ষুণি আমি প্রদীপ জ্বেলে দেব—'

বৃদ্ধা কহিলে, 'বাঃ, বড় সুন্দর ছেলেটি তো—চমৎকার ছেলে! থাক্, বাবা, থাক্—চিরজীবী হয়ে থাক। তোমার নাম কি বল্লে, রজত?'

'আজ্ঞে, হ্যাঁ।'

'বাড়ি কোথা বাবা?'

'বিক্রমপুরে। গ্রাম—কোটালনগর।'

'কোটালনগর!' বৃদ্ধা যেন উৎসুক হইয়া উঠিলেন। 'দুর্গাপ্রসন্ন চৌধুরি যে-গ্রাম পত্তন করে গিয়েছেন, সেই কোটালনগর নয় তো?'

'দুর্গাপ্রসন্ন চৌধুরি আমার বাবা।' রজত অপূর্ব্ব এক গর্ব্ব যথাসাধ্য সংযত করিয়া কহিল।

'দুর্গাপ্রসন্নবাবুর ছেলে!' বৃদ্ধার মুখ খুশিতে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। 'তাই তো বলি, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মার খেতে চাওয়া এ তো যার তার কর্ম্ম নয়!—আমরাও ও-অঞ্চলেরই লোক, রজত। বেতবন গ্রামে আমার শ্বশুরবাড়ি ছিল। তোমার বাবার নাম ওদিকের লোক কে না জানে।'

পিতার এই প্রশংসায় রজতের যেন কান্না আসিবার উপক্রম হইল। এক মুহূর্ত্তে ইহাদের এমন পরমাত্মীয় মনে হইল যে, তাহা বলিবার নয়। মনে হইল, এমন স্বজন আর তাহার কেহ নাই। তাই উঠিয়া যাইবার প্রাক্কালে বৃদ্ধা যখন রজতকে একদিন খাওয়ার নিমন্ত্রণ করিবার জন্য সুমিত্রাকে বলিয়া গেলেন, তখন রজত কিছুই বিস্ময় বোধ করিল না—মনে হইল, ইহা তার পাওনা, নিমন্ত্রণ না পাইলেই সে বিস্মিত হইত।

সুমিত্রা কহিল, 'কালকে সোমবার। এই সোমবারের পরের সোমবার বিকেলে এসে চা খান। এত সব মিটিং আর কাজ আছে যে, তার আগে হয়েই উঠ্‌বে না।'

রজত কহিল, 'বেশ। যদি ততদিন বেঁচে থাকি।'

সুমিত্রা হাসিয়া কহিল, 'যদি ততদিনে জেলে না যাই, তবে নিশ্চয়ই চা পাবেন।—আর আমি না থাকলেও তুমি অন্তত এ-ভদ্রতাটুকু করতে পারবে, নয় সন্তু-দা ?'

সন্তু কহিল, 'কিন্তু ফিলজফিক্যালি বলতে গেলে, তোমাদের এই জেলে-যাওয়ার ইডিয়োলজি—'

'একটা মায়া, কেমন ?' বলিয়া হাসিতে হাসিতে সুমিত্রা রজতকে দরজা খুলিয়া দিল।

## নয়

আরব্যোপন্যাসের এক রজনীর মধ্য দিয়া হাঁটিয়া রজত হস্টেলে ফিরিয়া আসিল। শহরে এত ট্রাম, এত বাস্, গাড়ির অন্ত নাই—কিন্তু সে-সবের কথা তাঁর মনেও পড়িল না। অনাস্বাদিতপূর্ব্ব এক আনন্দের উন্মাদনায় প্রায় নৃত্য করিতে করিতে নিজের অজ্ঞাতেই রজত সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করিয়া

আসিল। সুমিত্রা! সুমিত্রা! কোথায় ছিলে এত দিন, সুমিত্রা! মনে হয়, জন্মজন্মান্তর ধরিয়া তোমার সঙ্গে আমার পরিচয়—কালের মহাপ্রবাহে ভাসিতে ভাসিতে আমি সংখ্যাতীত জন্মে তোমার ঘাটে উপস্থিত হইয়াছি। তুমি আমার অচেনা নও, তুমি পরমাত্মীয়।

মনের মধ্যে রজত বারম্বার সন্ধ্যাবেলার স্মৃতি টানিয়া আনিল। ভাবিতে লাগিল—কী সঙ্কোচ-জড়তাহীন সুন্দর সুমিত্রার ব্যবহার! কুণ্ঠা নাই, ভীরুতা নাই, স্ত্রী-সুলভ অতি-কোমলতার ছন্দিত বিলাস নাই। পুরুষের ব্যবহারের মতো তাহা অকুণ্ঠ, রৌদ্রের মত তাহা সুস্পষ্ট। অথচ তার মধ্যে ব্যক্তিত্বের কি দুর্দ্দমনীয় আকর্ষণ, তেজোদৃপ্ত দেহবল্লরীতে কী সুনিবিড় জীবন-প্রাচুর্য্য, মুখ-মণ্ডলে মনন-শক্তির কী অভাবনীয় বিকাশ! জ্যোৎস্নার মতো যে নারী রহস্যময়ী, নর্ম্ম-সহচরীরূপে তাহাকে পুরুষ কল্পনা করে, যে-নারী রৌদ্রের মতো সুস্পষ্ট ও বিদ্যুতের মতো সহজ, সে নর্ম্ম-সহচরী নহে, সে বন্ধু—সচিব, সখী—চৈতন্যের মধ্যে সে প্রেমাপ্লুত শ্রদ্ধার আসন অধিকার করিয়া বসে। তার সঙ্গে প্রেমে পড়িতে ভয় হয়, অথচ নিজেকে নিবেদন না করিয়া উপায় থাকে না।

মোহগ্রস্তের মত কয়টা দিন রজতের কোথা দিয়া যে কাটিয়া গেল, সে টেরও পাইল না। কিন্তু ইহা সে নিশ্চিত টের পাইল যে, এ-আবেগ তার সাময়িক নহে, এমন আবেগ তার জীবনে পূর্ব্বে কখনও আসে নাই; হয়তো এমন আর কখনও আসিবে না। এক অদ্ভুত রস-সঞ্চারে রজতের সমস্ত অস্তিত্ব স্পন্দিত হইয়া উঠিল।

ইতিমধ্যে রজত সুমিত্রার সম্বন্ধে আরও খবর জানিয়াছে। দেখিল, প্রায় সকল ছেলেই সুমিত্রার নাম জানে, অনেকেই তাহাকে চেনে। সুমিত্রার সংগঠন-ক্ষমতা, সুমিত্রার কষ্ট-সহিষ্ণুতা, সুমিত্রার অমিত সাহসের কাহিনী লোকমুখে বহুল প্রচারিত। রজতের বিস্ময় হইতে লাগিল এই ভাবিয়া যে, এমন মেয়ের নাম এতকাল কি করিয়া তাহার অজ্ঞাত ছিল।

রাজনীতি হইতে দূরে থাকাই বোধ হয় ইহার কারণ। কিন্তু আবিষ্কারের আনন্দও কম নহে।

একটা অদ্ভুত গর্ব্বে রজতের বুক ভরিয়া ওঠে। এত বিখ্যাত, এত শ্রদ্ধিত দেশ-কর্ম্মিণী সুমিত্রা! অথচ একটুও আত্মগরিমা নাই—একবারও সে নিজের কার্য্যাবলীর সামান্যতম উল্লেখ করে নাই। শুধু-মাত্র বাড়ির ড্রয়িং-রুমে যদি রজত তাহাকে দেখিয়া আসিত, তবে সুমিত্রাকে সে একজন প্রখর-বুদ্ধিশালিনী মেয়ে মনে করিত মাত্র, কিন্তু বুদ্ধির সঙ্গে তেজ, দীপ্তির সঙ্গে দাহ, হাসির সঙ্গে শক্তি, অনুকম্পার সঙ্গে কর্ত্তব্যবোধ কি সহজ স্বাচ্ছন্দ্যে সে নিজের মধ্যে মিলাইয়া রাখিয়াছে, তাহার পরিচয়ও রজত পাইয়াছে।

সুমিত্রা! কোথায় ছিলে তুমি এতকাল, সুমিত্রা! দৃষ্টি তোমাকে চাহিয়া আসিয়াছে, চৈতন্য তোমাকে ধ্যান করিয়াছে, কল্পনা তোমাকে স্বপ্ন দেখিয়াছে। সত্যই কি আমার জীবনে তোমার আবির্ভাব হইল?

এলবার্ট হলে ছাত্রদের এক আধা-ঘরোয়া মিটিং ভিতরে ভিতরে বহুলভাবে বিজ্ঞাপিত হইয়াছিল। ছাত্র-সমাজের ইতিকর্ত্তব্য নির্দ্ধারণের মিটিং ইহাই প্রথম নয়, তবে বিক্ষোভ যখন বর্দ্ধিততম, তখন পুনরায় একযোগে একটা সংহত-বিবেচনার প্রয়োজন মনে হওয়ায়ই সভা আহূত হইয়াছিল।

সাধারণত রজত বড় একটা মিটিং-টিটিঙে যায় না, তার পক্ষে এ-সভায় যোগদানের বিশেষ কিছু সার্থকতা আছে কিনা তাহাও সে ঠিক করিতে পারিল না। অবশেষে মিটিং-এর দিন দুপুর বেলায় কৌতূহল আর দমন করিতে না পারিয়া যখন এলবার্ট হলের সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিয়া আসিল, তখন মিটিং প্রায় শেষ হইবার উপক্রম।

হলে প্রবেশ করিয়াই কিন্তু রজত চমকাইয়া উঠিল। দেখিল, মঞ্চের উপর স্থির-বিদ্যুতের মত দৃপ্তভঙ্গিতে দাঁড়াইয়া একটি মেয়ে ইংরেজিতে অনর্গল বক্তৃতা দিয়া চলিয়াছে। মেয়েটি আর কেহই নহে, সে সুমিত্রা!

অত্যন্ত শুদ্ধ উচ্চারণ, কথাগুলি স্পষ্ট সতেজ। কণ্ঠস্বর কখনও কোমল, কখনও উদ্দীপ্ত, কখনও আকুতিতে পূর্ণ, কখনও শ্লেষ-বর্ষণে নির্মম। যেন আগুনের শিখা—কখনও জ্বলিয়া ওঠে, কখনও স্তিমিত হয়, কখনও সবুজ আলোয় চতুর্দ্দিক স্নিগ্ধ করে এবং পরমুহূর্ত্তে রুদ্র দাহে ঝলসিয়া ওঠে।

মিটিং শেষ হইল। অসম্ভব হাততালি এবং অজস্র চিৎকারে হল্ পূর্ণ হইয়া উঠিল। একদল ছেলে যাইয়া সুমিত্রাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল—বক্তৃতা-ক্লান্ত সুমিত্রা রজতের দৃষ্টির আড়াল হইয়া গেল।

সুমিত্রা ব্যস্ত কর্ম্মিণী, সুমিত্রা বহুজনের উপদেশ-দাত্রী, স্বেচ্ছা-সেবিকাদলের নায়িকা। সুমিত্রার সঙ্গে অনেকের অনেক কিছু প্রয়োজন, অনেকের সঙ্গে অনেক কাজে তাকে খাটিতে এবং মাথা ঘামাইতে হয়, শারীরিক পরিশ্রমে তার কাতর হইলে চলে না। কিন্তু কাজ করিতে হয় বলিয়া তাহাকে মুখ-গম্ভীর করিয়া চলিতে হয় না—হাসিয়া কাজ করিতে সে জানে, রজত শীঘ্র তাহারও পরিচয় পাইল।

গুণগ্রাহী সহকর্ম্মী ও সহকর্ম্মিণী দ্বারা সুমিত্রাকে পরিবেষ্টিত দেখিয়া রজত নিচে যাইবার উদ্যোগ করিল। তাহার প্রায় আক্ষেপ হইতে লাগিল, কেন সে ঐ দলের একজন হইতে পারিল না, সামান্য দর্শকের মতই কেন তাহাকে এমন দূর হইতে বিদায় লইতে হইতেছে।

সিঁড়ি দিয়া নিচতলায় নামিবার পর বহুজনের মিলিত কোলাহল রজতের কর্ণগোচর হইল। ফিরিয়া চাহিয়া দেখিল, দলবেষ্টিত সুমিত্রাও

এদিকে অগ্রসর হইয়া আসিতেছে। একাধিক ছেলে এবং একাধিক মেয়ের একাধিক প্রশ্নের জবাব সুমিত্রা দ্রুত কিন্তু সহজ ভাবেই দিতেছে—কিছুই তার অসুবিধা হইতেছে না। চলিতে চলিতেই নানা পরামর্শ হইতেছে, কর্তব্য-বণ্টন চলিয়াছে, এমন কি হাসি-কৌতুকের পর্য্যন্ত অভাব নাই।

'—তোমার আর কিছু করতে হবে না, সত্য-দা'—রজত সুমিত্রাকে বলিতে শুনিল, 'তোমাকে শুধু বিদ্যাসাগর আর বিপণের ছেলেদের দেখতে হবে, তোমার মত নিশ্চিত আর কেউ তাদের দলে টানতে পারে না। ওদের সন্দেশ-রসগোল্লা খাওয়াও না তো?—ইন্দুবাবু, আপনার খদ্দর-ফেরি আর নয়, এবার সরকারী অতিথিশালায় অতিথি হতে হবে, আপনাকে একটু বিশ্রাম দেওয়া দরকার।—কিন্তু, রাজেন, তোমার বিশ্রামের সময় এখনও আসে নি, তোমাকে—আচ্ছা, অজিতবাবু, আপনি তো সারা সপ্তাহের পিকেটিং করার লোক ঠিক করে' রেখেছিলেন তবে কম পড়ল কেন? ও রজতবাবু!—নমস্কার—ভালো আছেন?—'

রজত চমকাইয়া উঠিয়া কহিল—'নমস্কার, ভালো। বক্তৃতাটা খুব চমৎকার—'

'সত্য-দা, স্কটিশ আর বেথুনের জন্য কাকে কাকে ঠিক করা যায়, বল তো?' ইতিমধ্যে পাঁচ পা আগাইয়া গিয়া সুমিত্রা কহিল, 'অনন্তবাবু, আপনার ইস্কুলে এখন ক'টা তাঁত চলছে?—মাত্র!—কাপড়ের চাহিদা মেটাতে না পারলে লোকে বিদেশী পরবে, এতে আর আশ্চর্য্য কি। বুধবারের মিটিংটা শ্রদ্ধানন্দ পার্কেই হোক, কেমন?' রজতকে পিছনে ফেলিয়া ওরা নিচে নামিতে লাগিল।

দলের একটি ছেলে দুষ্টুমি করিয়া কহিল, 'সুমিত্রা-দি, বঙ্কিমচন্দ্রের যুগে তোমার অন্য একটা নাম ছিল।'

বিস্মিত হইয়া সুমিত্রা কহিল, 'বঙ্কিমচন্দ্রের যুগে! কি নাম ছিল?'

'দেবী চৌধুরাণী!'

সুমিত্রা হাসিয়া ছেলেটিকে কৃত্রিম শাসন করিবার ভঙ্গি করিল। তারপর কহিল, 'তোমার ভাইয়ের গবেষণাটা একবার দেখ, সত্য-দা—যেন দেবী চৌধুরাণী এবং বঙ্কিমচন্দ্র একই সময়ে কলকাতা শহরে বাস করতেন! তবে তোমার ভাইটি যে সত্যিকারের একটি ডাকাত, এতে সন্দেহ নেই। গবর্ণমেণ্ট যে কি করে ওকে বাইরে রাখচে আমি তো ভেবেই পাইনে।—ঐ দেখো একটা খালি বাস্ যাচ্ছে—এই রোখ্‌কে—ডাকো না, পুরুষ মানুষ হয়ে যদি চেঁচাতেই না পারবে, তবে কিসের—' রজতের দৃষ্টির সমুখ হইতে দলবল অদৃশ্য হইল।

এইবার রজত সুস্পষ্ট দেখিতে পাইল, সুমিত্রার কাছ হইতে সে কত দূরে। সুমিত্রার নিজ-জনের অন্তর্গত সে নয়, কর্ত্তব্যের ক্ষেত্রে যারা সুমিত্রার নিকটতম, তারাই তাহার আত্মীয়! রজত শুধুমাত্র পরিচিত, তাহার সঙ্গে বাক্য আদান-প্রদানের অবকাশ সুমিত্রার নাই—জীবনের বৃহত্তম ক্ষেত্রে রজতকে সে অনায়াসে পাশ কাটাইয়া যাইতে পারে।

কাহারও ঔদাসীন্য রজতকে এমন করিয়া পূর্ব্বে কখনও আঘাত করে নাই।

সোমবারের চা-খাওয়ার নিমন্ত্রণের কথাটা রজতের মনে আছে সত্য, কিন্তু ওদের হয়ত মনে নাই—রজত ভাবিতে লাগিল। না থাকিবারই কথা। চায়ের নিমন্ত্রণ সুমিত্রার কাছে নিশ্চয়ই তুচ্ছ ব্যাপার। রজত ঠিক করিল, চায়ের নিমন্ত্রণ সে রক্ষা করিবে না,—অন্তত একটা মধুর সন্ধ্যার সম্পদ তার থাকুক, সুমিত্রার কর্ত্তব্যের বাধা হইয়া রজত তার বিরক্তি কুড়াইবে না। চায়ের নিমন্ত্রণটা ও-পক্ষ হইতেও যে কেহ স্মরণ করাইয়া দিবে না, ক্রমে এ-সম্বন্ধেও সে নিঃসন্দেহ হইল। কিন্তু পরের শুক্রবার আশুতোষ-বিল্ডিংস্‌এর করিডরে সন্তোষ সহসা আগাইয়া আসিয়া একটা চিঠি বাহির করিয়া তার হাতে দিয়া যখন কহিল, 'সুমিত্রার

চিঠি।' তখন জীবনের প্রথম প্রেম-পত্রের মত তাই সে-চিঠি রজতকে ঝঙ্কৃত করিয়া তুলিল। অথচ কিছুমাত্র কবিত্ব, কিছুমাত্র ভাষা-চাতুর্য্য তাহাতে ছিল না। সাদাসিধা দুইটি মাত্র লাইন—'এখনও জেলে যাইনি। সোমবারে চা খেতে নিশ্চয় আসবেন।—সুমিত্রা'—তবু রজতের মনে হইল, সসাগরা পৃথিবীর একচ্ছত্র সম্রাটও কোন দিন এমন গৌরবে গৌরবান্বিত হয় নাই।

চায়ের এ নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করা রজতের পক্ষে অসম্ভব।

## দশ

বক্তৃতাটা চমৎকার হয়েছিল, কেমন?'

'সে-কথা আজ আর মনে নেই।'—রজত কহিল।

'নিশ্চয়ই আছে, তবু প্রশংসায় কার্পণ্য করবেন।' বলিয়া সুমিত্রা স্মিত-মুখে চায়ের পটের ঢাকনা উঠাইয়া চামচ দিয়া নাড়িতে লাগিল। কহিল, 'আচ্ছা, সন্তু-দা, চা-পানের কোনও দার্শনিক কারণ বাৎলাতে পার?'

সন্তোষ দমিবার পাত্র নয়। সে গম্ভীর স্বরে কহিল, 'এর গৈরিক বর্ণে মানুষ আধ্যাত্মিকতার স্বাদ পায়। একই কারণে আমাদের আধ্যাত্মিক দেশেই চায়ের প্রথম সৃষ্টি।'

. হাসির একটা হিল্লোল উঠিল, এবং সুমিত্রা সকৌতুকে প্রশ্ন করিল, 'গাঁজাও কি সাধুরা এই জন্যই খায়? ধোঁয়াতে তো স্পিরিট্ ওয়ার্ল্ড্এর আভাস আসে।'

রজত কহিল, 'আমি নিতান্তই জড়-জগতের বাসিন্দা, কাজেই সন্দেশ-গুলির প্রতিই আমি বেশি আকৃষ্ট।' বলিয়া আস্ত একটা সন্দেশ মুখে পুরিয়া গাল ফুলাইল এবং গালের ফুলা কমিয়া আসিবার পর কহিল—উত্তরাধিকার-সূত্রে আমি একজন অসম্ভব রকম খাইয়ে লোক। আমার এক বৃদ্ধপ্রপিতামহ একবারে বসে একটা গোটা পাঁটা খেয়ে

ফেল্‌তে পারতেন, এক অতিবৃদ্ধপ্রপিতামহ একবারে পাঁচ হাঁড়ি দই সাবাড় করতে পারতেন, এক—'

'অতিতরুণ প্রপৌত্র,' চা ঢালিতে ঢালিতে সুমিত্রা সহাস্যে কহিল, 'লাঠি খেয়ে লাঠি হজম করতে পারে—ক' চামচ চিনি দেব?—আপনার চা তো কখনও তৈরি করিনি। সন্তু-দা, তুমি কি ঠিক করেছ স্থূল খাবারগুলি কিছুতেই ছোঁবে না? আমার সন্দেহ হচ্ছে বাসি সন্দেশ শস্তায় কিনে এনে খাওয়া এড়াবার জন্য দার্শনিকতার ভড়ং করচো—'

সন্তু কৃত্রিম-ক্রোধে কহিল, 'দাও, তবে সবগুলিকে এখুনি যমপুরে পাঠিয়ে দিই।'

সুমিত্রা নিজের জন্যও চা ঢালিয়া লইল। পেয়ালায় এক চুমুক দিয়া কহিল, 'দর্শন দিয়ে কার কি উপকার হচ্ছে, আপনিই বলুন, বক্সীবাবু। বিশ্বের রহস্যের কোনও কিছুরই কি তোমরা কূল-কিনারা করতে পেরেচ, সন্তু-দা? কোন্ দার্শনিক বুকে হাত দিয়ে জোর করে' বলতে পারে, তার ব্যাখ্যাই প্রকৃত তত্ত্ব?—'

সন্তোষ কহিল, 'সন্ধানই যদি না করি তবে আল্টিমেট রিয়ালিটিতে পৌঁছব কি করে?'

সুমিত্রা ঈষৎ ব্যঙ্গের স্বরে কহিল, 'সন্ধান করো, না করো, আল্টি-মেট রিয়ালিটিতে না পৌঁছে কোনওই উপায় নেই। ভগবান আছেন কিনা, জানিনে। যদি থাকেন, তবে এই জগৎ বা বিশ্বের অন্যান্য অযুত বিস্ময় এজন্য নিশ্চয়ই সৃষ্টি করেন নি যাতে দার্শনিকেরা তাঁর সমস্ত রহস্য, তাঁর সমস্ত হাত-সাফাই ধরে ফেল্‌তে পারে! যা দৃশ্য বা প্রত্যক্ষ, যারা তোমার হাতের কাছে, বরঞ্চ তাদের দিকে একটু দৃষ্টি দিলেই তাঁর পক্ষে বেশি আনন্দিত হওয়া স্বাভাবিক। পৃথিবীর উৎসবশালা সাজাবার ভার পেয়েচ, ইথরের জগতের খোঁজ কেন? মানুষের সমাজকে সুন্দরতর করে' গড়ে তোল, পৃথিবীকে সভ্যতর স্থান, আনন্দকর জায়গা করে'

গড়ে তোল—মানুষ-কীটের পক্ষে তবেই যথেষ্ট উচ্চাকাঙ্খা এবং সহজ বুদ্ধির পরিচয় দেওয়া হবে। তোমার ফিলজফি আর আমার পলিটিক্‌সে এইখানেই তফাৎ—'

সন্তোষ প্রতিবাদ করিয়া কহিল, 'তোমরা তুচ্ছ জিনিষে সন্তুষ্ট, আর বিশ্বের জ্ঞানের রাজ্য আমাদের—'

'অনধিকার চর্চ্চা।' সুমিত্রা হাসিয়া বাক্যপূরণ করিল এবং প্রসঙ্গান্তর উঠাইয়া হাল্কা সুরে কহিল,—'আচ্ছা, রজতবাবু, আপনি নাকি একবার কোন্ সিনেমার সামনে একটা গুণ্ডাকে আচ্ছা করে' পিটিয়েছিলেন, আরেক বার নিউমার্কেটে একটা মাতাল গোরা সৈন্যকে—নিউমার্কেটেই তো, না সন্তুদা? আপনার শরীর দেখলে তো পালোয়ান বলে মনে হয় না। কিন্তু সন্তুদার খবর কখনও মিথ্যে হ'তে পারে না।'

রজত সবিস্ময়ে কহিল, 'এ-সব সংবাদ সংগ্রহ হোলো কোথা থেকে?'

সুমিত্রা কহিল, 'এগুলি সন্তুদার বিশেষ 'স্কুপ্'।' বলিয়া সন্তোষের দিকে ঈষৎ ফিরিয়া মিটিমিটি হাসিতে লাগিল। এতক্ষণে বেচারি সন্তুদা অনুতাপ করিয়া মরিতে লাগিল, কেন দুদিন পূর্ব্বে রজত সম্বন্ধে ঐ সংবাদ দুইটি সে অতটা উচ্ছ্বাস-সহকারে সুমিত্রাকে জানাইতে গিয়াছিল।

রজত সহাস্যে কহিল, 'এ-সব খবর আর একটু রটিত হলে আমি অনায়াসেই প্রসিদ্ধি লাভ করতে পারি বটে, কিন্তু আপনার ভগ্নী যেমন অবিশ্বাসের চোরা-হাসি হাসচেন, সন্তুবাবু, তাতে এমন কি সত্যি হলেও ঘটনাগুলিকে নিজস্ব বলে দাবি করতে ভরসা পেতাম না।'

সন্তোষ খুশি হইয়া সুমিত্রার দিকে চাহিয়া কহিল, 'হলো?'

চা-খাওয়া শেষ হইয়া গেলে সুমিত্রা রজতকে কহিল, 'মাকে এইবার খবর দিয়ে আসি। পূজোর ঘরে আছেন। আপনার বাবার নাম শোনবার

পর আপনার উপর মা বড়ই প্রসন্ন হয়ে উঠেচেন—ও কি, যাচ্চ কোথায়, সন্তু-দা ?'

সন্তোষ উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল, কহিল, 'একবার বাইরে তাকিয়ে আকাশের চেহারাখানা চেয়ে দেখ। হঠাৎ এত সব মেঘ কোথা থেকে উপস্থিত হলো।—ছেলে-পড়াতে যেতে বিঘ্ন ঘটাবে দেখতে পাচ্চি। সবুর, বোন, এত কষ্টের চাকরিটা শেষে মেঘেই না খতম্ করে দেয়—'

বাইরে তাকাইয়া আর সন্দেহ রইল না। নিঃশব্দে এবং অলক্ষ্যে আকাশের যে পরিবর্ত্তন হইয়া গেছে, তাহা যেমন বিস্ময়কর, তেমনি মধুর। সাড়ম্বর ঘনঘটায় সমস্ত গগন ছাইয়া গিয়াছে ; ঝড় এবং বৃষ্টি আসিল বলিয়া। কৃষ্ণচূড়ার শাখায় শাখায় পড়িয়াছে আলোড়ন, ধূলিজাল উৎক্ষিপ্ত হইয়া সন্ধ্যাকাশ ধূসর করিয়া তুলিয়াছে। আকাশের এক প্রান্তে একটা শাণিত ঝলক বারম্বার উঁকি মারিয়া অন্তর্দ্ধান হইতে লাগিল। নববর্ষার এ-রূপের তুলনা নাই—অত্যন্ত অরসিকের মনকেও ইহা নাড়া দিয়া তবে ছাড়ে।

সুমিত্রা কহিল—'আজ না হয় না-ই গেলে পড়াতে, সন্তু-দা। ছেলেটা একদিন না হয় রক্ষা পাক্।'

'নাই গেলাম।' সন্তোষ দারুণ বিস্ময়ের ভঙ্গিতে কহিল। 'চাকরিটা আমাকে কতটা চেষ্টা করে রক্ষা করতে হচ্চে, জানিস্ ? রায় বাহাদুরের বাড়ি, একবার যদি টের পায় আমারই ভগ্নী তাঁর মনিবের বিরুদ্ধে এমন শত্রুতাটা করে বেড়াচ্চে, তবে কি আমার চাকরি অমনিতেই থাকবে ? তার ওপর আবার কামাই! সর্ব্বনাশ! তুই বোস্, আমিই মামীমাকে পাঠিয়ে দিয়ে যাচ্চি।···নমস্কার রজতবাবু—চাকরিগত-প্রাণ ক্ষীণকায় বাঙালি-সন্তানের ত্রুটি ধরবেন না।—'

রজতের এইবার বলা উচিত ছিল—'চলুন, আমিও উঠি।' কিন্তু সে কিছুই বলিল না। উঠিবার কোন লক্ষণ না দেখাইয়া সে যেমন ছিল,

তেমনি বসিয়া রহিল। মনে মনে কহিল—ভদ্রতার খাতিরে এমন দুর্লভ সময়টুকু থেকে নিজেকে কিছুতেই বঞ্চিত করতে পারব না। এমন মুহূর্ত্ত জীবনে বেশি বার আসে না—

সন্তোষকে দরজা খুলিয়া দিয়া এবং পুনরায় বন্ধ করিয়া সুমিত্রা বসিবার ঘরে রজতের কাছে ফিরিয়া আসিল। কহিল, 'চমৎকার হয়েচে সন্ধ্যাটা। বৃষ্টি আমার বড় ভালো লাগে।—গ্রামফোনে একটা বাজ্‌নার সুর বাজাব?'

রজত কহিল, 'বেশ। কিন্তু তার আগে আমার বোধ হয় একটা কথা বলে নেওয়া উচিত।'

সুমিত্রা চোখ উঠাইয়া চাহিল।

রজত ক্ষণকাল নিশ্চুপ থাকিয়া কহিল, 'প্রসঙ্গটা এ-সময় না-ওঠাতে হলেই ভালো ছিল, কিন্তু দুই কারণে আর দেরি করা উচিত হবে না। প্রথম কারণ এই যে, বলবার এমন দুর্লভ সুযোগ জীবনে আর কবে পাব জানি না। দ্বিতীয়ত, কথাটা স্পষ্ট করে আপনাকে না জানিয়ে আপনার আতিথ্য ভোগ করা আমার পক্ষে অনুচিত হবে।…'

এইবার সুমিত্রা ভারি বিস্মিত হইল। কহিল, 'আমি কিছুই বুঝতে পারচি নে।'

রজত কহিল, 'আমি আপনার প্রেমে পড়েছি। অবিশ্বাস্য রকম প্রেমে পড়েছি—'

সুমিত্রা প্রায় চমকাইয়া উঠিল। অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে চাহিয়া সামান্য তিরস্কারের স্বরে কহিল, 'এ কি কথা! এ সব কি, রজতবাবু?'

রজত কহিল, 'সত্যসত্যই যদি প্রেমে পড়ে থাকি, তবে সেটা না-জানিয়ে আপনার সঙ্গ উপভোগ করা কি আমার উচিত হতো? এ তো এমন মনোবৃত্তি নয়, ইচ্ছা করলেই যার গলা টিপে শেষ করে দেওয়া যায়। কাজেই অকপটে আমার মনোভাব আপনাকে আগেই জানিয়ে দেওয়া

উচিত। ইচ্ছা হলে আপনি আমাকে অনায়াসেই দূর হয়ে যেতে বলতে পারবেন।'

'রজতবাবু!—'

'আমার দিক থেকে এ-সম্বন্ধে সন্দেহের কোনও অবকাশ নেই, শ্রীমতী সুমিত্রা। এ হৃদয়াবেগের গতিরোধ করা আমার পক্ষে অসম্ভব। মনকে আপনার কাছে প্রকাশ না-করে আমার উপায় ছিল না। এইবার ভেবে দেখুন, বর দেবেন, না, শাপ দেবেন। যাই দেন, রাগ করবো না। পরের ইচ্ছার ওপর জুলুম করা আমার স্বভাব নয়।—আমি কি চলে যাব?—'

সুমিত্রা উঠিয়া দাঁড়াইল। দৃঢ়স্বরে কহিল, 'এ সব কি ছেলেমানুষি আরম্ভ করেছেন—এ কি আপনার উচিত হচ্ছে? ক'দিন আপনার সঙ্গে আমার পরিচয়? না, না, ছি। আপনি বসুন, একটু প্রকৃতিস্থ হোন—আমি মাকে ডেকে নিয়ে আসি।'

রজত অনুশোচনাহীন কণ্ঠে কহিল, 'দেখুন, সুমিত্রাদেবী, আচম্কা প্রেমে পড়া আমার স্বভাব নয়। এমন কি, সাধারণের চাইতে সংযম-বোধ বা ভব্যতা-জ্ঞান আমার হয়তো একটু বেশিই হবে—অন্তত কম নয়—'

সুমিত্রা রজতের দীপ্ত মুখের দিকে একবার চাহিল। ধীরে কহিল, 'কিন্তু হঠাৎ এ কি আরম্ভ করলেন?'

রজত কহিল, 'আপনাকে দেখা অবধি এই যে রাতে আমি ঘুমোতে পারি না, জেগে জেগে সর্ব্বক্ষণ আপনাকে স্বপ্ন দেখি, সারাক্ষণ আপনার কাছে ছুটে আসতে ইচ্ছে হয়, এ ব্যাধির নাম বলতে পারেন? এই যে, সারা বিশ্বে আপনাকেই একমাত্র—'

সুমিত্রা বাধা দিয়া কহিল, 'একবার ভেবে দেখুন তো, ক'দিন আমাদের চেনা—না, না, রজতবাবু, এ মোটেই শোভন হচ্ছে না। যে কারণেই

হোক্, আজ আপনি অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে উঠেচেন। অস্বাভাবিককে স্বাভাবিক বলে মনে হচ্চে, আকস্মিককে—'

রজত কহিল, 'কে বললে আপনাকে আকস্মিক, কে বল্‌লে সামান্য ক'দিন? এর পেছনে কত জন্মজন্মান্তর পড়ে রয়েচে, জানেন না কি?'

সুমিত্রা সংক্ষেপে কহিল—'এ আলোচনা এখন থাক।'

রজত কহিল, 'সুমিত্রা অসহজ হওয়াই কি ভদ্রতা? মানুষের মনটা কি এতই হেয় যে, কতগুলি কৃত্রিম নিয়মের চাপিয়ে তার নড়াচড়ার গণ্ডি বেঁধে দিতে হবে? পরিচয় আমাদের অনেক দিনের নয়, শুধু এই অপরাধে কি আমার হৃদয়াবেগকে অন্যায় বলে প্রতিপন্ন করতে পার?'

'দেখুন,' সুমিত্রা গম্ভীর হইয়া কহিল, 'হৃদয়ের খেলা নিয়ে যারা কাল কাটাতে চায়, আমি তাদের দলে নই—আপনি যদি আমাকে আর কিছু বেশি দিন জানতেন, তবে এ-ও আপনার অজানা থাকতো না। দেশের এই ঘোর দুর্দিনে এ-সব তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে কি মাতবার সময়? কত মানুষের ব্যক্তিগত তুচ্ছ সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য উৎসর্গ করে' তবে আমাদের আদর্শে পৌঁছতে হবে। এ যদি না করি, তবে আপনার-আমার সঙ্গে ইতর-সাধারণের তফাৎ কি? না, না, রজতবাবু, আসুন এখন একটু গান শোনা যাক্।' যেন কিছুই হয় নাই, উত্তেজনার কোনও কারণই নাই, এমনি সহজ সুরে কথাগুলি বলিয়া সুমিত্রা ক্ষমা-সুন্দর দৃষ্টিতে রজতের দিকে চাহিল।

ইহার পর অন্য কাহারও মুখ তুলিবার সাহস থাকিত কিনা সন্দেহ, কিন্তু রজত নিজেকে একটুও অপরাধী বোধ করিল না, একটুও লজ্জিত হইল না। মুখটা পূর্ব্বের মতই ঊর্দ্ধায়িত করিয়া সে কহিল—'আমাকে প্রত্যাখ্যান করতে পার, সুমিত্রা, কিন্তু আমার হৃদয়াবেগের আন্তরিকতায় অবিশ্বাস করতে পারবে না। চাপল্য বলে একে অবহেলা করতে পারবে না। একে তুমি ইচ্ছে হলে অভদ্রতাও বলতে পার, কিন্তু শহুরে ভদ্রতা আমি শিখিও নি, শিখতে পারবও না।—তোমাকে চেয়েছি বলে তোমার

ব্রত থেকে তোমাকে ছিনিয়ে নিয়ে যাব, এ-আব্দার তো করি নি, সুমিত্রা। যদি বল, অনির্দ্দিষ্ট কাল পর্য্যন্ত অপেক্ষা করে থাকব—'

'ছি। আজ কি হয়েচে আপনার, বলুন তো? আসুন, মাথায় জল দিয়ে মাথা ঠাণ্ডা করবেন। তখন নিজেরই হাসি পাবে।' প্রায় হাল্কা গলায় সুমিত্রা কহিল।

'আমার প্রার্থনা কি অসম্ভব?'

'হ্যাঁ। কিন্তু আর ও-কথা নয়। আর একটু চা আনি?'

'আমি এবার উঠব।' বলিয়া রজত উঠিয়া দাঁড়াইল।

সুমিত্রা শঙ্কিতকণ্ঠে কহিল, 'ক্ষেপেচেন! বাইরে একবার চেয়ে দেখুন, কি অসম্ভব বৃষ্টি হচ্চে! এর মধ্যে কোথায় যাবেন?'

'বৃষ্টিকে আমি ভয় পাই না।'

'ভয় আপনি কাউকেই পান না, তা আমি জানি। কিন্তু ছি, এ কি ছেলেমানুষি, বলুন তো! শুধু ঐ এক উদ্দেশ্য নিয়েই আপনি আমার কাছে আসবেন, তা'ছাড়া আর কি কোনও সম্পর্কই হতে পারে না? না, না, রজতবাবু, আপনি ভয়ানক মাথা-পাগ্‌লা লোক! দেখুন তো, কী কাণ্ড! এই এতক্ষণ এক পাগ্‌লামি করলেন—শেষ হতে না হতেই আবার এক নতুন ক্ষ্যাপামি দেখাবার জন্য যেতে উঠেচেন।' তারপর হাসিয়া কহিল—'প্রথমটা তবু নিরাপদ ছিল, দংশনের কোন আশঙ্কা ছিল না। কিন্তু বৃষ্টি কি আমার মতো সহজে রেহাই দেবে!—ও কি হচ্চে—না, কিছুতেই যেতে পারবেন না, কিছুতেই নয়—এই জলে ভিজে কিছুতেই আমি আপনাকে যেতে দেব না—' বলিয়া টলায়মান রজতের পিছনে ছুটিয়া আসিয়া সুমিত্রা সদর-দরজায় পিঠ দিয়া দাঁড়াইল। কহিল—'যান্ দেখি এবার।'

'কে, বাবা রজত? বাইরে যে ভারি বৃষ্টি পড়চে, এর মধ্যে যাবে কি করে?'

রজত চমকাইয়া তাকাইয়া দেখিল, সিঁড়ি দিয়া ক্ষৌমবস্ত্রপরিহিতা সুমিত্রার বৃদ্ধা মা সদ্য পূজাহ্নিক সমাপ্ত করিয়া অতিথি-সৎকারের জন্য নিচে নামিয়া আসিতেছেন।

'ভেতরে চলুন।'—সুমিত্রা ঈষৎ হাসিয়া কহিল।

বিনা বাক্যব্যয়ে রজত ঘরের ভিতর পুনঃপ্রবেশ করিল।

গভীর রাত্রি পর্যান্ত অশ্রান্ত ধারায় বৃষ্টি পড়িতে লাগিল, একবারও থামিল না। সুমিত্রার মা দুর্য্যোগের মধ্যে কিছুতেই রজতকে ছাড়িয়া দিলেন না।

সুমিত্রা দুষ্টুমি করিয়া কহিল, 'ওঁর হস্টেলে নিশ্চয়ই খিচুড়ি হয়েচে, তাই থাকতে চাইচেন না। ভয় নেই, আমিও রাঁধতে জানি, চল্লুম আমিও খিচুড়ি চড়াতে। কিন্তু ওঁকে যেন পালাতে দিও না, সন্তুদা। আমার ওপর ভয়ানক চটে আছেন, সুযোগ পেলেই পালিয়ে গিয়ে আমাকে জব্দ করবেন।'

সন্তু কহিল, 'যাও বৎসে, নির্ভয়ে খিচুড়ি কর গে। আজ একটা বিরাট তর্ক জমান হবে।'

'তা আর হবে না,' সুমিত্রা, কহিল। 'রজতবাবু যেমন দাঁতে দাঁত চেপে স্থির-প্রতিজ্ঞ হয়ে বসে আছেন, একটু পরেই কথার প্লাবন ছুটিয়ে দেবেন।'

রজত হতাশ হইয়া কহিল, 'আপনি কি সত্যি আমাকে না রাগিয়ে ছাড়বেন না?'

'একদিনে দু'বার রাগলে স্বাস্থ্য খারাপ হবে।' বলিয়া মৃদু দুষ্টু হাসিয়া সুমিত্রা ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

সন্তোষ শুইল সুমিত্রার ঘরে, সুমিত্রা মার সঙ্গে যাইয়া শুইল। সন্তোষের বিছানায় শুইয়া রজত সারাটা রাত প্রায় জাগিয়া কাটাইল। কী অদ্ভুত

মেয়ে সুমিত্রা! কী অসীম তার ব্যক্তিত্ব, কি অপরিসীম তার ক্ষমা! বিশ্রী ঘটনাকে নিজ মহিমায় সে কী সহজ করিয়া লইল! নিজের আচরণের বিভৎসতা রজত এতক্ষণে টের পাইল। তার রূঢ় অসৌজন্য কী অসীম ক্ষমায় উপেক্ষা করিয়া যে সুমিত্রা একান্ত সহৃদয়তার সঙ্গে রজতের প্রতি অতিথিকৃত্য করিয়াছে, ভাবিতে ভাবিতে নিজের প্রতি লজ্জায় এবং সুমিত্রার প্রতি সুগভীর শ্রদ্ধায় রজতের মন আপ্লুত হইয়া গেল। মনে মনে রজত কেবলই বলিতে লাগিল—মস্ত বড় আদর্শের জন্য যে জীবনটাকে নিবেদন করিয়া দিয়াছে, মন-দেওয়া নেওয়ার তুচ্ছ অকিঞ্চিৎকরতায় তাহাকে আমি ডাকিতে গেলাম কোন্ দুঃসাহসে।

কিন্তু রাত যতই বাড়িল পরাজয়ের সুতীক্ষ্ণ লজ্জা রজতকে যেন পাইয়া বসিল। মন-বিলাইতে যাইয়া প্রত্যাখ্যাত হইয়া ফিরিয়া আসিবার অগৌরব তাহাকে জীবন ভরিয়া বহন করিয়া বেড়াইতে হইবে। সুমিত্রার সহৃদয়তা করুণা ছাড়া আর কি! এই সহৃদয়তা সুমিত্রার ব্যক্তিত্বের কাছে তার নিজের ব্যক্তিত্বের একান্ত পরাজয়ের অবিসংবাদী নিদর্শন। উত্তেজনার আতিশয্যে বিছানা হইতে বার বার উঠিয়া রজত ঘরের এ-প্রান্ত হইতে ও-প্রান্ত পর্যন্ত অস্থিরভাবে হাঁটাহাঁটি করিল।

পরদিন ঘুম ভাঙিয়া ধড়মড় করিয়া উঠিয়া পড়িয়া রজত দেখিল, প্রভাতের অজস্র সোনালী আলো খোলা জানালা দিয়া ঘরের ভিতরে ঢুকিয়াছে। শুনিতে পাইল, দরজার বাহিরে কে একজন অতিশয় মৃদু টোকা দিতেছে। রজত তাড়াতাড়ি দরজা খুলিল।

'ইচ্ছে করেই ঘুমটা ভাঙিয়ে দিলুম।' সহাস্যে সুমিত্রা কহিল। 'মুখ ধুয়ে নিন্, চা হয়ে গেছে—'

চায়ের টেবিলে পেয়ালায় চা ঢালিতে ঢালিতে সুমিত্রা কহিল—'আচ্ছা, সন্তুদা, ক্রীতদাসদের মধ্যে যে বিবাহ প্রথা প্রচলিত ছিল, তাকে কি তুমি অভিপ্রেত বিবাহ বলতে পার? অপমানের গ্লানিতে সে-মিলন কি কখনও

সুন্দর হয়ে উঠতে পারতো? হতাশায়, বেদনায়, পরাধীনতায়, অকরুণ অপমানে মানুষের যা সুন্দরতম বৃত্তি, কী মর্ম্মান্তিক ভাবে তা নিপীড়িত হতো এ-সব মানুষ-পণ্যদের মধ্যে!—'

সন্তু কহিল, 'কিন্তু জীব-প্রকৃতির কথা বলতে গেলে, সর্ব্বক্ষেত্রেই বিবাহকে একটা স্বাভাবিক—'

'অত্যন্ত অস্বাভাবিক করুণ দুর্ঘটনা।' বলিয়া সুমিত্রা গম্ভীরভাবে চায়ে চিনি মিশাইতে লাগিল।

রজত কহিল, 'আপনি কখনও পদ্মা দেখেছেন, সন্তোষবাবু?'

'হ্যাঁ, একবার দেখেছি।'

'পদ্মায় যখন ঝড় ওঠে, তখন তার আর কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান থাকে না। মাতলামি করে', পাগলামি করে', বে-পরোয়া নিষ্ঠুরতায় সে তাণ্ডব করতে থাকে।—কিন্তু সেটাও পদ্মার সত্য রূপ নয়!—'

সন্তোষ বিস্মিত হইয়া কহিল, 'এ কথার তাৎপর্য্য ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না। মানে, আপনি কি বলতে চান্, কাল রাত্রের ঝড়ে পদ্মায় সে রকম কিছু—'

'হ্যাঁ, ঠিক তাই।—আমার হয়ে গেচে, আমি আজ উঠি। নমস্কার।' বলিয়া রজত উঠিয়া দাঁড়াইল এবং আর কোনও দিকে না চাহিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

সুমিত্রা নিশ্চেষ্ট স্তব্ধ হইয়া রহিল, নড়িল না, আগাইয়া দিতে গেল না।

## এগারো

ইহার তিন দিন পরে খবরের কাগজের এক কোণায় এই সংবাদটুকু বাহির হইল:—

বিক্রমপুরের স্বনামধন্য জমিদার স্বর্গীয় দুর্গাপ্রসন্ন চৌধুরির পুত্র রজত-প্রসন্ন চৌধুরি গতকল্য চিফ্ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট্ কর্ত্তৃক পিকেটিং এবং

সাধারণ জনতাকে বে-আইনী কাজে প্ররোচিত করিবার অভিযোগে নয় মাস বিনাশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন। বাংলার জমিদারদের মধ্যে সম্ভবত ইনিই সর্ব্বপ্রথম প্রকাশ্যভাবে আইন-অমান্য আন্দোলনে যোগ দিলেন।

জেলের ভিতরে প্রবেশ করা মাত্র বহু পরিচিত বন্ধু আসিয়া রজতের চতুর্দ্দিকে ভিড় করিয়া দাঁড়াইল। জীবনের এই অদ্ভুত অভিজ্ঞতার প্রথম মুহূর্ত্তে এতগুলি চেনা মুখ দেখিয়া রজত সত্যই আশ্বস্ত বোধ করিল। মনে হইল, আত্মীয়দের মধ্যেই আসিয়াছে, জেল কিছু ভয়ঙ্কর জায়গা নয়।

বন্ধুদের কেহ কহিল—'রজত, এসেছিস, ভাল করেছিস্। তোকে ছাড়া কিছুতেই আড্ডা জমছিল না।' কেহ কহিল—'হাওয়া-বদ্‌লাতে এলি? জয়গাটার স্বাস্থ্য চমৎকার!' অন্যজন বলিল, 'আর ঘ্যাঁট্ খেয়ে মুখও বদ্‌লাতে পারবি—ঘ্যাঁট্ দি গ্রেট্! ঘ্যাঁটের নামে একদিন কবিতা লিখব্।'

এমন সময় পিছন হইতে লোহার মত শক্ত এক জোড়া হাত রজতের কাঁধ ধরিয়া ঝাঁকাইয়া দিল। চমকিয়া ফিরিয়া সে দেখিল—সমর। উল্লাসে রজতের অন্তর ভরিয়া উঠিল।

সমর তার প্রথামত রসহীন তীব্রকণ্ঠে বক্তৃতার ভঙ্গিতে শুরু করিল, 'কেমন, বলতাম কি না তোমাদের যে, কংগ্রেস একটা আস্ত বুর্জ্জোয়া প্রতিষ্ঠান! ক্যাপিটালিস্টদের একটা নির্ল্লজ্জ আখ্‌ড়া। নইলে এই রকম হোপ্‌লেস্ ধনিক কখনও কংগ্রেসের জন্য জেলে আসতে পারে?' বলিয়া গম্ভীরভাবে রজতকে টানিয়া একান্তে লইয়া গেল। কহিল—'বাঁচলাম, রজত। পেট্রোনাইজ্ না-করতে পেরে যেন হাঁপিয়ে উঠেছিলাম—'

রজত কহিল, 'কিন্তু এখানে কি পেট্রোনাইজ্ করবি?'

'কেন', সমর অম্লান বদনে কহিল, 'তোর এলাউয়েন্সটা তো আছে।'

'আর আমি কি খাব ?'

'সে ভাবনা আমার নয়। আমার পেট ভরা চাই তো, না, চাই না ? অদ্ভুত লোক যা হোক।—ভাতার টাকা কি রকম ছোটলোকের মত কমিয়ে দিয়েচে, দেখেচিস্ তো ? হাড় কিপ্‌টে। জানিস্ আগে ভাতার হাবের কোনও কড়াকড়িই ছিল না। শুনতে পাই, আমার খাওয়ার বহর দেখেই নাকি প্রেস্টিজ ভড়্‌কে গেছে।'

রজত হাসিয়া কহিল, 'তা চেহারাখানার বাড়্‌তি দেখেই টের পেয়েচি ! সারাদিন নিষ্কর্ম্মার মতন বসে বসে কি করিস্ ? দিন কাটাস্‌ কি করে ? এখনও তেমনি বকর-বকর করিস্‌ ?'

সমর সগর্ব্বে কহিল, 'করিনা আবার ! নিশ্চয় করি। বকে' বকে' জেল-কর্ত্তৃপক্ষের মাথা খারাপ করবার উপক্রম করেচি—এ-রকম অহিংস অস্ত্র আর দুটি নেই ! তবে 'সুপার্' ভয় দেখিয়েচে, এত বেশি বক্‌লে 'সেলে' ঢুকিয়ে দেবে।—তা দিক না, 'সেলে'র দেওয়ালগুলিকেই অতিষ্ঠ করে' তুলব। যাকে বলে শব্দব্রহ্ম !'

কয়েক দিনের মধ্যেই রজত জেলের জীবনের সঙ্গে নিজেকে অনেকটা মানাইয়া লইল। বাহিরের মুক্ত আকাশ, মুক্ত আলোর জন্য মন কখনও কখনও আকুল হইয়া উঠে সত্য, শস্য-প্রান্তরের উদার বিস্তৃতির জন্য একটা সুতীব্র বুভুক্ষা কখনও কখনও চঞ্চল করিয়া তোলে, তবু এতগুলি শিক্ষিত সুস্থ মনের সাহচর্য্য সত্যই লোভনীয়। কত উঁচু বিষয়ে তারা তর্ক করে—রাজনীতি, অর্থনীতি, সাহিত্য, দর্শন—কত মধুর কণ্ঠে কবিতা পাঠ হয়, কত মনীষীর জীবন সম্বন্ধে আলোচনা চলে, কত কৌতুক-পরিহাসে বন্দী-জীবনের দুঃখ তারা হাল্কা করিয়া লইতে চেষ্টা করে।

কিন্তু সব চাইতে বেশি রজতকে যাহা এই বন্দী-দশার মধ্যে বহন

করিয়া লইতেছে তাহা এই :—দেশের জন্য জেলে যাইবার যে সাহস সে কিছুতেই এতদিন সংগ্রহ করিতে পারে নাই, সুমিত্রার জন্য ভালোবাসা সেই সৎসাহস তাহাকে দিয়াছে। এইবার সুমিত্রার কাছে আর সে পরাজয়ের লজ্জা বোধ করিবে না। তুচ্ছ মন-দেওয়া-নেওয়ার ঊর্দ্ধে উঠিবার ক্ষমতা যে রজতের আছে, তাহা সুমিত্রা এইবার নিশ্চয়ই বুঝিবে। আবার যদি কখনও তার সঙ্গে রজতের দেখা হয়, তবে রজত সগৌরবে মাথাটা উঁচু করিয়া দাঁড়াইতে পারিবে, বাক্য-হীন ভাষায় বলিতে পারিবে—'আমি ভীরু নই, মেরুদণ্ডহীন নই। আমার প্রেম চপলতা মাত্র ছিল না। ত্যাগ করিবার ক্ষমতা আমারও আছে।'

সপ্তাহখানেক পরে এক আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটিল। একদিন ওয়ার্ডার আসিয়া খবর দিল—একজন মহিলা তার সঙ্গে দেখা করিতে চান। দুদিন আগে সত্যানন্দ আসিয়াছিলেন, সত্যানন্দ তার কত বড় শুভকাঙ্খী তাহা জানিত বলিয়া রজত ইহাও জানিত যে, খবর শুনিলেই তিনি ছুটিয়া আসিবেন। কিন্তু হঠাৎ একজন মহিলা দেখা করিতে চান শুনিয়া সে খুবই বিস্মিত বোধ করিল।

ভিসিটর্স-রুমে যাইয়া রজত দেখে, একটা চেয়ারের হাতলে ভর করিয়া উদ্বিগ্ন-চোখে দরজার দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া আছে—সুমিত্রা! রজত নিজের দৃষ্টিকেই প্রায় বিশ্বাস করিতে পারিল না! এরূপ ঘটনা সম্ভব মনে করিতেও সঙ্কোচ হইল।

একটা পাণ্ডুর-মধু হাসি ফুটিয়া উঠিল সুমিত্রার মুখে—অদ্ভুত একটা অশ্রুজলে-মেশান হাসি। মৃদুকণ্ঠে কহিল—'রজতবাবু, এ দায়িত্ব আমার, এ গর্ব্বও আমার।—দাঁড়ান, আগে একটা প্রণাম করি—'

'এ কী!' স্তম্ভিত হতভম্ব রজত বিস্ময়োক্তি করিল।

প্রণতা সুমিত্রা একটি স্পন্দিত ভীরু লতার মত উঠিয়া সমুখে দাঁড়াই-

য়াছে। চোখের সঙ্গে মিলিত হইয়াছে চোখ, একটা অকথিত বেদনায় সুমিত্রাব ঠোঁট বাবম্বার কাঁপিয়া উঠিতেছে।

নিজেকে কিছুটা সংযত কবিয়া সুমিত্রা কহিল—'সেদিন আঘাত কবে' ফিবিয়ে দিয়েছিলাম। ডাকে সাড়া দিতে পারিনি। সেই সাড়া দিতে আজ এইখানেই আসতে হলো।.' সামান্য ক'দিনে একটা যুগ পাব হইয়া আসার ইতিহাস উহ্য রাখিবাব চেষ্টায় সুমিত্রা তাড়াতাড়ি ওদিকে মুখ ফিবাইল।

'পদ্মাব ডাকে সাড়া না দিযে উপায় নেই, সুমিত্রা।' বজত উদ্ভাসিত মুখে কহিল।

সাত দিন পবে এক নবাগতেব মুখে খবব পাওয়া গেল—সুমিত্রার ছয়মাস জেল হইয়াছে। সুমিত্রা জেলে আসিবে, বজতকে বলিয়াই গিয়াছিল। সহাস্যে বলিয়াছিল, 'অন্যেব ছেলেদেব জেলে ঠেলে পাঠাব, আব নিজে আসব না, এও কখনও হতে পাবে।'

বজতেব সকল বন্ধন-বেদনা দূর হইয়া গেল। যাহা মানুষকে সঞ্জীবিত কবে, জীবনকে লোভনীয় কবে, সেই প্রেম, সেই আশা, নদীব স্রোতেব মত অমিত দাক্ষিণ্যেব সঙ্গে .জীবনেব বন্ধ্রে বন্ধ্রে প্রবেশ কবিয়াছে। অন্তবেব এই অনন্ত উচ্ছ্বাসে কাবাগাবেব লৌহদণ্ডগুলি অদৃশ্য হইয়া গেল। খোলা মাঠ এবং রাখালেব বাঁশি, পাল-তোলা নৌকাব স্বচ্ছন্দ জলযাত্রা, চন্দ্রালোকিত তালগাছেব ছাযাছবি এবং শস্য-ক্ষেত্রের সুগন্ধ বাতাস অবলীলাক্রমে কাবা প্রাচীর ডিঙাইয়া বজতেব নিকট আসিয়া উপস্থিত হইতে লাগিল।

## বারো

অবিচ্ছিন্ন এক সুমধুর স্বপ্নের মধ্যে রজতের দিন কাটিতে লাগিল। খালের জলে ডিঙি ভাসাইয়া ছায়াগাছের তলায় তলায় সুমিত্রাকে লইয়া সে বেড়াইল। জানালার ধারে পাশাপাশি দাঁড়াইয়া বৈশাখী ঝড়ের রুদ্র দাপটে বনভূমির করুণ নিগ্রহের দিকে চাহিয়া রহিল। সোনার শরতে পূজার শানাইয়ের শব্দ শুনিয়া একসঙ্গে দুজনেই পুলকিত হইয়া উঠিল। মনে মনে কত নতুন বাড়ি যে রজত তৈরি করিল, তার সীমা সংখ্যা নাই। কত বিচিত্র তাদের স্থাপত্যভঙ্গি, কত বিভিন্ন তাদের পরিবেশ। সুমিত্রাকে পাশে লইয়া গেল সে সমুদ্রতটে—বালুর উপর দিয়া সহাস্যে ছুটাছুটি করিল। শৈল-নগরীর পাইন-সঙ্কুল অসমতল সর্পিল-পথ দিয়া সুদূর কাঞ্চনজঙ্ঘার দিকে চাহিয়া চাহিয়া বেড়াইয়া ফিরিল।

একটা অভূতপূর্ব্ব গর্ব্ব, একটা অসম্ভব গৌরবে রজত স্পন্দিত হইয়া উঠিতে লাগিল। সে পরাজিত হয় নাই, সে জয় করিয়াছে। এত বড় জয়লাভ জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বর্ব্বর সম্রাটের পক্ষেও কোনও কালে সম্ভবপর হয় নাই। কিন্তু মনের এই অপূর্ব্ব উল্লাসের কথা সে কারও কাছে প্রকাশ করিল না—এমন কি সমরের কাছেও নয়। এ আনন্দ অতি পবিত্র, অতি স্পর্শভীরু। অন্য কাহারও দৃষ্টি ইহার সহ্য হইবে না। ইহা থাকুক তাহার গোপন অন্তরে—এক সুগোপন পুলকে সে একা একাই ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিবে, এ পুলকের ভাগ দেওয়া তাহার পক্ষে সম্ভব নয়।

ন'টা মাস যে কোথা দিয়া কাটিয়া গেল, রজত প্রায় টেরই পাইল না। যেদিন তার কারাবাসের মেয়াদ ফুরাইল, সেদিন সে সত্যসত্যই চম্‌কাইয়া উঠিল—মুক্তির আদেশটা যথাসময়ের অনেক পূর্ব্বেই হইয়াছে বলিয়া মনে হইল।

সন্ধ্যার মুখে রজত ছাড়া পাইল। জেলের ফটকের বাহিরে আসিয়া দেখে, বৃদ্ধ সত্যানন্দ উৎসুক চোখে দাঁড়াইয়া আছেন। পিতৃবন্ধুর জন্য সুনিবিড় শ্রদ্ধায় রজতের মন পূর্ণ হইয়া গেল। তাড়াতাড়ি ছুটিয়া গিয়া রজত তাঁহার পায়ের ধুলা লইল।

সত্যানন্দ তাহাকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া কহিলেন, 'পদ্মার ঋণ তোমার শোধ হয়েছে। এইবার বাড়ি চল—গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে।'

গাড়ির ভিতরে মন্দালিকা বসিয়াছিল। রজতকে দেখা মাত্র তার চোখ দুইটা কান্নায় ভরিয়া গেল। তাড়াতাড়ি সে মুখ ফিরাইয়া লইল, কিন্তু রজতের বুঝিতে বাকি রহিল না। মোটরের ভিতরে প্রবেশ করিতে করিতে সে পরিহাস-তরল কণ্ঠে কহিল, 'এই যে ঠাকরুণ, জেলের দরজা পর্য্যন্ত আসা হয়েচে—আরও একটু ঠেলে দিয়ে যাব নাকি? অনেক সীট্ খালি আছে।'

মন্দালিকা ম্লান হাসিয়া কহিল, 'গায়ে কি তোমার ততটা জোর এখনও আছে, রজতদা? কী যে রোগা হয়ে গেচ, একবার আয়নায় দেখবে চল।'

'দূর, তাও কখনও হতে পারি। ঘ্যাঁট্ খেতাম না? ঘ্যাঁট্ আগা-গোড়া ভাইটামিনে ভরা—কিন্তু শোন, এখন আমি তোমাদের বাড়ি যেতে পারব না। পথে আমাকে নামিয়ে দিতে হবে—'

মন্দা কহিল—'ঈস্! তাই না আরও কিছু। তা হবে না।'

সত্যানন্দও বিস্মিত হইয়া কহিলেন, 'না, রজত, কাজ এখন থাক। এখন বাড়ি চল।'

রজত সামান্য দ্বিধা করিয়া কহিল, একবার না নেমে গেলে আমার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ হয়। যদি অনুমতি দেন, একটু নেমে যাব ..'

সত্যানন্দ একবার বিস্মিত দৃষ্টিতে রজতের মুখের দিকে চাহিলেন। কহিলেন, 'বেশ, কোথায় তোমাকে পৌঁছে দিতে হবে বলো?'

মন্দালিকা অসন্তুষ্ট স্বরে কহিল, 'এই ময়লা কাপড়-জামাও বদ্‌লাবেন না ?'

'তাও কখনও বদ্‌লাই!' রজত তরলকণ্ঠে কহিল। 'জেলে গিয়েছিলাম তবে কেউ বিশ্বাস করবে ?'

পদ্মপুকুরের কাছাকাছি এই একান্ত অকৃত্রিম সুহৃৎদের ক্ষুণ্ণ করিয়া রজত মোটর হইতে নামিয়া পড়িল।

জেল হইতে ছাড়া পাইয়া সর্ব্বপ্রথম সুমিত্রার কাছে যাইবে, এই প্রতিশ্রুতি সুমিত্রা যেদিন রজতের সঙ্গে জেলে দেখা করিতে আসিয়াছিল, সেদিনই রজত দিয়াছিল। সুমিত্রা নিশ্চয় বসিয়া আছে তাহার প্রত্যাশায়। জানালা দিয়া উৎসুক-চোখে সে বারবার পথের দিকে চাহিয়া দেখিতেছে নিশ্চয়। আর কি, বিলম্ব করা চলে ? প্রতিশ্রুতি রজতকে রক্ষা করিতেই হইবে। যে-মিলনের স্বপ্নে সুদীর্ঘ নয় মাস কারা-জীবন রজতের কাছে একটা রঙিন আনন্দের মতো কাটিয়া গিয়াছে, যে-মিলন তার কামনায়, প্রেমে, হৃদয়ের সমস্ত অকথিত বাণী এবং অগীত সঙ্গীতে স্পন্দিত হইতেছে, তাহা সার্থক হইতে আর দেরি নাই—মনের এ-চাঞ্চল্য আর দমন করা যায় না। রাস্তাটা ক্রমেই যেন অধিকতর বিলম্বিত দীর্ঘ বলিয়া মনে হইতে লাগিল।

সুমিত্রা, কোন্ পূর্ব্বজন্ম হইতে তুমি আমাকে অনুসরণ করিয়া ধরণীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছ ? জন্মজন্মান্তরের কোন্ অদ্ভুত আকর্ষণে তোমার কাছে আমি ছুটিয়া আসিলাম ? কোন্ সহৃদয় দেবতা আমাদের জন্য এত আনন্দ-আবেগের ব্যবস্থা করিলেন ?

গ্যাসালোকিত ফুটপাথ, মর্ম্মরিত পথতরু-শাখা, আলোবিচ্ছুরিত বাতায়নগুলি রজতের নিকট রঙিন স্বপ্ন বলিয়া মনে হইতে লাগিল। ঐ তো ল্যান্সডাউন বাজার, গাড়ির স্ট্যাণ্ড, তারপর বাঁ দিকে ম্যাডক্স্ স্কোয়ারের রাস্তা, তারপর—সর্ব্বনাশ! আর একটু হইলেই মোটর-চাপা

পড়িত। সুমিত্রা। সুমিত্রা! তোমার দু'চোখ হইতে তুমি আমায় প্রথম কি অভ্যর্থনা বর্ষণ করিবে, তাহা আমি কল্পনা করিয়া চলিয়াছি। বারান্দার রেলিঙের উপর কেমন করিয়া ঝুঁকিয়া থাকিবে, তাহা আমি স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি। স্মিতহাস্যে তোমার মুখমণ্ডল সহসা কেমন রাঙিয়া উঠিবে, তাহা পূর্ব্বাহ্নেই আমি দেখিতে পাইতেছি।

রঞ্জত দ্রুত হাঁটিয়া চলিল। বড় ক্লান্ত বোধ হইতেছে, এইবার আশ্রয় পাইবে।

দূর হইতেই বহুপ্রার্থিত বাড়িটা দৃষ্টিগোচর হইল। দেখিল, অন্ধকার। নিকটবর্ত্তী হইল, দেখিল—অন্ধকার। আলোর সামান্যতম আভাস পর্য্যন্ত নাই। কাছে আসিল, দেখিল—অন্ধকার। উত্তেজনায় রঞ্জত হাঁপাইতে লাগিল। বাড়ি ভুল করে নাই তো? না, না,—ঠিক এই বাড়ি। বাড়ি ভুল করা তার পক্ষে অসম্ভব—

স্খলিতপদ রঞ্জত দৌড়িয়া গেল। সদর-দরজায় দুর্ব্বল কম্পিত হস্তে আঘাত করিতে লাগিল—কোনও সাড়া আসিল না।

'সন্তোষ বাবু—সন্তোষ বাবু—সন্তু-দা—সুমিত্রা—সুমিত্রা—'

প্রতিধ্বনি ছাড়া কোনই জবাব আসিল না। চেতনার যতটুকু অবশিষ্ট ছিল, তাহা সংহত করিয়া রঞ্জত আবার প্রাণপণে দরজায় আঘাত করিতে লাগিল। অবশেষে অস্থির হাতে একবার একটা আঘাত পাইয়া চাহিয়া দেখিল, দুয়ারে তালা বন্ধ।

কাল-বৈশাখীর ঝড়ে বনবনান্তরের বক্ষ ভেদ করিয়া যেমন করুণ দীর্ঘশ্বাস বাহির হইয়া আসে, তেমনি একটা প্রকাণ্ড দীর্ঘশ্বাস রঞ্জতের বুকের মধ্য হইতে যেন পাঁজরাগুলি ভাঙ্গিয়া ঠেলিয়া বাহির হইয়া আসিল। মাতালের মত টলিতে টলিতে সে অদূরবর্ত্তী মুদির দোকানের দিকে আগাইয়া গেল।

'আচ্ছা, ঐ বাড়িতে যাঁরা ছিলেন, তাঁরা কোথায় গেছেন, বলতে পার ?'

মুদি নিকেলের চশমা নাকের অগ্রভাগে বসাইয়া হিসাব দেখিতেছিল। প্রশ্ন শুনিয়া চোখ উঠাইয়া কহিল—'কি চাই, বল্লেন ?'

'ঐ কোণার বাড়িতে যাঁরা ছিলেন, তাঁরা কোথায় গেছেন, বলতে পার ?' রজত কম্পিত গলায় প্রশ্নের পুনরুক্তি করিল।

'তাঁরা উঠে গেচেন।'

উঠে গেছেন! 'কোথায় ? কবে ?'

'তা প্রায় মাস দেড়েক হবে বৈ কি!—সেই যে মেয়েটি মারা গেল, তারপরই উঠে গেচেন—'

'মারা গেল!' রজত আর্ত্তনাদ করিল। 'কে মারা গেল ?—'

'ঐ যে, মোশায়, স্বন্দর দেখতে মেয়েটি ছিল—যিনি স্বদেশী করতেন। বড় দুঃখের কথা—তবে বুঝলেন না, মোশায়, সবই ভগবানের হাত। জেল থেকে বেরিয়ে এল। দিব্যি চলাফেরা করচে। তারপর দেখি, দরজায় কেবলই মোটর আর মোটর। শুনলুম, নিমুনিয়া হয়েছে। তিকিচ্ছের তোড়জোড় খুবই চল্‌লো, তা হলেই আর হবে কি—একদিন সব ফর্শা হয়ে গেল। যাকে কর্ত্তা নিজে টানেন—ও কি, ও রকম করচেন কেন!—অঁ্যা—কি—হলো কি—'

রজত ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিতেছে। অসম্ভব এক তড়িৎ-শক্তি যেন তাহাকে অধিকার করিয়াছে। ছুটিতে ছুটিতে সে ম্যাডক্‌স্ স্কোয়ারে যাইয়া প্রবেশ করিল, এবং বিলীয়মান দৃষ্টিশক্তির সাহায্যে সমুখের শূন্য বেঞ্চটা আবিষ্কার করিয়া তাহার উপর হুড়মুড় করিয়া পড়িল। পরক্ষণে তাহার সংজ্ঞা রহিল না।

অদৃশ্য পদ্মা অদৃশ্য পথে আসিয়া আবার রজতের বাড়ি ভাঙিয়া দিল!

## তেরো

মঞ্জরী রায়ের বিবাহ হইয়াছিল এক ঘোরতর সাহেবের সঙ্গে। রঙটা কালো হওয়া ছাড়া তার সাহেবিয়ানায় বড় রকম আর কোনও ত্রুটি ছিল না। ভাবে ভঙ্গিতে, দৈনন্দিন জীবনের তুচ্ছ খুঁটিনাটিতে মিস্টার সুবিমল পালচৌধুরি তার তিন বছরের বিলাত প্রবাসটাকে এমন তীব্র মুষ্টিতে আঁকড়াইয়া ধরিয়াছিলেন যে, বিলাতের খানিকটা তার সঙ্গে এদেশে আসিয়া পড়িয়াছিল। মঞ্জরী অবশ্য অত্যন্ত গর্ব্বসহকারেই ব্যাপারটাকে গ্রহণ করিয়াছিল, কিন্তু যতই দিন যাইতে লাগিল ততই সে দেখিতে পাইল যে, তীব্র ইচ্ছা সত্ত্বেও উগ্র বিলাতিয়ানাতে সে কিছুতেই বপ্ত হইতে পারিতেছে না।

সুবিমল পালচৌধুরি স্বদেশ হইতে সিভিলিয়ান হইবার সং সঙ্কল্প লইয়া বিলাত যায়, কিন্তু সঙ্কল্প সাধু হইলেও তাহা সঙ্কল্পই রহিয়া গেল। অবশেষে অগতির গতি বিলাতের ওকালতি পাশ করিয়া সে দেশে ফিরিয়া আসিল এবং জীবনের এই ব্যর্থ আশার প্রতিশোধ তুলিল দুর্ভাগা ভারতবর্ষের উপর। কিন্তু এ-চটক যে-সব ক্ষেত্রে কার্য্যকরী হয় এবারেও সেখানে কাজে লাগিল, মঞ্জরী পিতৃগৃহ হইতে পালচৌধুরির ফ্ল্যাটে স্থানান্তরিত হইল।

বিবাহিত জীবনের সূত্রপাত হইয়াছিল হনিমুন্ ও উইক্-এণ্ডে শৈল-বিহার দিয়া। সাহেবি হোটেলে ডিনার ও বিলাতি সঙ্গীতের রিসাইটেলে হাততালি দেওয়া নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা হইয়া উঠিয়াছিল, গ্র্যাণ্ড-ট্রাঙ্ক রোডে মোটর ছুটাইয়া নিরুদ্দেশ-যাত্রা সততই চলিত। কিন্তু যতই দিন যাইতে লাগিল, দেখা গেল—উইক্-এণ্ডে বেড়াইতে গেলে অনর্থক পয়সা খরচ হয়, বিলাতি হোটেলের ডিনার অযথা মহার্ঘ্য, বিলাতি

সঙ্গীত অনাবশ্যক কোলাহলমুখর এবং গ্রাণ্ড-ট্রাঙ্ক্ রোডের মসৃণ অশেষ পথে গাড়ি যতই ছুটিয়া চলে পেট্রোলের ট্যাঙ্ক্ ততই খালি হইয়া উঠে। সুতরাং জীবনযাত্রার সংস্কার প্রয়োজন হইয়া পড়িল।

কিন্তু স্বভাব অত সুশীল ছেলে নয়। ইচ্ছা করিলেই মানুষ তার হাত হইতে রেহাই পায় না—এবং স্বভাবের এই দৌরাত্ম্য মিঃ পাল চৌধুরিকে এখনও প্রত্যহ সন্ধ্যায় সাহেবি রেস্তর্ঁার কক্ষে কখনও একা কখনও বা সস্ত্রীক ঘুরাইয়া ফিরায়। তবে আজকাল সে ডিনার খাইতে যায় না—অর্কেস্ট্রাধ্বনিত 'বুফে'তে পুরুগদি-সংযুক্ত চেয়ারে গর্ব্বসহকারে বসিয়া আইস-ক্রিমের অর্ডার দেয়।

আজও সে সস্ত্রীক আইস-ক্রিমের সন্ধানে আসিয়াছিল। কিন্তু আইস-ক্রিমেই তার তর্ক সীমাবদ্ধ ছিল না—দুই বাটি ক্রিমের সমুখে বসিয়া পালচৌধুরি স্ত্রীর নিকট নানাপ্রকার রসাল ককটেল প্রস্তুতির বিস্ময়কর প্রণালীগুলি গর্ব্বসহকারে ব্যাখ্যা করিতে শুরু করিয়াছিল। মঞ্জরী এতে কোনও আনন্দ পায় না, কিন্তু তবু তাকে আগ্রহ প্রকাশ করিতে হয়—সাহেবের সহধর্ম্মিণী হওয়ার ইহা দুরূহ সৌভাগ্য।

পালচৌধুরি কহিতেছিল, 'ওয়াইন বল্‌লেই এদেশের লোক লাফিয়ে ওঠে—যেন মদ সত্যই কিছু অস্পৃশ্য পদার্থ।—কিন্তু প্রকৃত কথা এই যে, ভয় মদের নয়, মদের কোয়ালিটির।—যে-কোনও সিভিলাইজড্ দেশেই দেখতে পাবে, ওয়াইন্ একটা অপরিহার্য্য পানীয়—পেপ্, ভিম্, ডিলাইট্। ধরো না, শ্যাম্পেন—শ্যাম্পেন-পান যদি গর্হিত হয়, তবে চুম্বন আরও গর্হিত, তবে লভ্ একটা ঘৃণিত—ওঃ, ডিয়ার। কাণ্ড দেখচো ঐ বাঙালি ছোক্‌রাটার?—গ্লাসের পর গ্লাস, বোতলের পর বোতল, কেমন অবলীলা-ক্রমে গলা দিয়ে পার করে দিচ্ছে। মস্ত-রসিক বটে।'

তখন কৌতূহলী হইয়া মঞ্জরী ঘাড় বাঁকাইয়া চেয়ারের পশ্চাৎদিকে তাকাইল, এবং তাকাইয়া অবাক হইয়া গেল। দেখিল, তাহাদের টেবিলের

অদূরে ছোট একটা টেবিলের সমুখে বসিয়া রজত মদের পূর্ণ গ্লাস মুখের মধ্যে ঢালিয়া দিতেছে। টেবিলের উপর আরও দুতিনটা বোতল। রজত কোনও দিকে চাহিতেছে না, পেগ্ ঢালিবার জন্য অপেক্ষমান ওয়েটারের সাহায্য নিতেছে না। তার সমুখে কোনও খাদ্য নাই—এমন কি মদের চাট্ হিসাবে বাদাম-ভাজা প্রভৃতি যাহা দেওয়া হইয়াছে, তাহাও সে একদিকে ঠেলিয়া রাখিয়াছে। শুধু স্খলিত-হস্তে মদ্যপূর্ণ গেলাস ঠোঁটের কাছে আনিয়া ধরিতেছে—এমন কি প্রত্যেকবার সোডা মিশাইবার কথাও তার মনে হইতেছে না।

আলুথালু রজতের দীর্ঘ চুল। রক্তলেশহীন মুখে যেন শতাব্দীর অবসাদ আসিয়া ভিড় করিয়াছে। আমীলিত চোখ দুটিতে বুঝি দৃষ্টিশক্তি অবশিষ্ট নাই। হতভম্ব বিস্ময়ে এবং বেদনায় মঞ্জরী কতক্ষণ পর্য্যন্ত তাহার দিকে নিষ্পলক চোখে চাহিয়া রহিল। তার মনে হইতে লাগিল, রজত যেন সদ্য এক কবর হইতে উঠিয়া আসিয়াছে; সে যেন মানুষ নয়—স্বাস্থ্যদীপ্ত, প্রাণচঞ্চল, শক্তিমান রজতপ্রসন্ন যেন মরিয়া ভূত হইয়া সহসা এই দীপালোকিত উৎসব-মুখরিত ভোজনাগারে জীবিত মানুষদের চম্কাইয়া দিবার জন্য উপস্থিত হইয়াছে।

পালচৌধুরি কহিলেন, 'ও রকম ভাবে তাকিও না। ও রকম করে মাতালদের দিকে তাকাতে নেই—বলা যায় না, ওদের কোন্ খেয়াল গজিয়ে ওঠে—আই মিন্—ওদের প্রোভোক্ না করাই নিরাপদ, কেননা, ওদের উইট্‌স্ ওদের কণ্ট্রোলে থাকে না- ও কি—কোথায় যাচ্ছো?—'

মঞ্জরী চেয়ার হইতে উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল। কহিল—'তুমি একটু বস। আমি ওর সঙ্গে কথা কয়ে আসচি—'

সবিস্ময়ে পালচৌধুরি কহিলেন—'তুমি! ওর সঙ্গে! বলো কি!—'

মঞ্জরী কহিল, 'উনি রজতবাবু। আমরা একসঙ্গে পড়তাম। মদ খাবার ছেলে উনি নন্—কিন্তু এ কী ব্যাপার! আমি তো কিছুই

বুঝতে পারচি না।' বলিয়া মঞ্জরী দ্রুত হাঁটিয়া রজতের কাছে উপস্থিত হইল।

রজত একবার চোখ মেলিয়া চাহিল এবং বোতল হইতে গ্লাসটা পূর্ণ করিতে করিতে নির্লিপ্ত নিম্নস্বরে কহিল—'বসুন।'

মঞ্জরী সমুখের চেয়ারটায় বসিয়া পড়িল। কহিল, 'এসব কি কাণ্ড, রজতবাবু? কবে আপনি মাতাল হয়ে উঠলেন?'

রজত গ্লাসটা মুখের সমুখে উঠাইয়া একটু ইতস্তত করিয়া নামাইয়া রাখিল। মৃদুস্বরে কহিল, 'যা ভুলতে চান, তা যদি বারে বারে মনে পড়ে, মনে পড়ে' তা যদি আপনাকে ক্ষেপিয়ে তুলতে চায়—তবে আপনি কি করেন?—আপনি ভুলতে চান, কেমন? কি করে' ভুলবেন? বলুন, কি করে ভুলবেন?—'

'না, না, রজতবাবু', মঞ্জরী প্রায় মিনতির কণ্ঠে কহিল, 'এ ঠিক হচ্ছে না। কি হয়েচে বলুন? কেন নিজের আপনি সর্ব্বনাশ করচেন?'

'নিজে করি নি', রজত স্খলিত কণ্ঠে সপ্রতিবাদে কহিল। 'সত্যি, মাইরি বলচি, এ আমার স্বকৃত স্বেচ্ছাকৃত নয়।—শত খুঁজেও যার আঙুলটা ছুঁতে পারা যায় না, শত আক্রোশেও যার চুলের ডগাটুকু ধরতে পারব না, সর্ব্বনাশ সেই স্বেচ্ছাচারীর কীর্ত্তি। ইনি আর কেউ নন্, ইনিই আপনাদের বিধাতা। তাঁর সঙ্গে কি কুস্তি করা চলে—হি হি—চলে না। কিন্তু নিজেকে ইচ্ছেমত শায়েস্তা করা চলে—খুব—'

'রজতবাবু?'

'বলুন।'

'খুব বড় কিছু একটা দুর্ঘটনা ঘটেচে, আমি বুঝতে পারচি—নইলে এ আমি বিশ্বেস করতে পারতাম না। কিন্তু পুরাতন সহপাঠিনীর এই অনুরোধটুকু রাখুন, নিজেকে এমন করে নষ্ট করবেন না।—আপনি মস্ত

বড়, উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ আপনার সমুখে। দুঃখের আঘাতে এমন করে লুটিয়ে পড়া কি আপনার শোভা পায়! ছি, রঞ্জতবাবু!—'

রঞ্জত প্রায় হাস্য করিয়া উঠিল। কহিল—'ভবিষ্যৎ! তারই অন্য নাম মৃত্যু! অন্ধকার, বিলুপ্তি—হ্যাঁ, বিলুপ্তি। কী হবে ভবিষ্যতের পিছনে ছুটে? কোথায় পৌঁছব? তার চেয়ে এই তো বেশ!'—একটা বোতল শূন্যে তুলিয়া ধরিয়া রঞ্জত সশব্দে তাহা টেবিলে সংস্থাপন করিল। কহিল—'এও বিলুপ্তি আনে, গভীর অবলুপ্তি। কোথায় যেন হারিয়ে যাই। নিজেকে আর বয়ে বেড়াতে হয় না। চমৎকার! এরই নাম সুধা! নাঃ, আপনার অনুরোধ রক্ষা করতে পারব না—বড় নির্মম আপনার অনুরোধ—বড় কঠিন—'

'মঞ্জরী!'

মঞ্জরী পিছনে ফিরিয়া দেখিল স্বামীকে। পালচৌধুরির চোখে-মুখে আশঙ্কা এবং উদ্বেগ উদ্দাম হইয়া উঠিয়াছে। মঞ্জরীর পাশে আসিয়া সে ব্যস্ততার স্বরে কহিল—'মঞ্জরী, বাড়ি চল।—'

'রঞ্জতবাবু—'

'বাড়ি যান্! বড় নির্মম আপনার অনুরোধ, বড় কঠিন—'

'মঞ্জরী!' পাল চৌধুরি ডাকিল।

'এ উচিত হচ্ছে না, কিছুতেই উচিত হচ্ছে না, রঞ্জতবাবু—'

'উচিতে-অনুচিতে তফাৎ কোথায়, মিস্ রায়—তফাৎ কোথায়?' রঞ্জত প্রতিবাদের সুরে কহিল। 'কে তফাৎ করে, কে বিচার করে? একটা তরুণ সুন্দর জীবন চূর্ণ করে' দেওয়ার কি অধিকার ছিল বিধাতার? তবু তো হলো। এক মুহূর্ত্তে সব চুরমার হয়ে গেল।—উচিত বলে কিছু নেই—কিছু নেই। যদি উচিত বলে কিছু থাকবেই—মিস্ রায়—তবে কি এমন অবিচার, এমন কঠিন নির্দ্দয় অবিচার ঈশ্বরের রাজত্বে—না, না, ঈশ্বর বলে কেউ নেই—রয়, রয়, ইধর্—'

'মঞ্জরী!'

'বাড়ি যান, নমস্কার!'

'রজতবাবু!'

টলিতে টলিতে রজত যখন হোটেলের বাহিরে আসিল, তখন রাত প্রায় এগারোটা। তাহার অবস্থা তখন আর দাঁড়াইবার মতো নয়। তাহার অবস্থা দেখিয়া পথিকেরা পর্য্যন্ত একটু দূর দূর সরিয়া চলিল, এবং অনতিবিলম্বেই একটা লোক আসিয়া সেলাম করিয়া মৃদুস্বরে কহিল—'গাড়ি হুজুর?'

রজত চেষ্টা করিয়া চোখের পাতা মেলিয়া লুঙ্গি-পরা সেই লোকটার দিকে সকৃতজ্ঞভাবে দৃষ্টিক্ষেপ করিল। কহিল, 'গাড়ি? গাড়ি কই?'

একটা ফিটন-গাড়িতে অর্দ্ধ-সংজ্ঞাহীন রজতকে তুলিয়া কোচম্যান গাড়ি হাঁকাইয়া দিল, একবার গন্তব্যস্থান সম্বন্ধে জিজ্ঞাসামাত্র করিল না। রজতও সে সম্বন্ধে কিছুই বলিল না, মাথাটা এক কোণায় এলাইয়া দিয়া সে নিদ্রিত হইল।

অনেকক্ষণ ধরিয়া চলিয়া, অনেক রাস্তা ঘুরিয়া অবশেষে গাড়ি পুরাতন একটা দোতলা বাড়ির সম্মুখে দাঁড়াইল। গাড়োয়ান কোচবাক্স হইতে নামিয়া আসিয়া সমুখের সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিয়া গেল। কিছুক্ষণ পরে সে যখন নামিয়া আসিল, তখন তার পিছনে পিছনে আসিল একটি সুর্ম্মা-আঁকা-চোখ, ঘাগ্‌রা-পরা, ওড়না-ওড়ানো মেয়ে।

কোচম্যান চাপাস্বরে কহিল, 'মালুম হোতা কি ইয়হ্‌ বহোত্‌ খানদানি বাবু হ্যঁয়, হুঁসিয়ারি সে চল্‌না, বাইজী।'

বাইজি কানের দুল নাড়িয়া কাঁধের ভঙ্গি করিয়া, 'আচ্ছা বাত্‌' বলিয়া গাড়ির দিকে অগ্রসর হইল।

'আইয়ে, বাবুজী!'

গাড়ি থামিলে রজত ঈষৎ জাগরিত হইয়াছিল। বাইজিকে দেখিয়া চোখ মেলিয়া চাহিল।

বাইজি মুখে হাসি আনিয়া, আপ্যায়নের ভঙ্গি করিয়া পুনবায় মৃদু মিষ্ট স্বরে কহিল, 'ভিতর চলিয়ে, বাবুজী ?'

রজতের বিশেষ কোনও ভাবোদয়ই হইল না। দৃষ্টিহীন চোখ মেলিয়া সে চাহিয়া রহিল। তখন কোচম্যান আগাইয়া আসিয়া তাহার কানের কাছে মুখ লইয়া গিয়া কহিল—'হীরা বাইজী, হুজুর। অ্যায়সী খুবসুরত্ বাই ইয়েহ্ মহল্লেমে নহী হ্যঁয়—আইয়ে হুজুর।' বলিয়া রজতের হাত ধরিয়া নামাইল।

'বাইজি!' রজত স্খলিত-কণ্ঠে কহিল, 'গান ? নাচ ? বাঃ! বাঃ! বাঃ!'

বাইজীর উন্নত স্কন্ধে হস্ত স্থাপন করিয়া রজত টলিতে টলিতে উপরের ঘরে আসিয়া প্রবেশ করিল।

'তোমার নাম কি, শুনি ?'

'হীরা বাইজী—পান ফরমাইয়ে, বাবুজী।'

পকেটে হাত ঢুকাইয়া রজত আন্দাজে একটা দশ টাকার নোট বাহির করিয়া দিল।

'তুমি গান গাও ?'

'হাঁ।'

'নাচ ?'

'হাঁ।'

'তবে নাচ, তবে গাও। জোর্‌সে লাগাও। বাঃ, বেশ, বাঃ—বাইজি! চমৎকার তোমার নাম! হীরামন—হি হি—হীরামন! ঘুরে ঘুরে ঘুঙুর বাজিয়ে নাচ।—সমস্ত পৃথিবীটা ঘুরে ঘুরে নাচছে—তুমিও নাচ, হীরামন—'

'সাজ্‌হ্‌ মাঙ্গায়ুঁ ?—সারেঙ্গীওয়ালা বোলাব ?'

'বোলাও। যে যেখানে আছে সব ডাকো। দেখচো না, পৃথিবীটাই নেচে বেড়াচ্ছে, আমরাই কি শুধু বসে থাকবো ? নাঃ—কিছুতেই নয়—'

বাইজি এই অদ্ভুত মাতালের বাক্যজালের কোনও মাথামুণ্ডু করিতে না পারিয়া সঙ্গৎ করিবার লোক ডাকিতে বাহির হইয়া গেল। পানের জন্য দশ টাকার নোট পাইয়া রজতের উপর তার সম্ভ্রম বাড়িয়া গিয়াছিল।

এই মধ্যরাত্রে অত্যল্প কালের মধ্যে তবল্‌চি, মৃদঙ্গী, সারেঙ্গীবাদক জোগাড় হইয়া গেল, এবং নেশায় আমুদ্রিত-আঁখি রজতের সমুখে সেই মধ্য-যৌবনা নটী আড়ষ্ট বাহু বিক্ষিপ্ত এবং অসহজ কটি আন্দোলিত করিয়া নূপুর-গুঞ্জরিত নৃত্যরস পরিবেশন করিতে আরম্ভ করিল। বহু-পরিবেশিত কটাক্ষ এবং বহুপ্রযুক্ত নির্লজ্জ লাস্য গভীর অধ্যবসায়ের সঙ্গে সে তার এই নতুন অতিথিটির উপর প্রয়োগ করিতে লাগিল। নাচিতে নাচিতে আড়চোখে দেখিতে চেষ্টা করিল, নেশাতুর বাবুজির উপর এগুলি কেমন কার্যকরী হইতেছে, এবং নৃত্য ও সঙ্গীতের মধ্য-পথে অত্যন্ত বেমানান জায়গায় রজত যখন হাততালি দিয়া কহিয়া উঠিল—'বাঃ বাঃ, চমৎকার—' তখন বিজয় সম্বন্ধে বাইজির আর কোনও সন্দেহ রহিল না। রজত টাকা বিলাইল, মদ্য আসিল, সঙ্গীত জমিয়া উঠিল, নৃত্য ও মদির কটাক্ষ ঘরের মধ্যে ছুটাছুটি করিতে লাগিল—এবং একটা তৃপ্তিকর নিদ্রার পর রজত যখন জাগিয়া উঠিল, তখন দেখিতে পাইল, সঙ্গতীরা সব বিদায় লইতেছে এবং হীরা বাইজি তার বিস্তৃত রেশমি ঘাগ্‌রার আবর্ত দীর্ঘ করিয়া ছড়াইয়া দিয়া রজতের কাছ ঘেঁষিয়া বসিয়া মৃদু মৃদু হাস্য করিতেছে।

'বাবুজী !'

'তোমার ভুরুটা গলে' আসচে।' রজত কহিল।

বাইজি রুমাল দিয়া তাড়াতাড়ি ভুরুর গলনোন্মুখ কাজল ঈষৎ মুছিয়া

লইল। কহিল, 'ও কুছ নেই। বাতাইয়ে নাচ ক্যয়সা হুয়া—খুস্ হুয়ে ?'

'কি বিশ্রী। ছি, গালেতে এতও রং মাখতে হয়—ঘামের সঙ্গে উঠে আসছে যে।'

'রাতকো হিয়াই ঠায়রেঙ্গে তো ?' বাইজি ঈষৎ আহত-কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল।

কিছুটা উত্তেজনার প্রাবল্যে, কিছু বা নিদ্রায়, রজতের প্রবল নেশা ইতিমধ্যে পাৎলা হইয়া আসিয়াছিল। বাইজির কৃত্রিম ভুরু এবং কৃত্রিম মুখবর্ণের কুশ্রীতার উপর দৃষ্টি পড়া ইহার জন্যই সম্ভব হইয়াছিল। বাইজির শেষ প্রশ্নটাতে সহসা যেন তীব্র মার খাইয়া সে চম্‌কাইয়া জাগিয়া উঠিল। চকিতে সে খাড়া হইয়া বসিল। বিকৃত কণ্ঠে প্রায় ধমকের সুরে সে কহিল—'ক্যায়া ?'

বাইজি সামান্য বিস্মিত হইয়া নিজ প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি করিল।

মুহূর্তে রজত সোজা হইয়া দাঁড়াইল। চকিতে সমস্ত অবস্থা তার হৃদয়ঙ্গম হইল। মূর্চ্ছা হইতে জাগিয়া উঠিয়া মানুষ যেমন করিয়া অসহায়ভাবে চতুর্দ্দিকে চাহিয়া দেখে, তেমনি করিয়া সে চারিদিকে তাকাইয়া দেখিল। দেখিতে দেখিতে তাহার সমস্ত শরীর স্পন্দিত হইতে লাগিল—তার পা দুটা এমন অসম্ভব রকম কাঁপিতে লাগিল যে মনে হইল এখনই সে পড়িয়া যাইবে।

সে কহিল, 'আমি কোথায় ? এ কোন্ জায়গা !—না, না—এই, তোমার নাম কি ? তুমি কে ? ওঃ—কত টাকা তোমার চাই ?' বলিয়া পকেটে হাত গুঁজিয়া রজত এক তাড়া নোট উঠাইয়া আনিল এবং হীরা বাইজির দিকে তাহা ছুঁড়িয়া দিয়া বিভ্রান্তের মত সিঁড়ির দিকে ছুটিল।

উৎফুল্ল হইয়া টাকা গণিতে গণিতে হীরা বাইজি মন্তব্য করিল—'এ ক্যয়সা পাগ্‌লা রে ! সায়দ্ কোই বড়ে আদ্‌মী হোঙ্গে—'

# চৌদ্দ

প্রশস্ত ঘরের মধ্যে কোনও আসবাব নাই। এক দিকে গোটা দুই খোলা সুটকেস, এবং অন্য প্রান্তে একটা দামি কম্বলের উপর বিছানার চাদর পাতিয়া রজত এখনও ঘুমাইতেছে।

এক পক্ষকাল মাত্র রজতের এ-বাড়ি হইয়াছে। রজতের মনের অবস্থা বাসা-বাঁধার অনুকূল নহে, কিন্তু কোনও জনাকীর্ণ হোটেলে যাইয়া বাস করার কথা কল্পনা করা মাত্র তার শোকবিদগ্ধ মন গভীর প্রতিবাদ করিয়া বসিয়াছিল। নির্জ্জনতার তার বড় প্রয়োজন। সত্যানন্দবাবু পর্য্যন্ত তাকে নিজ বাড়িতে বেশি দিন রাখিতে পারেন নাই।

তারপর এই সুদীর্ঘ পক্ষকাল ধরিয়া রজত পিঞ্জরাবদ্ধ সিংহের মতো এই পৃথিবীর প্রতি লৌহ-গরাদে মাথা আছড়াইয়া ফিরিতেছে। গভীর নিষ্ফল আক্রোশে নিজেকে আঘাত করিয়া অতি নিষ্ঠুর ভাগ্যের উপর প্রতিশোধ তুলিতে চাহিয়াছে—বাতবিক্ষুব্ধ পদ্মার মতো নিজেকে লইয়া ক্ষুরধার আবর্ত্ত রচনা করিয়া ফিরিয়াছে। জীবনের কোনও উদ্দেশ্য নাই, শুধু একটা বিরাট ব্যর্থতা সৃষ্টি জুড়িয়া আস্ফালন করিয়া বেড়াইতেছে মাত্র। রজত এই ব্যর্থতার প্রতীক।

রজতের যখন নিদ্রা ভাঙিল, তখন বেশ বেলা হইয়াছে। রৌদ্র-প্রদীপ্ত বাহিরের দিকে একবার তাকাইয়া রজত পাশ ফিরিয়া শুইল। গত রজনীর প্রমত্ততার অবসাদ তার সর্ব্ব অঙ্গে এবং মনে এখনও ভারি হইয়া আছে। নিজেকে সে আরও দুর্ব্বল, আরও অসহায়, এবং আরও ব্যর্থ মনে করিল। কিন্তু অনুতপ্ত বোধ করিল না। বরঞ্চ এক প্রকার অদ্ভুত আত্মতৃপ্তিতে সে হিংস্র আনন্দ বোধ করিল। যে ছন্নছাড়া, উদ্দেশ্যরহিত, পূর্ণতাহীন জীবনলীলার মধ্যে ক্রূর ভাগ্য তাহাকে নিক্ষেপ করিয়াছে,

এ যেন তাহারই স্বাভাবিক পরিণতি। জীবনটাকে নষ্ট করিয়া নিষ্পেষিত ইক্ষুর ছিব্‌ড়ার মতো সে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিবে, ছিঁড়িয়া দুমড়াইয়া, ভাঙিয়া মোচড়াইয়া মৃৎকলসীর মতো অত্যন্ত হেলাভরে ইহাকে শত টুক্‌রা করিয়া আবর্জ্জনার স্তূপে ছুঁড়িয়া ফেলিবে।

হীরা বাইজি! সেই ঘৃণিত মেয়েটা! নাঃ, পাপ বলিয়া কিছু নাই—যেমন পুণ্য বলিয়াও কিছু নাই। যদি পাপ বলিয়া সত্যই কিছু থাকে, রজত অত্যন্ত অনায়াসে বিবেকদংশরহিত তৎপরতার সঙ্গে তাহার পুনরভিনয় করিবে। তথাকথিত পাপের ঊর্দ্ধে থাকিয়া রজত বিশ্ব-বিধাতার কাছ হইতে কোন্ পুরস্কার লাভ করিয়াছে? কোন্ অনুগ্রহ তার উপর বর্ষিত হইয়াছে?

বেচারি হীরা বাইজি! নিশ্চয়ই হীরা বাইজির অপরাধ অতি সামান্য; তবু নির্ম্মম ভাগ্য ওকে এই বিড়ম্বিত জীবনের মধ্যে ঠেলিয়া দিয়াছে। তোমাদের ঈশ্বর উহাকে একটু সাহায্য করিতেও অগ্রসর হন নাই। 'হীরা বাইজিকে আমি ঘৃণা করি না'—রজত মনে মনে বলিতে লাগিল—'ওর কাছে আমি আবারও যেতাম। কিন্তু যে-রস আমাকে তৃপ্তি দিতে পারে, হীরা বাইজির সাধ্য নাই সে-রস পরিবেশন করে—ও বেচারি বড় দুর্ভাগা।'

নিজেকে বিনষ্ট করিবার এই দুর্ব্বার প্রবৃত্তি ক্রমে ঈশ্বরের উপর এক গভীর আক্রোশে পরিবর্ত্তিত হইয়া দাঁড়াইল। বিচারহীন এক শিশুর অকৃত্রিম ক্রোধে সে ঈশ্বরকে তিরস্কার করিতে লাগিল, অভিশাপ দিল। স্বেচ্ছাচারি, তুমি বোঝ না, তোমার অসম্ভব ক্ষমতার অপপ্রয়োগে, তোমার স্বেচ্ছাচারলীলার উন্মত্ত আনন্দে সৃষ্টি জুড়িয়া তুমি কি নির্ম্মম নিষ্ঠুরতার তাণ্ডব করিয়া বেড়াও। জীবের দেহে বেদনা-বোধ দিয়া তুমি তাহাকে আঘাত কর, তাহার উদরে ক্ষুধার জ্বালা সৃষ্টি করিয়া তুমি তাহাকে অন্ন

হইতে বঞ্চিত কর, নিষ্পাপ শিশুর উপর তুমি পিতার অপরাধের হিংস্র প্রতিশোধ লও—বুকের মধ্যে প্রেম দিয়া প্রেমাস্পদকে তুমি ছিনাইয়া লইয়া যাও! বর্ব্বর স্বেচ্ছাচারিতায় তুমি জগতের নিষ্ঠুরতম সম্রাটকে লক্ষবার পরাজিত করিতে পাব। মানুষ তোমার তুলনায় কতটুকু অত্যাচার করিতে পারে!

রজত সহসা সিদ্ধান্ত করিল, চিকিৎসা বিষয়ক গবেষণার জন্য সে তার সমস্ত সম্পত্তি দান কবিবে। পরীক্ষাগাবে লোকচক্ষুর অন্তবালে শত শত বীর যোদ্ধা যারা মৃত্যুর মাবণ-অস্ত্র প্রস্তুত করিতে আত্মনিয়োগ করিয়াছে, তাহাদের রজত সর্ব্বস্ব দান কবিয়া সাহায্য কবিবে। ঈশ্বরের স্বেচ্ছাচাবিতার বিরুদ্ধে যাঁহাদের অভিযান—মা'র কোল হইতে যে-ঈশ্বর সন্তান কাড়িয়া লয়, তাহাকে যারা বাধা দিতে দাঁড়ায়, স্ত্রীব বুক হইতে যে জন স্বামীকে হরণ করিয়া লয়, তাহাকে যাবা শাসন করিতে অগ্রসর হয়, রজত তাহাব সমস্ত ঐশ্বর্য্য তাহাদেব সাহায্যে নিয়োজিত করিবে!

যুগে যুগে মানুষ রাজাব স্বেচ্ছাচাবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছে। ডেমোক্রেসিব জন্য মানুষ কত রক্ত উৎসর্গ করিয়াছে। ইতিহাসেব পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় ব্যক্তি-স্বাধীনতার জন্য মানুষের কত বিক্ষুদ্ধ অভিযানেব পুণ্যস্মৃতি অক্ষয় হইয়া আছে, স্বাজাতিক স্বাধীনতাব জন্য মানুষেব মহত্তম প্রচেষ্টা নিয়োজিত হইয়াছে। কিন্তু ইহাব চেয়ে বহুগুণ নির্ম্মম যে স্বেচ্ছাচাব প্রতিদিন প্রতি মুহূর্ত্তে আমাদের মধ্যে সংঘটিত দেখিতে পাই—রজত ভাবিতে লাগিল—মানুষ কেন তার প্রতিবাদ কবে নাই? কেন এই স্পর্দ্ধিত অত্যাচারের বিরুদ্ধে সমবেত ভাবে একবারও বিদ্রোহের ধ্বনি উঠায় নাই, কেন অসহায় বেদনা প্রতিবাদহীন অপমানের সঙ্গে সহ্য কবিয়াছে? এই অসীম শক্তির তুলনায় মানুষ একান্ত দুর্ব্বল, তাই কি এই সহনশীলতা, তাই কি এই নির্ভরতার ভান? ভক্তি কি দুর্ব্বলতারই নামান্তর নয়?

বজ্রত মনে মনে সিদ্ধান্ত করিল—ভবিষ্যতের জগতে যে নতুন বিদ্রোহ আত্মপ্রকাশ করিবে, তাহা হইবে ঈশ্বরদ্রোহিতা। তাহা হইবে স্বেচ্ছা-পরতন্ত্র, শাসিতানুমোদনহীন, ক্ষমতাগর্ব্বদৃপ্ত এক তেজান্ধ শক্তির বিরুদ্ধে মানব-মনের এক গভীর প্রতিবাদ। বৈজ্ঞানিকদের প্রাণপাত মহৎ প্রচেষ্টার মধ্যে বজ্রত সেই যুগের আভাস পাইতেছে।

ক্রমে বজ্রতের এই অতি-আক্রোশ মন্দীভূত হইয়া আসিল। ক্রমে সে প্রার্থনা শুরু করিল। কহিল—প্রভু, সত্যিই কি তুমি আছ? সত্যই কি তুমি বিশ্বকে নিয়ন্ত্রণ কর? তোমার প্রজ্ঞায়ই কি সমস্ত বিধান গড়িয়া উঠিয়াছে? জীব-ভাগ্যের তুমিই কি কর্ণধার? মানুষের আত্মা কি মৃত্যুকে অতিক্রম করিতে পারে? পরলোক কি সত্যই আছে?—সুমিত্রা কি সত্যই আছে? কোন্ অদৃশ্য লোকে, কোন্ অজানা রহস্যের মধ্যে তুমি আমার সুমিত্রাকে লইয়া গেলে? এ তোমার কোন্ কৌতুক, প্রভু? কোন্ গভীর মঙ্গলেচ্ছায়, কোন্ চিরানন্দের ব্যবস্থা করিবার জন্য তুমি সাময়িক ভাবে সুমিত্রাকে অপসারিত করিলে?—কিন্তু সত্য সত্যই যে তুমি আছ—বজ্রত মনে মনে প্রশ্ন করিল—গভীর প্রজ্ঞাবান্, মহাচৈতন্যময় এক প্রভু যে সত্যই কর্ণধার রূপে রহিয়াছে, সত্যই যে পরলোক আছে, সুমিত্রার আত্মা যে অবিনশ্বর, তাহার প্রমাণ কোথায়? একটা সুনিশ্চিত প্রমাণ যে আমার কাছে বড় প্রয়োজন! দয়া করো, দয়া করো, একবার ভবিষ্যতের আশায় আমাকে বুক বাঁধতে দাও, প্রভু!

সম্পূর্ণ একটা মাস বজ্রত প্রার্থনা করিল। ভগবানের করুণা ভিক্ষা করিল, অতীন্দ্রিয় জগৎ সম্বন্ধে ক্ষীণতম আভাস পাইবার জন্য ঈশ্বরের কাছে মাথা কুটিয়া মরিল। কিন্তু কোনও ফল হইল না; কোনও ছায়ামূর্ত্তি দেখিল না, কোনও দৈববাণী শুনিল না। মনের মধ্যে সন্দেহ তেমনি প্রবল রহিল, কোনও আধ্যাত্মিক জ্ঞানোদয়ে তাহা পরাভূত হইল না।

রজত আরও প্রার্থনা করিল, আরও কাঁদিল। তীব্র অধীরতায় গভীর বিশ্বাস সংগ্রহ করিয়া সে অজানা অদৃশ্য জগতের জন্য বারম্বার হাতড়াইয়া মরিতে লাগিল। কিন্তু বিশ্বাসযোগ্য কোনও কিছুতেই পৌঁছাইল না। হতাশা, বেদনা, উপায়হীন ভরসা-হীন ব্যর্থতা তাহাকে প্রায় উন্মত্ত করিয়া তুলিল।

ঈশ্বর কি সত্যই আছেন? মহাচৈতন্যময়, মহাকরুণাময় যে-শক্তিকে সকল ধর্ম্মশাস্ত্র সশ্রদ্ধ আড়ম্বরের সঙ্গে পূজা করে, তাহার অস্তিত্ব কি সত্যই আছে, না তাহা মানুষের সান্ত্বনা পাইবার এক অভিনব পন্থা—জীবনের সার্থকতা সম্বন্ধে সন্দিহান মানুষের কাল্পনিক আবিষ্কার?

মনের গভীর হতাশায় রজত জড়বাদী দর্শনের দিকে আকৃষ্ট হইল। চার্ব্বাকবাদীদের গ্রন্থ হইতে আরম্ভ করিয়া অতিআধুনিক মেটিরিয়ালিস্টদের দর্শন পর্য্যন্ত জড়বাদের সকল বক্তব্য সে পড়িয়া ফেলিল। পড়িয়া জড়-বাদের সত্যতা সম্বন্ধে রজতের গভীর প্রতীতি জন্মিল।

সমস্ত জগত পরিব্যাপ্ত করিয়া রহিয়াছে এক অন্ধশক্তি, তার বিচার নাই, তার বুদ্ধি নাই, চৈতন্য নাই। বিদ্যুৎ-শক্তির যেমন অসীম ক্ষমতা, অথচ একমাত্রা বুদ্ধি নাই, বিশ্বের কেন্দ্রীয় মহাশক্তিও তেমনি। অসীম, অমোঘ ইহার শক্তি, অবিশ্রান্ত জগৎমণ্ডলী এই শক্তি হইতে উদ্ভূত হয়—পাথরে আঘাত খাইয়া জলস্রোত যেমন নিজের অজ্ঞাতসারে জলবিন্দু ও জলবুদ্বুদ উৎক্ষিপ্ত করে, এই শক্তিও তেমনই নিজের অজ্ঞাতসারে বিশ্বচরাচর সৃষ্টি করিয়াছে। এই অন্ধশক্তির বুদ্ধিহীন আলোড়নেই জগৎসৃষ্টি হইয়াছে, জীবসৃষ্টি হইয়াছে, মানুষসৃষ্টি হইয়াছে। বিশ্বসৃষ্টির কেন্দ্রে কোনও প্রজ্ঞাময় প্রেমময় ভগবান বর্ত্তমান নাই। একটা বিরাট ব্যর্থতার দিকে দৃশ্যমান সর্ব্ববস্তুর যাত্রা। ফুলের সঙ্গে গন্ধ যেমন ওতঃপ্রোত, মানুষের মধ্যে চৈতন্যও তদ্রূপ; ইহার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব না থাকিবার সম্ভাব্যতা সম্বন্ধে আধুনিক জড়বাদী দার্শনিকেরা যে-সব যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন, রজতের

কাছে তাহা অতিশয় যুক্তিযুক্ত মনে হইল। রজত স্থির করিল, ঈশ্বর নাই।

তবে মদ খাও, তবে পাপ করো, ক্লেদময় সমস্ত প্রমত্ততার অভিনয় করো। ভালো-মন্দে পাপে-পুণ্যে, ত্যাগে স্বার্থপরতায়, মহত্ত্বে এবং ইতরতায় পার্থক্য করিয়া সুবিচার করিবার যদি কেহ নাই, তবে হও স্বার্থপর, আপাতমধুর শারীর সুখের সমস্ত সম্ভার জোগাড় করো—মদ, নৃত্য, হীরা বাইজি—

দ্বিতীয়বার, এবং এবার সজ্ঞানে, রজত হীরা বাইজির বাড়ির উদ্দেশ্যে যাত্রা করিল।

হীরা বাইজি বিশেষ আদর-আপ্যায়ন করিল। পান ও আতর আনিল, এবং ইহার জন্য পূর্ব্বাহ্নে পয়সা পর্য্যন্ত চাহিল না। কিন্তু রজত যখন সে-সব কিছু স্পর্শ না করিয়া অদ্ভুত নিষ্পলক দৃষ্টিতে তাহার দিকে শুধুই তাকাইয়া রহিল তখন হীরা নিজেকে যেন ভারি দুর্ব্বল এবং অপটু বোধ করিতে লাগিল। তার মনে হইতে লাগিল—তাহার ছলাকলা এই অদ্ভুত লোকটির কাছে যেন যথেষ্ট মন-ভুলানো হইতেছে না। তবু স্কন্ধের এক লাস্যময় ভঙ্গি করিয়া, বাঁকা কটাক্ষের আবেদন হানিয়া সহাস্য মুখে আব্দার-ভরা কণ্ঠে সে কহিল—'কিত্‌না রোজ তো আপ্‌ আয়ে নহী, বাবুজী—'

রজত এই প্রশ্নের কোনও জবাব না দিয়া কহিল, 'একটু আনন্দ দিতে পার বাইজি? আর যে সইতে পারি নে।'

'হাঁ, হাঁ, ওসিকা ওয়াস্তে মায় হুঁ। নাচুঙ্গী? গাউঙ্গী? আপ্‌ জ্যয়সা ফরমায়েঙ্গে ঐসা করুঙ্গী, বাবুজী—'

রজত চাহিয়া দেখিল, এই মধ্য-যৌবনা, কৃত্রিমরঞ্জিতবদনা, অবসাদাভিষ্ট-দেহা মেয়েটি কী গভীর অনুনয়ের সঙ্গে তাহার তুষ্টিসাধনের জন্য আদেশের অপেক্ষা করিতেছে। কী করুণ, কী বীভৎস করুণ পণ্য-স্ত্রীর জীবন! ভালবাসার যেখানে সংস্পর্শ মাত্র নাই, মুদ্রার বিনিময়ে দেহ এবং মনকে

সেখানে গভীরভাবে নিপীড়িত করিয়া প্রতিনিয়ত ইহাদের আত্মহত্যা করিতে হয়!

রজত উঠিয়া দাঁড়াইল। কহিল—'ভুল করেচি, বাইজি। তোমার কাছ থেকে আনন্দ পাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আমি যা চাই কোথায় তা তুমি পাবে?—আশীর্ব্বাদ করি, এই বিড়ম্বিত জীবন থেকে তুমি মুক্তি পাও। এই নাও টাকা। কিন্তু আর কোনও দিন তুমি আমাকে আশা ক'রো না।' বলিয়া রজত কতগুলি নোট বাহির করিয়া হীরা বাইজির নিকট রাখিয়া দিল এবং আর বাক্যব্যয় না করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

হীরা বাইজি টাকা ছুঁইল না। উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, 'কুছ কসুর হুয়া, বাবুজী?'

রজত কহিল, 'কিছু না।'

'তব্?'

'তবে আর কিছু নেই। দুনিয়াটারই কোনও মানে নেই—'

'আপ্‌কা কেয়া হুয়া?—'

'তা তুমি বুঝবে না।' রজত অন্যমনস্কের মতো কহিল। 'জগৎটাই আমার কাছ থেকে কোথায় জানি সরে' গিয়েছে।' বলিয়া প্রায় দৌড়াইতে দৌড়াইতে সে নিচে নামিয়া গেল।

সমুখ দিয়া একটা ট্যাক্সি যাইতেছিল। সেটাকে ডাকিয়া রজত চড়িয়া বসিয়া কহিল—'ইডেন্ গার্ডেন্‌স্।' বাগানের সমুখে নামিয়া সে গঙ্গার দিকে হাঁটিয়া চলিল। গঙ্গার ধারে পৌছাইয়া সমুখেই দেখিল একটা খালি বেঞ্চ, রজত নির্জ্জীবের মত তাহাতে শুইয়া পড়িল।

গঙ্গার জল পাড়ের সঙ্গে আসিয়া শব্দ করিতেছে—ছলাৎ, ছলাৎ। আকাশ তারায় তারায় ছাইয়া গেছে। কত জ্যোতির্বর্ত্ম, কত

অস্পষ্ট নীহারিকা, অন্তহীন গভীরতার মধ্যে নব নব জ্যোতির্ম্ময় জগতের আভাস ফুটিয়া উঠিয়াছে। আকাশের পটে অগণিত সৃষ্টির ইঙ্গিত। বাতাস, জল, বিস্মৃতি, মুক্তি, শান্তি, প্রেম,—সুমিত্রা—

না, না, ঈশ্বর আছেন, নিশ্চয়ই আছেন—রজত সহসা উত্তেজিত ভাবে উঠিয়া বসিল। রহস্যের কি অন্ত আছে। অন্ত যদি নাই, তবে কি করিয়া বলা যায়, এই রহস্যের আড়ালে রহস্যময় বিরাজ করিতেছেন না? ঈশ্বর নিশ্চয়ই সত্য। নিশ্চয়ই তিনি বিশ্বচরাচর ব্যাপ্ত করিয়া বিরাজ করিতেছেন। নইলে—রজত ভাবিয়া শিহরিয়া উঠিল—কিছুই যে নাই, পরলোক নাই, পরিণতি নাই—নইলে যে সুমিত্রা নাই—। সুমিত্রা নাই! না, না, তাও কি সম্ভব। ঈশ্বর আছেন, ঈশ্বর আছেন।

ভারতবর্ষে যুগে যুগে কত গৃহী সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া এই অদৃশ্য ঈশ্বরের সন্ধানে ছুটিয়া গিয়াছে। তপে, ধ্যানে, কৃচ্ছ্র-সাধনায়, যোগ-সাধনায় এই চিরন্তন রহস্যের জন্য মানব-মনের চিরন্তন জিজ্ঞাসার তাহারা জবাব খুঁজিয়া ফিরিয়াছে। মানুষ কোথা হইতে আসে, কোথায় যায়, কোন্ অদৃশ্য শক্তির সঙ্কেতে প্রতিনিয়ত জীব-জগতের বিস্ময়কর প্রবাহ ছুটিয়া চলিয়াছে? সে-শক্তি তো মিথ্যা নয়,—সেই অদৃশ্য, জ্ঞানের অগোচর এবং বুদ্ধির অনধিগম্য শক্তির অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার কোনই হেতু নাই। সে-শক্তি কি অন্ধশক্তি? এই যে বিশ্বব্যাপী শৃঙ্খলা, এই যে জগৎ-জোড়া নিয়মানুবর্ত্তিতা, ইহার পিছনে কি কোনও মহাচৈতন্যের অস্তিত্বের সুস্পষ্ট আভাস পাই না?—রজত ভাবিতে লাগিল।

মানুষের দৃষ্টিশক্তির বহির্ভূত, মানুষের বুদ্ধি-শক্তির অন্তরালস্থিত কী এই মহাশক্তি? ক্ষণে ক্ষণে তাহার আভাস মনের মধ্যে আসিয়া পৌঁছায়, জীবনে সতত তাহার স্পর্শ পাই, সর্ব্বক্ষণ মানুষের আশা এবং আকাঙ্ক্ষা তাঁহার ধ্যান করিয়া মরে, অথচ একবারও তাহাকে স্পষ্ট প্রকাশিত হইতে দেখি না, আমার বুদ্ধি তাহাকে শৃঙ্খলিত করিতে পারে

না, আমার ইন্দ্রিয়বৃত্তিগুলি তাহাকে আবিষ্কার করিতে যাইয়া স্ব স্ব ক্ষমতা হারাইয়া ফেলে। এ কী অসীম বিস্ময়! এই শক্তিকে জানিতে পারা মানুষের জ্ঞান-সাধনার ইতিহাসের মহত্তম সাধনা। সুন্দর কি? সার্থক কি? কোন্ পরম সত্যের মধ্যে আমাদের আনন্দময় সমাপ্তিহীন পরিণতি?

## পনেরো

পুত্রের জন্য যে-বাসা দুর্গাপ্রসন্ন এত যত্ন করিয়া, এত আশা করিয়া গড়িয়াছিলেন, রজত তাহাতে কোনও দিন প্রবেশ করিল না।

দশ পনেরো দিন পরে সত্যানন্দ একদিন যখন আপিসে যাইবার উদ্যোগ করিতেছিলেন, সেই সময় ডাক-পিয়ন আসিয়া তাঁর হাতে রেজিস্টারি-করা একটা লম্বা খাম দিয়া গেল। হাতে সময় অত্যন্ত কম ছিল। সত্যানন্দ একবার ভাবিলেন, খামটা আপিসে লইয়া যাইবেন, কিন্তু তারপর খুলিয়াই ফেলিলেন।

ভিতর হইতে রেজিস্টারি-কৃত একটা দলিল বাহির হইল। আপিস-সংক্রান্ত দলিল-পত্র তাঁর বাড়িতে আসে না, আপিসের ঠিকানায়ই তাহা আসে। তিনি একটু বিস্মিত হইলেন; কিন্তু বিস্ময়টা তাঁর শতগুণ বাড়িয়া গেল, যখন চকিতে রজতপ্রসন্ন চৌধুরি এই নামটা তিনি দলিলের নিচের দিকে আবিষ্কার করিলেন। মুহূর্তের মধ্যে তিনি সমগ্র দলিলে দ্রুত চোখ বুলাইয়া লইলেন। দেখিলেন, ইহা এক দানপত্র।

তখন সঙ্গের চিঠিটাতে সত্যানন্দের দৃষ্টি পড়িল। কম্পিত হস্তে সেটা চোখের সমুখে উঠাইয়া, চশমা-হীন চোখের ভ্রূ কুঁচকাইয়া তিনি পড়িতে লাগিলেন। পড়িতে পড়িতে লাইনগুলি বারম্বার এলোমেলো হইয়া উঠিল:—

'শ্রীচরণেষু—

কাকাবাবু, এই চিঠির সঙ্গে একটা দানপত্র পাঠাইলাম। আমার সমস্ত স্থাবর এবং অস্থাবর সম্পত্তি আমি নানা জনহিতকর কার্য্যে ব্যয় করিবার জন্য আপনাকে একমাত্র অছি নিযুক্ত করিয়া গেলাম। আপনি দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন, এই দলিল বিধি-অনুযায়ী রেজিস্টারি করা হইয়াছে।

অর্থে আমার আর কোনও প্রয়োজন নাই। নিরুদ্দেশ-পথে আমি যাত্রা করিলাম। জীবনকে যারা অতীন্দ্রিয় আধ্যাত্মিক সাধনায় নিয়োজিত করিয়াছে, দৃশ্যমান জগতের বাহিরে এক অদৃশ্য জগতের রহস্যের সন্ধানে যাহারা নিজেদের ব্যাপৃত করিয়াছে, তাহাদের কাছে আমি সর্ব্বপ্রথম যাইব। জীবনের কি কোনও বরণীয় পরিণতি আছে? সত্যই কি জগতের কর্ণধাররূপে চৈতন্যময় মঙ্গলময় এক ভগবান আছেন? চরম সত্য কি?—এই সব প্রশ্নের সদুত্তর পাওয়া আমার পক্ষে একান্তই প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে।

ঋষি-প্রদর্শিত পন্থায়ই প্রথমে আমি এই অনুসন্ধান আরম্ভ করিব। খোঁজ যদি সত্যই কিছু পাই, কাহারও কাছেই তাহা গোপন রাখিব না। আর যদি ব্যর্থ হই—যদি বুঝিতে পারি, সাধুসন্ন্যাসীরা যুগ যুগ ধরিয়া নিজেদের আত্মসম্মোহিত, আত্মপ্রবঞ্চিত মাত্র করিয়াছে, তবে তাহাও জগতের কাছে জানাইতে দ্বিধা বা লজ্জা করিব না, এবং সেই ব্যর্থতার জন্য নিজেকে আমি কোনও দিন এই বলিয়া অভিযুক্ত করিব না যে, একটা মিথ্যার পশ্চাতে ঘুরিয়া জীবনটাকে আমি নষ্ট করিয়া ফেলিলাম। যে বৃহৎ প্রশ্নের সদুত্তরের জন্য আমি সংসার-ত্যাগ করিয়া চলিলাম, একটা জীবনব্যাপী পরীক্ষা তাহার তুলনায় কিছুই নয়। একটা জীবন ইহার জন্য অনায়াসে বিসর্জ্জন দেওয়া যায়।

আপনি এবং কাকিমা আমার প্রণাম জানিবেন। মন্দার মত লক্ষ্মী মেয়ের চিরকল্যাণ হউক। ইতি—রজত।'

চিঠি পড়িয়া সত্যানন্দ সমুখের চেয়ারটায় বজ্রাহতের মতো বসিয়া পড়িলেন। ভৃত্যের মুখে সংবাদ পাইয়া সত্যবতী ছুটিয়া আসিলেন। স্বামীর মুখ দেখিয়া তাঁহারও মুখ শুকাইয়া গেল। স্খলিত কণ্ঠে কহিলেন—'কি খবর, বল তো?—এ চিঠি কার? কি হয়েছে, বল না ছাই? এমন চুপ করে' রইলে কেন?'

সত্যানন্দ কহিলেন, 'বঙ্কিম সন্ন্যাসী হয়ে বেরিয়ে গেছে। এই তার চিঠি, এই তার দানপত্র—সমস্ত সম্পত্তি সে দান করে' চলে গেছে। পাগল! পাগল! আস্ত একটা ক্ষ্যাপা—'

'সন্ন্যেসী! এ কি কাণ্ড! সন্ন্যাসী হবে সে কোন্ দুঃখে?'

'বক্তের মধ্যে ওর এই ঘর-ভাঙ্‌বার প্রবৃত্তি। ভেঙে ফেলবার উন্মাদনার মধ্যে ও বড় হয়ে উঠেছে। পদ্মার মতোই ওর মন—পলাতক মন। সঞ্চয়ের মধ্যে বাঁধা থাক্‌তে চায় না; নিজের কীর্ত্তিকে গুঁড়িয়ে দিয়ে অগ্রসর হয়ে যায়!—কিন্তু, না, না,—এ হ'তে পাবেবে না।—এমন তাকে আমি করতে দেব না। কেন সে এমন করবে? সব বিসর্জ্জন দেবে সে কেন? আমার হাতে যে দুর্গাপ্রসন্ন ওর ভার দিয়ে গেচেন, সে দায়িত্ব কি আমাকে এম্‌নি করেই লঙ্ঘন করতে হবে! ও কি, কাঁদ্‌চিস কেন, মন্দা? সব শুনেচিস্?'

দরজার গায়ে মাথা ঠেস্ দিয়া মন্দা কখন্ কাঁদিতে শুরু করিয়া দিয়াছে, সত্যানন্দ তাহা এতক্ষণ টেরও পান নাই। সকরুণ স্নেহে কন্যার আনত অশ্রুসিক্ত মুখের দিকে চাহিয়া কহিলেন, 'কাঁদিস্ নে, মা, কাঁদিস্ নে। যা, যা তো মা, শোফারকে গাড়িতে স্টার্ট দিতে বল্ গিয়ে।—দেখিস্, তাকে আমি ধরে' আন্‌বই—যেমন করে' পারি তাকে ফিরিয়ে আনবই—আনবই—'

উত্তরভারতযাত্রী এক দ্রুতগামী ট্রেনের তৃতীয় শ্রেণীর এক কামরায়

মুণ্ডিতমস্তক এক-বস্ত্র-সম্বল রজতপ্রসন্ন নিরুদ্দেশ-যাত্রায় ছুটিয়াছে। শান্ত সমাহিত একটা পরিতৃপ্তিতে তার মুখমণ্ডল উজ্জ্বল, দুই চোখে গভীর বিশ্বাসের নির্ভরতা, ললাটে ঔদার্য্যের মহিমা। জীবনে দুঃখ বলিয়া যেন কিছু নাই; ব্যর্থতায় কোনও দিনই যেন সে বেদনা পায় নাই—জীবন যেন তাহার উপর দিয়া স্বচ্ছন্দগতি জলস্রোতের মতন প্রবাহিত হইয়া গিয়াছে।

সন্ধ্যারাগ-বঙ্কিম আকাশের দিকে রজত চোখ মেলিয়া চাহিল। অনেকক্ষণ ধরিয়া চাহিয়া রহিল। সহসা অস্তরাগরঞ্জিত আকাশ চঞ্চলালোক-প্রতিফলিত পদ্মায় রূপান্তরিত হইয়া গেল। রজত দেখিল, ফেনিলোচ্ছল পদ্মা সৃষ্টির এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত ঊর্ম্মি বিক্ষিপ্ত করিয়া খর-স্রোতোবেগে ছুটিয়া চলিয়াছে। পৃথিবীর বুকে ভীম-বিক্রমে সে আঘাত করিতেছে। বলিতেছে—ভাঙ্, ভাঙ্, ভাঙ্! যাহা ভঙ্গুর, যাহা দুদিনের, পদ্মপত্রে জলের মত যাহা ক্ষণস্থায়ী, তাহা আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকিস্ না। যাহা শাশ্বত, যাহা চিরসত্য একবার সে দিকে চোখ ওঠা।—তোর চারিদিকে যে-শৃঙ্খল তুই নিজে রচনা করিয়া বাঁধিয়াছিস্, তাহা ভাঙ্, ভাঙ্, ভাঙ্। যে-মুক্তির বাণী তোর কর্ণে আমি নিরন্তর চিৎকার করিয়া কহিতেছি, একবার কান পাতিয়া তাহা শোন্—